বিদ্যায়তনিক সফরনামা

বখতিয়ার আহমেদ

আমাদের প্রকাশিত আরো বই

- মুখোমুখি হায়দার রিজভী (২০১৮)
- রাষ্ট্র গণমাধ্যম ও জঙ্গিবাদ (২০১৯)
- তারেক মাসুদ, শূন্যের ভিতরে এতো ঢেউ (২০১৯)
- ভাষা প্রসঙ্গে ভাষণ (২০১৯)
- নয়া তথ্যপ্রযুক্তি, সংবাদ-বাস্তবতা ও বুদ্ধিবৃত্তি (২০১৯)
- দৃশ্যগত নৃবিজ্ঞান (২০২০)
- সাতদিনের সুলতান (২০২০)
- বুদ্ধিজীবী কারে কয় (২০২১)
- সম্প্রচার সাংবাদিকতা ১ : পাঠ ও বাস্তবতা (২০২১)
- চিন্তার দুর্দশা (২০২১)
- পাশ্চাত্য ও সেক্যুলারবাদ প্রসঙ্গে (২০২১)
- আন্তঃশাস্ত্র : বিদ্যাকারখানার নতুন ভড়ং (২০২১)
- সিনেমাপাঠ (২০২১)
- মির্জা গালিব : জৈবনিক চিত্রনাট্য (২০২২)

বিদ্যায়তনিক সফরনামা

ম্যাজিক লণ্ঠন
প্রকাশন
একটি যৌথ প্রয়াস

বিদ্যায়তনিক সফরনামা

বখতিয়ার আহমেদ

ম্যাজিক লণ্ঠন
প্রকাশন
একটি যৌথ প্রয়াস

বিদ্যায়তনিক সফরনামা
Bidyatonik Safornama

প্রথম প্রকাশ ।। ফাল্গুন ১৪২৮, মার্চ ২০২২

প্রকাশক ।। ম্যাজিক লণ্ঠন প্রকাশন

অস্থায়ী কার্যালয় : ৩৩২, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একাডেমিক ভবন

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী।

মুঠোফোন : +৮৮০১৭৫৬৯৩৪৪৩৩

Email: shafiqulislamru32@gmail.com

প্রচ্ছদ ।। আইয়ুব আল আমিন

মুদ্রণ ।। এম কে গ্রাফিক্স অ্যান্ড প্রিন্টিং, রাজশাহী

ISBN 978-984-96307-1-5

পাঠকের জন্য মূল্য ।। ১৫০ টাকা ।। রুপি : ৩৫০ ।। ডলার : ১৫

সতীর্থ সহোদর

রাশীদ মাহমুদ

(১৬ আগস্ট ১৯৭৬ – ৩১ মার্চ ২০২১)

সূচি

বিদ্যায়তনে একটি ব্যক্তিগত সফরনামা

১৯৯৬ সালে আমি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষার নানা পাক-চক্র পেরিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র হিসেবে থিতু হই এবং ২০০১ সাল নাগাদ পাশও করে ফেলি মাস্টার্সে একটি ভাল ফলসমেত। পরের বছরের গোড়াতেই শিক্ষকতা শুরু করি ঢাকার লালমাটিয়া মহিলা কলেজের সদ্য প্রতিষ্ঠিত নৃবিজ্ঞান বিভাগে। আরো কিছু পাক-চক্র পেরিয়ে ২০০২ সালের শেষ দিনটিতে প্রভাষক হিসেবে যোগ দিই রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞান বিভাগে। সেই থেকে অদ্যাবধি নৃবিদ্যা চর্চা আমার পেশা; এবং আমি আমার পেশাটি পছন্দ করি। গত দেড় যুগে এই বিদ্যা শেখা আর শিক্ষকতা সূত্রে আমি বিচরণ করেছি আরো কিছু বিশ্ববিদ্যালয় আর বিদ্যায়তনিক আয়োজনে। এই মলাটে গ্রন্থিত রচনাগুলো আমার এই বিদ্যাজাগতিক সফরের স্মারক।

প্রাতিষ্ঠানিক পরিসরে নৃবিজ্ঞান চর্চার গোড়া থেকেই একটা সচেতন সিদ্ধান্ত ছিল বাংলা ভাষায় নৃবিজ্ঞান তথা সমাজবিদ্যার চর্চা করা, বিশেষত লেখালেখি। এর প্রথম কারণ কোনো দেশাত্মবোধ নয়, বরং অন্য ভাষায় চিন্তা করবার অনভ্যাস। দ্বিতীয় কারণ, ১৯৯০ এর দশক থেকে অগ্রজ এক স্যার বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের বাংলা ভাষায় সমাজবিদ্যা চর্চার নিরলস ও একনিষ্ঠ ধারার অনুপ্রেরণা। এই

অনুপ্রেরণা থেকে একটা উচ্চাকাঙ্ক্ষাও দানা বাঁধে বাংলায় লেখালেখি করবার ক্ষেত্রে। তা হচ্ছে সমাজবিদ্যাকে আটপৌরে অভিজ্ঞানে পরিণত করা, জন-পরিসরের আলাপে পরিণত করা। কিন্তু সেই চেষ্টার ফলাফল এই রচনাগুলো নয়, বরং খানিক তার প্রস্তুতি বা নিরীক্ষা পর্বের ফলাফল এসব। জন-পরিসরে নৃবিদ্যা চর্চার ফলাফল অচিরেই একটা ভিন্ন মলাটে হাজির করবার আশা রাখি।

এই রচনাগুলোর প্রথম সূতিকাগার আমার শিক্ষকতা; প্রথম অনুপ্রেরণা ক্লাসরুম-করিডোরের সতীর্থ শিক্ষার্থীরা। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে আর সব সমাজবিদ্যার মতো নৃবিদ্যার পুঁথি-পত্রের সিংহভাগই ইংরেজি ভাষায়। উচ্চশিক্ষার উপনিবেশিক উত্তরাধিকারের ফেরে পড়ে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের বিদ্যাচর্চার সামনে সবচে বড় বাধা এই পাহাড়-প্রমাণ ভিন-ভাষী পাঠ্যবই। ফলে একটা কলোনিয়াল ঐতিহ্যের বিদ্যার সাথে নিজ বুদ্ধি দিয়ে বোঝাপড়ার চেষ্টা, তার সাম্প্রতিক আদিকল্পগুলো দিয়ে নিজের ঐতিহাসিক বাস্তবকে বোঝার চেষ্টাই গ্রন্থিত রচনাগুলোর মূল চরিত্র। কিন্তু রচনাগুলো শেষমেষ লিখিত হতে পারার ক্ষেত্রে মূল অনুঘটক হিসেবে কাজ করেছে আমার ক্লাসরুম কিংবা সতীর্থদের বিদ্যায়তনিক আয়োজন। বেশিরভাগ রচনাই এখনো রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞান বিভাগের পাঠ্যক্রমের অংশ এবং আমার বিদ্যাচর্চার অনুরাগী সম্পাদক বন্ধুদের কৃপায় বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকা বা ব্লগসাইটে প্রকাশিত।

প্রায় দেড়যুগ ব্যাপ্তিতে লেখা রচনাগুলো সাজানো আছে চারটি পর্বে যা আমার বিদ্যায়তনিক বিচরণের চারটি ভিন্ন সময় ও পরিসরকে খানিক মেলে ধরে। প্রথম পর্বটি নৃবিদ্যার সাথে নিজের বোঝাপড়ার আদিপর্বের, রচনাকাল ২০০১ থেকে ২০০৪। এই পর্বের প্রথম রচনা, 'ইতিহাসের প্রদোষকাল' লেখা হয়েছিল শিক্ষকতার প্রথম বছরে, লালমাটিয়া কলেজে প্রারম্ভিক নৃবিজ্ঞানের ক্লাস সূত্রে। পরে ছাপা হয়েছিল 'দৈনিক যুগান্তর' এ। পরের বছরগুলোতে আমার বিশ্ব-ইতিহাস ও সভ্যতা কোর্সের শিক্ষার্থীরা ছিলেন এই রচনার সবচেয়ে স্মরণীয় পাঠক। নিজের

ছাত্রজীবনের বোঝাপড়া থেকে লেখা হলেও, ক্লাসনোট ধরনের লেখা হলেও, প্রথম বিদ্যায়তনিক রচনা হিসেবে এই লেখাটার প্রতি আমার মমতা আছে।

পরের রচনা, 'যুদ্ধ, শাস্ত্রীয় আদিকল্প ও শাস্ত্রবিদ' প্রবন্ধটি নৃবিজ্ঞানে আমার সতীর্থ সহোদর রাশীদ মাহমুদের সাথে রচিত। মূল উপলক্ষ্য ছিল ২০০৩ সালের জুনে নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের আয়োজিত সেমিনার। ২০০১ সালের 'নাইন ইলেভেন' এর মধ্য দিয়ে সূচিত হওয়া 'সন্ত্রাসবাদ বিরোধী' যুদ্ধ-পরিস্থিতিকে নিজেদের বিদ্যা দিয়ে বোঝার প্রয়াস ছিল এটি। রচনাটি বাংলাদেশে নৃবিজ্ঞানের অনেক অগ্রজ সতীর্থ শিক্ষকদের সাথে আমার প্রেরণা জোগানো যোগাযোগের সূচনা বিন্দুও বটে। পরে ২০০৪ সালে এইটি প্রকাশিত হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণাপত্র 'দি ঢাকা ইউনিভার্সিটি স্টাডিজ'-এ।

এই সফরনামা প্রথম লিখবার পরে, ৩১ মার্চ ২০২১, সাতক্ষীরায় এক প্রত্যন্ত মাঠকর্মের শেষ দিনে রাশীদ মাহমুদ এক আচমকা মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন আমাকে। আমি এখনো সেই অপ্রস্তুত নিঃসঙ্গতার সাথে পুরোটা মানিয়ে নিতে পারিনি। এই সফরনামা আমার এই অদ্বিতীয় সফরসঙ্গীর জন্য। ফেয়ার দি ওয়েল রাশীদ ভাই।

এই পর্বের শেষ রচনাটি উত্তর-উপনিবেশিক চিন্তক এডোয়ার্ড সাইদের প্রয়াণে লেখা আমার প্রণতি। ২০০৩ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর এডোয়ার্ড সাইদের প্রয়াণে 'দৈনিক যুগান্তর' এর সাহিত্য সম্পাদক বন্ধু কবি শহীদুল ইসলাম রিপনের ফরমায়েশে লেখা অবিচুয়ারি। পরের বছর লেখাটি সংকলিত হয় বেনজীন খান সম্পাদিত 'এডয়ার্ড ডব্লিউ সাইদ : আবিশ্ব বিবেকের কণ্ঠস্বর' গ্রন্থে। আমার চিন্তার পাটাতন অনেকখানিই সাজিয়ে দিয়েছে সাইদের লেখালেখি। কলোনিয়াল নৃবিজ্ঞানের চিন্তা-পদ্ধতি থেকে বেরুনোর পথে তিনি ছিলেন খুব গুরুত্বপূর্ণ চেনেল। যত অকিঞ্চিৎকরই হোক না কেনো, লেখাটা সাইদের প্রতি আমার অকপট প্রণতির স্মারক হয়ে আছে।

দ্বিতীয় পর্বের দুই রচনার পরিসর হচ্ছে ভাষা-নৃবিজ্ঞান। শিক্ষকতার প্রথম বছর থেকে অদ্যাবধি ভাষা-নৃবিজ্ঞান পড়াই যার গাঢ় ছাপ আছে আমার সামগ্রিক নৃবিদ্যা চর্চায়। প্রথম প্রবন্ধটি, 'ভাষা, সংস্কৃতি ও জাতিসত্তা প্রশ্নে আমাদের জাতিরাষ্ট্র' নির্দিষ্ট দিন-ক্ষণে আমাকে দিয়ে লেখিয়ে নেয়ার দুঃসাধ্য কাজটি ধৈর্যশীল আস্থা রেখে করেছিলেন 'মাওরুম' পত্রিকার সম্পাদক শ্রদ্ধাভাজন অগ্রজ দীপায়ন খীসা। ২১ ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে অভিষিক্ত হওয়ার পটভূমিতে ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০০৬, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে একই শিরোনামে আয়োজিত সেমিনারে পঠিত হয় লেখাটি, একই সপ্তাহে প্রকাশিত হয় 'দৈনিক সমকাল' পত্রিকার সাহিত্য সাময়িকী 'কালের খেয়া' এবং পরবর্তী সময়ে 'মাওরুম' পত্রিকার একটি বিশেষ সংখ্যায়। ভাষা, মানুষের আত্ম ও যৌথসত্তা, ক্ষমতাসম্পর্ক ও রাষ্ট্রকল্প নিয়ে আমার প্রথম রচনা এইটি। লেখাটির অনেক অনুমান ও অনুধাবন পরের এক দশকে বদলেছে অনেকখানি। তার মধ্যে অন্যতম একটি হচ্ছে প্রতিষ্ঠান হিসেবে রাষ্ট্রের মানবিকীকরণের ঐতিহাসিক সম্ভাবনার ওপর আস্থা হারানো। কিন্তু লেখাটির পাঠ-প্রতিক্রিয়াগুলো আমাকে সেসময় দারুণ উজ্জীবিত করেছে। লেখাটি নিয়ে প্রথম সেমিনারের বিদগ্ধ-সুধী ভাষাসৈনিক আব্দুল মতিন, সৈয়দ আবুল মকসুদ, কামাল লোহানি, অধ্যাপক যতীন সরকার, রাশেদ খান মেনন, ও সোহরাব হাসানের অভিমত, অগ্রজ চিন্তুক সাইফ তারিকের 'দৈনিক সমকাল'এ প্রকাশিত একটি প্রতিক্রিয়া, পরে অধুনা-অনলাইন যুগে এসে আমার নৃবিদ্যায় মনোযোগী তরুণতর বান্ধবদের আগ্রহে লেখাটির একাধিক পুর্নপ্রকাশ মিলিয়ে লেখাটি আমাকে শিক্ষক হিসেবে অনেকখানি প্রত্যয়ী করে রেখেছে দীর্ঘ-দিন।

ভাষা নিয়ে এই পর্বের দ্বিতীয় রচনাটির প্রথম সহযাত্রী 'ভাষা-নৃবিজ্ঞান' কোর্সে আমার সব শিক্ষার্থীরা। কিন্তু উনাদের সাথে ভাষা-নৃবিজ্ঞানের প্রারম্ভিক ধ্যান-ধারণাগুলো বাংলা প্রবন্ধ হিসেবে লিখে ফেলা সম্ভব হয়েছিল 'ভিন্নচোখ' সম্পাদক আলী আফজাল খানের তদারকিতে। ২০১৪ সালে 'ভিন্ন-চোখে'র ভাষা

সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত হয় 'ভাষা, সংস্কৃতি ও মানবসত্তা : একটা নৃবৈজ্ঞানিক আলাপচারিতা' রচনাটি। গত বছর এইটি পুর্নপ্রকাশ ঘটে 'রাষ্ট্রচিন্তা' পত্রিকার ৪র্থ বর্ষের ২য় সংখ্যায়।

তৃতীয় পর্বের দুই রচনার বিষয় ক্ষমতা, সন্ত্রাস ও রাষ্ট্র। ভাষার পরে রাজনৈতিক নৃবিজ্ঞান আমার বিদ্যাগত ব্যুৎপত্তির দ্বিতীয় ক্ষেত্র। কিন্তু এই নিয়ে লেখালেখির একটি বড় অংশই ইংরেজিতে, উচ্চশিক্ষার্থে পরলোকগমনের ফলাফল হিসেবে। গ্রন্থিত এই দুই বাংলা রচনার প্রথমটি, 'গুম-খুন-আতঙ্ক : শাসনপ্রণালী ও হত্যার কথকতা'র মূল উদ্যোক্তা বাঁধন অধিকারী। ২০০৫ সাল থেকে আমার বোঝাপড়া, চিন্তা-ভাবনা এবং গবেষণার এজেন্ডা হিসেবে ক্রসফায়ার বা গুম-খুন বিষয়গুলিকে টিকিয়ে রাখবার জন্য বাঁধন সবকিছু করেছেন। এবং সেই ভাবাভাবির একমাত্র বস্তুগত ফলাফল ছিল ২০১১ সালের দিকে ফেসবুকে একটা লেখা 'গুম-খুন-আতঙ্ক : দরিদ্র বিশ্বের সাম্রাজ্যিক মাৎসন্যায়' শিরোনামের একটি নিবন্ধ। ২০১৪ সালের ২৭ মে, নারায়ণগঞ্জের র‍্যাবের হাতে আলোচিত 'সেভেন মার্ডার' এর একমাস পরে, বাঁধনের যোগসাজসেই রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরিফুল ইসলাম শশী, ইস্ক্রা রহমানসহ, 'মুক্তধারা' পাঠচক্রের বন্ধুরা মিলে আয়োজন করেন একটি বক্তৃতা। পরে বাঁধনসহ পিংকি ভৌমিক, খোরশেদ আলম, আর মুজাহিদ আহসান মিলে বক্তৃতাটির শ্রুতিলিপি তৈরী করেন। সেই শ্রুতিলিপির ওপর ভর করে লেখাটি আমি আবার লিখেছি। যাদের নাম বললাম তাঁরা সবাই এই রচনার সহলেখক।

এই পর্বের দ্বিতীয় রচনা 'সুপার কপ' কিংবা 'ডার্ক জাস্টিস', আগের রচনাটিরই সম্প্রসারণ। রাষ্ট্রীয় খুন ও জনমনের রাজনৈতিক বাসনার আরো সাম্প্রতিকতর বাস্তবতার নিরিখে নিজের নৃবিদ্যা দিয়ে বোঝার চেষ্টা। এইটি শেষমেষ লেখা সম্ভব হয়েছিল অনলাইন পোর্টাল 'অরাজ' সম্পাদক আরিফ রেজা মাহমুদের তাগিদে। ২০২০ সালে 'অরাজ'-এ প্রকাশিত লেখাটি এই সংকলনের সবচেয়ে সাম্প্রতিক রচনাও বটে।

শেষ পর্বের রচনা 'ওয়াল স্ট্রিট বিদ্রোহ : একজন খুদে মানুষ, একটি অনুবাদ' মূলত মার্কিন নৃবিজ্ঞানী ডেভিড গ্রেয়বারকে নিয়ে ২০১১ সালে 'অকুপাই ওয়ালস্ট্রিট' আন্দোলনের পটভূমিতে একটি ছোট্ট ভূমিকাসমেত করা অনুবাদ, প্রকাশিত হয়েছিল ফেসবুক নোট হিসেবে। এই সংকলনে গ্রন্থিত প্রবন্ধগুলো নৃবিদ্যায় আমার সফরের যে পর্বটির প্রতিবেদন, সেই পর্ব অতিক্রমে আমাকে সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত করা নৃবিজ্ঞানীদের একজন তিনি। ২০২০ সালের ২ সেপ্টেম্বর হঠাৎ বিদায় নেয়া এই নৃবিজ্ঞানীকে প্রণতি জানাতেই সংকলিত হল আমার ব্যক্তিগত সফরনামায়।

প্রায় ২০ বছরের ব্যাপ্তিতে লেখা রচনাগুলো আমার আলসেমির খপ্পর থেকে ছাড়িয়ে, ঝাড়াই-বাছাই করে একমলাটে আনার তাবৎ কৃতিত্ব সতীর্থ কাজী মামুন হায়দার ও 'ম্যাজিক লণ্ঠন প্রকাশন' এর সদা তৎপর কর্মীদের। তাঁরাই এই সফরনামার আদি ও অদ্বিতীয় গ্রন্থকার।

নৃবিজ্ঞানে আমার তাবৎ সহযাত্রী ও সতীর্থ-শিক্ষার্থীদের কৃতজ্ঞতা জানাই এই দীর্ঘ বিদ্যায়তনিক যাত্রায় আমাকে টিকিয়ে রাখবার জন্য।

২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২২
পশ্চিম ২৪/বি, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

ইতিহাসের উষাকাল

আমরা কারা? কোথা থেকে এসেছি?

নিখিলের অজৈব স্থবির অন্ধকার থেকে সঞ্চরণশীল জৈব প্রাণালোকে উত্তরণ এবং তারপর সেই জৈব বিকাশের একটি পর্যায়ে এসে মানুষ যখন নিজেকে প্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন করে একটি 'আমি' ভাবতে পারে, যখন হাজারো প্রজাতির ভীড়ে সে অভিন্ন হিসেবে চিহ্নিত করতে পারে প্রজাতির অন্য সদস্যদের অর্থাৎ 'আমরা' কে, তখন থেকেই তার মস্তিষ্কের গহীনে জারি হয়ে যায় এই প্রশ্নগুলো। সৃষ্টি জগৎ নিয়ে মানুষের প্রধান এবং মৌলিক যে কয়টি প্রশ্ন রয়েছে তার অন্যতম একটি তার নিজের উৎসমূল সম্পর্কে। মানুষের উৎস কোথায়? মানুষ কোথা থেকে এসেছে? একটি স্বতন্ত্র জীব প্রজাতি হিসেবে মানুষের আবির্ভাব কত কাল আগে? সমস্ত প্রাণীকুলের মধ্যে মানুষের বিকাশটি কীভাবে হয়েছে? পৃথিবীর নানা প্রান্তের মানুষের মধ্যে জৈবিক মিল এবং অমিলগুলোর কারণ কী, ইত্যাদি হাজারো প্রশ্নের উত্তর মানুষ সেই আদিকাল থেকে খুঁজছে।

মানব ইতিহাসের একটি দীর্ঘ সময়জুড়ে সৃষ্টি জগৎ সম্পর্কিত মানুষের যাবতীয় প্রশ্নের উত্তর দিয়েছে ধর্ম। আজকের যুগে বিজ্ঞানকে আমরা যে ভূমিকায় দেখতে পাই, আধুনিক কালের আগ

পর্যন্ত ধর্ম একই ভূমিকায় থেকে জ্ঞানপিপাসু মানুষের প্রশ্নের উত্তর দিয়ে এসেছে। প্রকৃতির যাবতীয় ঘটনা ও প্রক্রিয়ার ব্যাখ্যা মানুষ ধর্মের বিকাশের ধারায় পূর্বপুরুষ–ঈশ্বর, বহুঈশ্বর বা একেশ্বর প্রভৃতি রূপে বিরাজমান অতিলৌকিক ক্ষমতার ওপর বিশ্বাস রেখে করেছে। খ্রীস্টীয় সপ্তদশ শতক পর্যন্ত পৃথিবীর সভ্যতাগুলোর বৃহদাংশ মানুষ প্রধান চারটি ধর্ম গ্রন্থের পরম্পরায় চলে আসা আদি পিতা আদম বা অ্যাডাম এবং আদিমাতা হাওয়া বা ঈভের ধারণানুযায়ী নিজেদের তাদের উত্তর প্রজন্ম হিসেবে জানত।

অষ্টাদশ শতকের আগ পর্যন্ত পশ্চিমে মানুষের উৎস সম্পর্কে আলোচনা কেবল বাইবেলে বর্ণিত সৃষ্টিতত্ত্ব বা জেনেসিসে সীমাবদ্ধ ছিল। ফলে দীর্ঘদিন ধরে পশ্চিমের মানুষেরা অকাতরে বিশ্বাস করেছে যে এই মহাজগত ঈশ্বর সৃষ্টি করেছেন 'সৃষ্টির ষষ্ঠ দিবস' এ। এই ধর্মীয় বিশ্বাসের ওপর ভিত্তি করে বেড়ে ওঠা মানুষের উৎস সম্পর্কিত প্রথম মতবাদ সৃষ্টিতত্ত্বে মনে করা হত মানুষের জৈবিক সাদৃশ্য এবং বৈচিত্র্য সবই সৃষ্টিকাল থেকেই নির্ধারিত এবং তা অপরিবর্তনীয়। কিন্তু মানুষ ঠিক কতকাল ধরে পৃথিবীর বুকে বিচরণ করছে তার কোনো নির্দিষ্ট উত্তর বাইবেল যুগের প্রথম দিকে পাওয়া যায় না।

১৭০০ সালে পশ্চিম জার্মানির ক্যানসটাটে আবিষ্কৃত একটি প্রাগৈতিহাসিক মানব কংকাল, বিজ্ঞানের ভাষায় যাকে জীবাশ্ম বা ফসিল বলে, তা মানব প্রজাতির বয়স সংক্রান্ত প্রশ্নটিকে আরো একবার উসকে দেয়। ক্যানসটাটের এই আবিষ্কারের সাথে বাইবেলের বক্তব্য মিলিয়ে অনেক বিদ্বানই সে সময় মানুষের আবির্ভাবকাল তথা মহাজগতের বয়স ৬ হাজার বছর বলে মত দিলেন; যাদের মধ্যে অন্যতম দুই বিদ্বান হচ্ছেন জেমস উশের এবং আর্চবিশপ আমার্গ। এমনকি বাইবেলে বর্ণিত বিভিন্ন বংশের জীবৎকালের হিসাব কষে বাইবেল যুগের অন্যতম দুই বিদ্বান জেমস উশের এবং জন লাইটফুট এই মহাসৃষ্টি যজ্ঞের দিন তারিখটিও বের করে ফেলেন। পশ্চিমের অন্যতম বিদ্যাপীঠ ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে রেভারেন্ড ড. জন

লাইটফুট ঘোষণা করেন–'... ... স্বর্গ ও পৃথিবী, কেন্দ্র ও পরিধি এবং জলবাহী মেঘমালা সবকিছুই ঈশ্বর সৃষ্টি করেছেন ছয় দিনের সৃষ্টি যজ্ঞে যার মধ্যে তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন খ্রীস্টপূর্ব ৪০০৪ সালের ২৩ অক্টোবর সকাল ৯টায়।'

অষ্টাদশ এবং উনবিংশ শতক জুড়ে নানা ফসিল আবিষ্কার বিজ্ঞানীদের এই সৃষ্টিতত্ত্ব সম্পর্কে সন্দিহান করে তোলে। পশ্চিমের রেনেসাঁ উত্তরকালের যৌক্তিক বিজ্ঞান মানুষের উৎস সম্পর্কিত এই মতবাদগুলোকে অনেকাংশেই খারিজ করে দেয়। এক্ষেত্রে মুখ্য ভূমিকা পালন করে রূপান্তর-প্রক্রিয়া যাকে আমরা অনেক ক্ষেত্রে বিবর্তনও বলে থাকি। রূপান্তরবাদীরা মনে করেন, একটি প্রজাতি হতে আরেকটি প্রজাতির উদ্ভব ঘটে একটি দীর্ঘ রূপান্তর প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে, অনেকগুলি ধাপে পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের মাধ্যমে। এই রূপান্তরবাদীদের মধ্যে সবচেয়ে আলোচিত ব্যক্তি হচ্ছেন চার্লস ডারউইন। ডারউইনকে প্রভাবিত করেছেন সমসাময়িক আরো অনেক চিন্তক যাদের মধ্যে আছেন তাঁরই পিতামহ এরাসমাস ডারউইন যিনি ১৭৯৪ সালে প্রকাশিত তার গ্রন্থ 'জুনোমিয়া'তে সমস্ত প্রজাতির উৎস অভিন্ন বলে দাবি করেন।

জীব প্রজাতির উৎস, বৈচিত্র্য এবং সাদৃশ্যের কারণ অনুসন্ধানের পথ হিসেবে ডারউইন তার 'দি অরিজিন অফ স্পেসিজ' গ্রন্থে 'প্রাকৃতিক নির্বাচন' ধারণাটি প্রস্তাব করেন। প্রাকৃতিক নির্বাচন হচ্ছে একটি ক্রমাগত প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে প্রকৃতি তার প্রাণ-রূপগুলোর মাঝ থেকে টিকে থাকবার লড়াইয়ে যোগ্যতম প্রজাতিটি বেছে নেয় একটি নির্দিষ্ট পরিবেশে বংশবিস্তার করবার জন্য। এই প্রাকৃতিক নির্বাচন প্রক্রিয়া কাজ করে কিছু নির্দিষ্ট প্রাকৃতিক শর্তের উপস্থিতিতে; প্রথমত, নির্দিষ্ট পরিবেশে বসবাসরত প্রজাতিকুলের বৈচিত্র্য যা পৃথিবীর সর্বত্র বিরাজমান; দ্বিতীয়ত, সেই পরিবেশে অস্তিত্ব রক্ষার অনিবার্য উপাদানসমূহ যেমন খাদ্য, বিচরণভূমি ইত্যাদির জন্য প্রজাতিকুলের সদস্যদের মধ্যে প্রতিযোগিতা। বিদ্যমান প্রাণরূপগুলোর মধ্যে যারা এই অভিযোজন প্রতিযোগিতায় নিজ জৈব বৈশিষ্ট্যের জোরে যোগ্য

প্রমাণিত হয়, তারা অপেক্ষাকৃত কম যোগ্যদের তুলনায় অনেক বেশি পুনরুৎপাদন বা বংশ বিস্তার করে। ফলে একদিকে তারা সংখ্যায় বৃদ্ধি পায় অন্যদিকে অপেক্ষাকৃত কম যোগ্যরা সংখ্যায় কমতে কমতে একসময় বিলুপ্ত হয়ে যায়। সৃষ্টির আদিতেই পৃথিবী নামক এই গ্রহের জৈবিক ইতিহাসে, প্রজাতি হিসেবে টিকে থাকবার এই অমোঘ লড়াইয়ে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করে মানুষ হয়ে উঠেছে আশরাফুল মখলুকাত বা সৃষ্টির সেরা জীব। আর ঠিক এইখান থেকেই শুরু হয় মানুষের নিজের ইতিহাস।

মানুষের ইতিহাসের এই উষাকাল কবে কোথায় শুরু হয়েছিল তা নিয়ে এই বিষয়ক প্রায়োগিক গবেষণার বিজ্ঞান প্যালিওনটোলজি বা জীবাশ্মবিদ্যার পণ্ডিতদের মাঝেও এখনো ঘোরতর মতভেদ আছে। এই মতভেদের মাঝেও সাম্প্রতিকতম প্রচলিত মতটি হচ্ছে—সেটা শুরু হয়েছিল আজ থেকে প্রায় কুড়ি লক্ষ বছর আগে আফ্রিকায়। প্রাগৈতিহাসিক আফ্রিকার তৃণময় উষ্ণ সমতলে জৈবিক গঠনে প্রায় মানব সদৃশ্য প্রথম যে দ্বিপদী প্রাণীটির বিচরণের প্রমাণ বিজ্ঞানীরা পেয়েছেন তার নিকটতম আদিপুরুষদের কেতাবি নাম 'হোমো ইরেকটাস' যার শাব্দিক অর্থ—ঋজু মানব। এই নামটি মানুষের জৈবিক বিবর্তনের যে পর্বটিকে নির্দেশ করে তা হল বানর সদৃশ্য প্রজাতিবর্গ বা 'এপ' এর কোনো একটি প্রজাতির চার পা থেকে দুই পায়ের উপর ভর করে দাঁড়ানো। ঠিক কী কারণে মানুষের এই আদিমতম পূর্ব-পুরুষেরা দুই পায়ের উপর ভর করে দাঁড়িয়ে নিজেদের বানরবর্গ বা হোমিনিড থেকে আলাদা করেছিল, সে বিষয়ের কোনো হদিস বিজ্ঞানীরা আজো পাননি। কিন্তু এই দুই পায়ে দাঁড়ানোর ঘটনাটি যে মানুষের জৈবিক বিবর্তনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি উত্তরণ, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই কারুরই। পৃথিবীতে মানুষের এই দু'পেয়ে পূর্ব পুরুষদের আদিমতম ফসিলটি আবিষ্কৃত হয় ১৯৯৩ সালে আফ্রিকার ইথিওপিয়ায়, যা প্রায় ৪৪ লক্ষ বছর আগের বলে অনুমিত।

বিশ শতকের প্রথম ভাগেও মানব জীবাশ্মবিদদের ধারণা ছিল মানুষের আদি নিবাস দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কোথাও, তা কমপক্ষে

দশ লক্ষ বছর আগে। কিন্তু এই শতকের মাঝামাঝি পূর্ব আফ্রিকায় আবিষ্কৃত বেশ কিছু ফসিল এই ধারণাটি পাল্টে দেয়। ১৯৫৯ সালে এক ব্রিটিশ জীবাশ্মবিদ দম্পতি লুইস লিকি ও মেরি লিকি তানজানিয়ায় আবিষ্কার করেন আদিম মানবের কিছু হাড়গোড় ও চোয়ালসহ দাঁতের ফসিল; গবেষণাগারের কার্বন টেস্টে যেগুলোর বয়স প্রায় ১৮ লক্ষ বছর বলে জানা যায়। মগজের আয়তন, চোয়ালের মাপ, দ্বিপদী বিচরণের বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে বিজ্ঞানীরা যে প্রাইমেট বর্গটিকে মানুষের উৎসমূল হিসেবে বিবেচনা করে। মনে করা হয় তারই একটি ধারা আরো কিছু মানবিক সামর্থ্য অর্জন করে টিকে থাকার সংগ্রামে এগিয়ে যায় অন্যদের ছাড়িয়ে। বিবর্তনের এই স্তরটিকে বিজ্ঞানীরা বলেন, হোমো হ্যাবিলিস যার শাব্দিক অর্থই হচ্ছে সমর্থ মানব।

এই সমর্থ মানবদের প্রথম সামর্থ্যটি হচ্ছে হাতিয়ার ব্যবহার করার সামর্থ্য। এই সামর্থ্য অর্জনের পেছনে কারণ হিসেবে বিজ্ঞানীরা মস্তিষ্কের আয়তন বৃদ্ধিকে চিহ্নিত করেন, যার প্রমাণ হিসেবে এই স্তরের ফসিলগুলোর করোটির সামনের দিকের প্রসারণের কথা বলা হয়। একই সাথে হাতিয়ারের আবির্ভাবের পেছনে জলবায়ুগত পরিবর্তনকেও একটি নিয়ামক হিসেবে মনে করা হয়। প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানে পৃথিবীর আদিমতম যে পাথরের হাতিয়ারটি পাওয়া গেছে তা প্রায় ২৫ লক্ষ বছরের পুরনো। হোমো হ্যাবিলিসদের হাতিয়ারের যে সমস্ত ফসিল পাওয়া যায়, তার মধ্যে আছে হাড়ের এবং পাথরের তৈরি ধারাল হাতিয়ার, যা গাছের ডালের সাথে জুড়ে শিকারের কাজে ব্যবহার হতো বলে অনুমান করা হয়। প্রাণী শিকার ছাড়াও এই হাতিয়ার ব্যবহার হতো উদ্ভিদজাত খাদ্য সংগ্রহে। হাতিয়ারের সাহায্যে আহার জোগাড়ের এই অধ্যায় আদিম মানুষদের কেবল খাদ্যের সরবরাহ ও বৈচিত্র্যই বাড়ায়নি এটি সভ্যতার দিকে মানুষের প্রথম পদক্ষেপও বটে। কেননা এই হাতিয়ারের সাহায্যে খাবার জোগাড়ের মাধ্যমেই মানুষ ক্রমাগত আরো বেশি ঝাঁক জীবে পরিণত হয়, মানুষের মাঝে আবির্ভাব ঘটে যৌথ শ্রমের—গোড়াপত্তন হয় সভ্যতার প্রথম বীজ—মানবিক যূথবদ্ধতার।

খাদ্য জোগাড়ে আদিম মানুষের এই বর্ধিত সামর্থ্য যেমন তার বংশ বিস্তারে সহায়ক হল, তেমনি খাদ্যও কিছুটা দুর্লভ করে তুলল। খাবারের খোঁজেই হোক আর অন্য কোনো কারণেই হোক, বিজ্ঞানীরা মনে করেন প্রায় ১০ লক্ষ বছর আগে আফ্রিকা থেকে এই আদিম মানুষেরা একদিকে ছড়িয়ে পড়ে ইউরোপে এবং অন্যদিকে এশিয়ায়, যদিও এই অনুমানও যথেষ্ট তর্ক সাপেক্ষ। ১৯৯০-এর দশকে এশিয়ার বিভিন্ন স্থানে আবিষ্কৃত ফসিল ও প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের ভিত্তিতে অনেক বিজ্ঞানীই এখন আফ্রিকাকে আদি ঋজু মানবের একমাত্র আদি আবাসস্থল বলে মানতে রাজি নন। হতে পারে এশিয়া, আফ্রিকা ও এশিয়ায় যে আদিমানবের খোঁজ চলছে, তা ভিন্ন প্রজাতি হতে উদ্ভূত। কিন্তু এটা নিশ্চিত যে অন্তত পাঁচ লক্ষ বছর আগেই এশিয়ায় এই ঋজু মানবেরা বিচরণশীল ছিল, যাদের নিদর্শন হিসেবে আমরা পিকিং মানব ও জাভা মানবের কথা জানি।

অন্য যে মানবিক সামর্থ্যটি সভ্যতার দিকে মানুষের যাত্রাকে ত্বরান্বিত করেছে তা হল ভাষা। যদিও ভাষার ক্ষেত্রে সরাসরি কোনো প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ পাওয়া যায় না, ঋজু মানব বা হোমো ইরেকটাসের স্বরযন্ত্রের আকৃতি দেখে অনুমান করা যায় যে, তারা আজকের মানুষের মতোই সমপরিমাণ ধ্বনি উৎপাদনে সক্ষম ছিল। এছাড়াও এই স্তরের হাতিয়ারগুলোর গড়ন দেখে বলা যায় যে, এগুলো ব্যবহারের জন্য যে স্তরের পারস্পরিক যোগাযোগ প্রয়োজন তা কেবল ভাষার মাধ্যমেই সম্ভব। বিশেষত দলবদ্ধ শিকার, খাবার ভাগ করা প্রভৃতি কাজ ভাষিক যোগাযোগ ছাড়া সম্ভব নয়, কাজেই এই স্তরেই মানুষ সভ্যতা সৃষ্টির আরেক সামর্থ্য অর্জন করে আর তা হলো ভাষা।

ঋজু বিচরণ, হাতিয়ারের ব্যবহার ও ভাষিক যোগাযোগ এই তিনটি মিলিয়ে আদিম মানুষ সভ্যতার যে প্রাথমিক শর্ত তৈরি করেছিল তা আরো অনেক বেশি গতিশীল হল আজ থেকে প্রায় চার লক্ষ বছর আগে মানুষের আগুনের ব্যবহার শিখবার মধ্য দিয়ে। তারপর থেকে ক্রমাগত নানা শক্তি-সামর্থ্য অর্জনের মধ্য দিয়ে, একই সাথে জৈবিক বিবর্তনের বিচারে এক থেকে দুই লক্ষ

বছর সময়কালের মধ্যে হোমো ইরেকটাস হয়ে উঠেছে আজকের মানুষ বা হোমো স্যাপিয়েন্স। জীবাশ্মবিদেরা এই সময়কালে দুটি স্তরের কথা বলেন—আর্কাইক হোমো স্যাপিয়েন্স এবং নিয়ানডারথাল মানব। প্রথম স্তরটি দুই লক্ষ হতে এক লক্ষ বছর আগের এবং নিয়ানডারথাল মানব পৃথিবীতে বিচরণশীল ছিল আজ থেকে প্রায় ৪০ হাজার বছর আগ পর্যন্ত।

নিয়ানডারথাল স্তর থেকেই মানুষ হয়ে উঠেছিল হাতিয়ার তৈরিতে দক্ষ এবং শিকারে কৌশলী। এ পর্যন্ত অনুসন্ধানে এ স্তরের বিশেষায়িত হাতিয়ারই মিলেছে প্রায় ৬০ ধরনের, যার মধ্যে আছে নানা ধরনের ছুরি, আঁচড়ানি, ছেদক ও বর্শা। আদিম শিকার যুগের উচ্চ স্তরে মানুষ গাছের ডাল, হাড় ও পাথর দিয়ে আবাস গড়তেও শিখেছিল, কোনো কোনো ক্ষেত্রে গুহার মুখে পাথর দিয়ে আরো নিরাপদ আবাস তৈরি করত। শিকার যুগের এই স্তরেই মানুষের মাঝে প্রথম টোটেমের আবির্ভাব ঘটে। টোটেম বলতে বোঝায়, কোনো শিকারি জাতি যখন একটি নির্দিষ্ট প্রাণীকেই নিজেদের একমাত্র শিকার হিসেবে চিহ্নিত করে একটি বিশ্বাসজাত আচার পালন করে। নৃতাত্ত্বিকেরা মনে করেন, এই টোটেম ব্যবস্থাই ধর্মের আদি রূপ। টোটেমের আবির্ভাব একদিকে যেমন মানুষের আরো সম্ভাবনাময় যুথবদ্ধতার শর্ত তৈরি করে, তেমনি তা সভ্যতার পথে উত্তরণের ক্ষেত্রে মানবিক চিন্তন সামর্থ্যের আরেকটি অগ্রসর ধাপকেও ইঙ্গিত করে। এই টোটেম ব্যবস্থাকে ঘিরেই পরে আধুনিক হোমো স্যাপিয়েন্সদের সমাজব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল। জৈবিক বিবর্তনের বিচারে আজ থেকে ৩০ হাজার বছর আগেই নিয়ানডারথাল যুগ শেষে এই হোমো স্যাপিয়েন্সদের পাওয়া যায়—এমন জৈবিক গঠনে যারা পুরোপুরি আজকের আধুনিক মানুষের মতোই।

সেই সময় থেকে খ্রীস্টের জন্মের ১০ হাজার বছর আগ পর্যন্ত শিকারী ও চয়নকারী মানুষ অর্জন করেছে বহুমাত্রিক উৎকর্ষ যার প্রতিটিই ছিল সভ্যতার পথে একটি নতুন ধাপ। শুধু টোটেমের আবির্ভাবই নয়, এই স্তরেই মানুষের চিন্তা ও বিশ্বাসের প্রতীকী

প্রকাশের শুরু যাকে বলা যায় চিত্রকলা ও বর্ণ-ভাষার আদিরূপ। গুহার দেয়ালে দেয়ালে ছবি এঁকে এই সময়ের মানুষেরা নিজেদের সময় ও স্মৃতিকে ধরে রাখতে চেয়েছে, এ কারণে এটি মানুষের প্রথম তথ্য ব্যবস্থাও বটে। এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত প্রায় দুইশত গুহার দেয়ালে রয়ে গেছে সেই যুগের মানুষের চিন্তার আদিমতম শৈল্পিক প্রকাশের স্বাক্ষর, যার মধ্যে আছে ৩০ থেকে ১২ হাজার বছরের পুরনো গুহাচিত্র। এই সব গুহাচিত্রে আছে বাইসন, ষাঁড়, ঘোড়াসহ বহু জীবজন্তুর ছবি, শিকার দৃশ্য—এমনকি পোষা কুকুরসহ শিকারীর চিত্র পর্যন্ত। তবে ঠিক কী কারণে প্রাগৈতিহাসিক শিকারী মানুষেরা গুহাচিত্র আঁকতো তা নিয়ে আমরা কেবল অনুমানই করতে পারি। হয়তো এই চিত্র সেই যুগের মানুষের শিকার প্রার্থনার রূপ, হয়তো সেগুলোর মধ্য দিয়ে তারা অতিপ্রাকৃতিক শক্তির কাছে প্রার্থনা জানাতো কাঙ্ক্ষিত শিকার পাওয়ার জন্য। কারণ যাই হোক না কেনো এই গুহাচিত্র করা যে একটি আদিম আচারনিষ্ঠতা, সেটা নিশ্চিতভাবেই বলা যায়।

মানব প্রজাতির মোট বয়সের প্রায় ৯৫ ভাগ সময় কেটেছে এই প্রাগৈতিহাসিক শিকার যুগে। শিকার যুগের চরম উৎকর্ষের কালে, আজ থেকে প্রায় ৩৫ হাজার বছর আগে পৃথিবীর জলবায়ুতে একটি বড় পরিবর্তন আসে, শুরু হয় বরফ যুগ যা স্থায়ী হয়েছিল আজ থেকে প্রায় ১২ হাজার বছর আগ পর্যন্ত। এই পরিবর্তন মোকাবেলা করতে গিয়ে মানব প্রজাতি আরো একবার ছড়িয়ে পড়ে পৃথিবীর নানা দিকে, এই বিপর্যের মুখে পড়ে কমে আসতে থাকে শিকারযোগ্য প্রাণীর সংখ্যাও। এই বিপর্যয়ের বিরুদ্ধে লড়তে গিয়ে বরফ যুগের শেষ ভাগে, আজ থেকে প্রায় ১০ হাজার বছর আগে মানুষের ইতিহাসে ঘটে যায় একটি বৈপ্লবিক ঘটনা, খাদ্য শিকার ও সংগ্রহের সাথে মানুষ আবিষ্কার করে ফেলে খাদ্য উৎপাদন তথা কৃষি ও পশুপালন, সভ্যতার ইতিহাসে যা নিওলিথিক রেভুলুশন বা নব্যপ্রস্তর বিপ্লব হিসেবে পরিচিত।

নব্যপ্রস্তর যুগের শুরুতে মানুষ আগে কৃষি আবিষ্কার করেছিল নাকি পশুপালন আগে শুরু করেছিল সেটিও ইতিহাসের অন্য

অনেক কিছুর মতোই এখনো একটি অমীমাংসিত বিষয়। কিন্তু গোটা মানবেতিহাস জুড়ে আর একটি ঘটনাও পাওয়া যাবে না, যার প্রভাব এতো ব্যাপক। আদিম শিকার ও সংগ্রহ নির্ভরতা কাটিয়ে মানুষের খাদ্য উৎপাদনকারী প্রজাতি হিসেবে আত্মপ্রকাশের মাধ্যমে মানুষের সাংস্কৃতিক ও সামাজিক অভিযাত্রা শুরু হয়। কৃষির উদ্ভবই রাষ্ট্র-সমাজের উদ্ভবের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও সামাজিক ভিত গড়ে উঠবার সুযোগ করে দেয়। খাদ্যের জন্য প্রকৃতির ওপর নির্ভর না করে নিজে খাদ্য উৎপাদনের যে ক্ষমতা মানুষ অর্জন করে, তার মাধ্যমে প্রজাতি হিসেবে বংশ বিস্তারের ক্ষেত্রে আর সব প্রজাতিকে ছাড়িয়ে যায়, আধিপত্য কায়েম করে আর সব প্রজাতির ওপর। স্থায়ী আবাস, নিশ্চিত আহার আর বাড়তি অবসর মানুষকে ঠেলে দেয় আরো নিত্য নতুন আবিষ্কারের দিকে। একে একে মানুষের আয়ত্তে আসে যাবতীয় ধাতুর ব্যবহার। যে কারণে কৃষির আবির্ভাবকে মানুষের বিবর্তন নয় বিপ্লব হিসেবেই বিবেচনা করে থাকেন পণ্ডিতেরা।

কৃষির আবির্ভাবের ফলে মানুষ ও প্রকৃতির সনাতন সম্পর্ক ভেঙ্গে গিয়ে নতুন এক সম্পর্কের সূচনা হল, মানুষ আর খাদ্যের জন্য প্রকৃতির ওপর পুরোপুরি নির্ভরশীল থাকল না। কৃষির মাধ্যমে প্রকৃতির নিয়মকানুন শিখে সেই প্রকৃতিকেই নিয়ন্ত্রণ করা শিখল মানুষ। অন্যদিকে খাবারের প্রাচুর্য প্রাকৃতিক নির্বাচনের লড়াইয়ে প্রকৃতির এই অভিনব, বিদ্রোহী প্রজাতিটিকে প্রায় অপ্রতিরোধ্য করে তুলল। পরের কয়েক হাজার বছরে মানুষের জনসংখ্যা বৃদ্ধিই সেই জয়ের সবচেয়ে বড় স্মারক হতে পারে। শিকার যুগের যাযাবর গোত্র সমাজ ভেঙ্গে গিয়ে সে জায়গায় দেখা দিল স্থায়ী গ্রাম সমাজ যার মধ্য দিয়ে মানুষের সভ্যতা পূর্ণ অবয়ব নিয়ে যাত্রা শুরু করে। কৃষির আবির্ভাবই হচ্ছে সেই ঘটনা যার মধ্য দিয়ে মানুষের আদিম সাম্যবাদী সমাজ ভেঙ্গে গিয়ে ব্যক্তি মানুষের মালিকানা নির্ভর সমাজ ব্যবস্থা শুরু হয়।

নব্যপ্রস্তর যুগের কৃষি সভ্যতা গড়ে উঠেছিল গ্রামকে কেন্দ্র করে। এই সময়ের সবচেয়ে বড় সভ্যতাগুলোকে বলা হয় সেচ

সভ্যতা বা হাইড্রলিক সিভিলাইজেশন; কৃষির উৎকর্ষ আর সভ্যতার উৎকর্ষ যে এসময়ে সমান্তরাল ছিল, এই নামকরণই তা বলে দেয়। শিকারী জীবনে পশুর দলের পেছনে ছুটে বেড়াতে হতো বলে স্থায়ী বসতি স্থাপন করা চলত না। কিন্তু চাষাবাদ ও পশুপালনের জন্য এক জায়গায় স্থির হওয়ার প্রয়োজন দেখা দেয়। এক জায়গায় গেড়ে বসবার সাথে সাথে মানুষের সেই সমাজের মাঝে একটি নতুন জিনিসের আবির্ভাব ঘটে, তা হল সম্পত্তি তথা মালিকানা ব্যবস্থা। আধুনিক সভ্যতার মৌলিক ভিত্তি হিসেবে এই মালিকানার কথাও বলে থাকেন পণ্ডিতেরা। তবে মালিকানাহীন সমাজ থেকে একদিনে ব্যক্তি মালিকানার সমাজ দাঁড়িয়ে যায়নি। সমাজের ব্যবস্থার পুরো অবয়বের মতোই এই সমাজের আবির্ভাব ঘটেছে যৌথমালিকানা, গোষ্ঠীমালিকানার ধাপ পেরিয়ে ধীর গতিতে। আবার সভ্যতা বিকাশের এই ধারা আবার একই সাথে পৃথিবীর সব জায়গায় ঘটেনি। এক অঞ্চলের সমাজ যখন পুরোদস্তুর কৃষক সমাজ হয়ে গেছে অন্য অঞ্চলে তখনো মানুষ শিকার নির্ভর গোত্র সমাজে রয়ে গেছে এমন দৃষ্টান্তও রয়েছে অনেক।

বরফ যুগ শেষে কৃষির আবিষ্কার মানুষের সভ্যতার দিকে অভিযাত্রায় যে গতিবেগ সঞ্চার করেছিল তা পূর্ণতা পায় কৃষি যুগে নগরের আবির্ভাব ঘটায়। কৃষি যুগের সবচেয়ে যুগান্তকারী ঘটনা বলা হয় এই নগর বিপ্লবকে। এরই সাথে ক্রমাগত কৃৎকৌশলজনিত আবিষ্কার মানুষকে সভ্যতার দিকে ঠেলে দিয়েছে ধাপে ধাপে। ঐতিহাসিকরা এই কারণেই এই কৃষি যুগের স্তরকে ভাগ করেন লৌহযুগ, তাম্রযুগ, ব্রোঞ্জযুগ ইত্যাদি ভাগে। প্রাচীন যুগের মানুষের ইতিহাস আলোচনা করতে গিয়ে প্রখ্যাত নৃতাত্ত্বিক লুই হেনরি মর্গান তার এনসিয়েন্ট সোসাইটি বইটিতে এই তামা-পাথরের যুগকে নগর সভ্যতার প্রস্তুতি পর্ব হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। আদিম সাম্যবাদী সমাজ ভেঙে পড়বার মধ্য দিয়ে মানুষের প্রাক-সভ্যতা যুগ যেমন শেষ হয়ে যায়, তেমনি দাস অর্থনীতি নির্ভর নগর সমাজ গড়ে উঠবার মধ্য দিয়ে মানব সভ্যতার গোড়া পত্তন ঘটে, ঐতিহাসিক সময় বিচারে আজ থেকে প্রায় ছয় হাজার বছর আগে।

সভ্যতার সূচনা হচ্ছে ইতিহাসের সেই বিন্দু যেখান থেকে পৃথিবী আর মানুষের ইতিহাস একীভূত হয়। সভ্য যুগের শুরু হতে ইতিহাস মানেই মানুষের অর্জনের ইতিহাস, যার সূচনা কৃষি যুগে বীজের ব্যবহার থেকেই। তারপর এসেছে কৃৎকৌশল হিসেবে চাকার আবিষ্কার, খাদ্য উৎপাদনের পশু ও পশু শ্রমের ব্যবহার। আজকের যে আধুনিক মানুষ আমরা দেখতে পাই তার পেছনে রয়েছে চীনের ইয়াং শাও, হরপ্পা আর মহেঞ্জোদারোর সিন্ধু, মিশরীয়, সুমেরীয়, মেসোপটেমিয়ান, গ্রীক, পার্সিয়ানসহ শত শত সভ্যতায় মানুষের অর্জিত তাবৎ অভিজ্ঞান।

০৬ জুলাই ২০০২
লালমাটিয়া, ঢাকা।



যুদ্ধ, শাস্ত্রীয় আদিকল্প ও শাস্ত্রবিদ

এই প্রবন্ধের মূল প্রণোদনা ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের টুইন টাওয়ারে বিধ্বংসী হামলা এবং তার অব্যবহিতকালে পৃথিবীর আর্থ-রাজনৈতিক মানচিত্রজুড়ে উদ্ভূত সংকটের যে অভিনব রূপ উন্মোচিত, তার সাথে/প্রেক্ষাপটে আজকের জ্ঞান-জগতের কেন্দ্রীয় একটি মানব শাস্ত্র হিসেবে নৃবিজ্ঞানের সম্পর্ক/সম্পৃক্ততার স্বরূপ অন্বেষণের তাগিদ। কাজের ওজন বিবেচনা করলে লক্ষ্য হাসিলে প্রবন্ধকারদ্বয়ের সামর্থ্য নিতান্তই অপ্রতুল, ফলে তাগিদের বোঝা বহনও কষ্টকর। নৃবিজ্ঞানের ছাত্র এবং অতঃপর এই 'বিশেষায়িত' শাস্ত্রচর্চাকে সামাজিক উৎপাদনে নিজেদের ব্যক্তিগত ভূমিকা হিসেবে নির্ধারণ; অতঃপর শাস্ত্রটির সাথে বোঝাপড়া পোক্ত করতে গিয়ে খাবি খাওয়া; অতঃপর টুইন টাওয়ারে হামলা, মার্কিনি 'অনন্ত সুবিচার' এর বোমার ঘায়ে আফগানিস্তানের প্রস্তরযুগে প্রত্যাবর্তন এবং তখন সম্বিত ফিরে 'বিশেষায়িত' জ্ঞানসহ নিজেদের আবিষ্কার করা একেবারে প্রস্তুতিহীন, ফাঁপা। তারও পরে সাম্রাজ্যবাদ আরো উদোম হয়ে হানা দেয় ইরাকে, বোমা পড়ে ব্যাবিলনে, ঘোমটা খসে পড়া টেলিভিশনের পর্দায় মৃত্যু বৃষ্টির রাত শেষে বাগদাদ নগরীর দণ্ডিত ভোর দেখে আমরা ক্লাসে গিয়ে দাঁড়াই চক-ডাস্টার

হাতে। যা দেখলাম তা নিয়ে শিক্ষার্থীদের তেমন একটা কিছু বলার থাকে না। নৃবিজ্ঞান নামক শাস্ত্রের সাথে সম্পর্কের এই সংক্ষিপ্ত অতীত জুড়ে জমতে থাকে সংশয়। এই সংশয়ী পরিস্থিতির সাথে মোকাবেলার তাগিদ টের পাই, সামর্থ্যে না কুলালে পরে তা এলোমেলো লিপিবদ্ধ হয় প্রবন্ধ নামে–উদ্দেশ্য দশের সামনে হাজির করা। এই আমাদের যৌথ প্রবন্ধের আত্মজীবনী।

আমাদের এই অন্বেষণের পদ্ধতিগত পরিবৃত্তের আওতায় রয়েছে যুদ্ধের মতো একটি আর্থ-রাজনৈতিক ঘটনা, যাকে আমরা মানুষের প্রজাতিগত স্থিতির বিপরীতে একটি চরমতম বস্তুগত পরিস্থিতি হিসেবে বিবেচনা করতে পারি, তার প্রতি প্রাতিষ্ঠানিকভাবে চর্চিত একটি বিজ্ঞানের সংবেদনশীলতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা। এই প্রয়োজনে বিবেচনায় নেয়া হয়েছে নৃবিজ্ঞানের বিকাশ ইতিহাসে তার পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্র বা পরিসর নির্ধারণে তাত্ত্বিক বিতর্ক এবং প্রবণতাগুলো। অত্যাবশ্যকভাবে আলোচনায় এসেছে সমাজ গবেষণার ক্ষেত্রে নৈতিক বিবেচনা বা এথিক্যাল কনসার্ন এবং বর্ণিত পরিস্থিতিতে তার প্রতিফলনের মাত্রা বিচারের বিষয়টি। যুদ্ধের মতো একটি ঘটনা এবং সমাজ চিন্তায় তার অভিঘাতকে বোঝার চেষ্টা করা হয়েছে গ্রীক-পার্সিয়ান যুদ্ধের সাথে হেরোডেটাসের ইতিহাস চিন্তার ধরন, ইংল্যান্ডের গৃহযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে টেসিটাসের মানব উপলব্ধি বা প্রুশিয়ান যুদ্ধের পরে ডুর্খাইমের আলোচনার মতো তাত্ত্বিক ঐতিহ্যের নিরিখে। বিশ্লেষণকে ঋদ্ধতর করবার জন্য আলোচনাকে নৃবিজ্ঞান বা একক কোনো শাস্ত্রীয় প্রাচীরে আবদ্ধ না রেখে নয়া সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন এবং বৈশ্বায়নের মতো এজেন্ডাকে মোকাবেলায় পশ্চিমা কর্তৃত্বের পরিবৃত্তে বিকশিত মানব বিজ্ঞানগুলোর ভূমিকা বোঝার চেষ্টা হয়েছে কিন্তু তার পূর্ণাঙ্গ এবং আলাদা করে বোঝাপড়ার ঘাটতি প্রবন্ধটির একটি অসম্পূর্ণতা হিসেবেই থেকে গেল।

২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বরের পর, যখন বলা হচ্ছে বিশ্ব আর কখনোই আগের মতো হবে না, সেই পরিবর্তিত পরিস্থিতির ধারাবাহিকতাকে আমরা জ্ঞানকাণ্ডের বিভিন্ন শাখায় কীভাবে

চিহ্নিত করতে পারি বা নৃবিজ্ঞানের বিকাশকে আমরা যখন উপনিবেশবাদ থেকে পশ্চিমা আধিপত্যের (আসাদ, ১৯৭৩ ও ১৯৮৮) ছায়ায় খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম, তখন ভূগোল জুড়ে এই আলোড়ন আমাদের উপলব্ধিতে নতুন কী যোগ করতে পারে, সে আলোচনা তুলবার প্রয়াস এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্যের পর্যায়ে পড়ে। অনিবার্যভাবে এসে পড়ে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর আওতায় বিশেষায়িত জ্ঞান চর্চা করবার হেতু নৃবিজ্ঞানী তথা অন্য সমস্ত শাস্ত্রবিদদের নির্ধারিত বা প্রত্যাশিত সামাজিক সক্রিয়তার বিচারে সংকট প্রশ্নে তাদের ভূমিকার প্রশ্নটিও। এই বোঝাপড়ায় নৃবিজ্ঞানের সাম্প্রতিক পরিসরে জন্ম নেওয়া বিরুদ্ধ-ভাবনার প্রয়োগ প্রয়াস যেমন এই প্রবন্ধে বিদ্যমান তেমনি জ্ঞান-জাগতিক তন্ময়তার দোহাই পেড়ে বায়বীয় নিরপেক্ষতার দিকে ধাবিত হওয়া বা কর্তব্য নির্ধারণের প্রশ্নে গণতান্ত্রিক মতৈক্যে পৌঁছানোর কসরত, কোনোটিই এর অভিষ্ট লক্ষ্য নয়।

পরিস্থিতির বিবরণ : একটি আন্তর্জাতিক দলিল

যে পরিস্থিতির সাথে আমরা নৃবিজ্ঞানের সংবেদনশীলতা বোঝার চেষ্টা করছি, প্রতিটি নাগরিক এবং অনাগরিক মানুষেরই তার একটি নিজস্ব বিবরণ বা নিজস্ব পাঠ আছে। এই পাঠ নির্মাণ নিয়ন্ত্রণে ক্ষমতা এখানে মিডিয়ার চেহারা নিয়ে হাজির আর আমরা গ্রাহকেরা শিকার হয়ে বসে থাকি শিকারীর খোঁজে। বুদ্ধিবৃত্তি তথা শাস্ত্রজগতেও বিবরণ তৈরি হয়, আমরা ব্যাখ্যাতাদের বিবরণ পাই, চমস্কি (২০০১) লেখেন '... এই প্রথমবার বন্দুকের নল উল্টা দিকে ঘুরেছে', এডোয়ার্ড সাঈদ (২০০১) বলেন, 'ইসলাম এবং পশ্চিম, দুই অপ্রতুল শিরোনাম।' কাজেই বিবরণ তৈরি এই পরিস্থিতি, এমনকি যুদ্ধেরও একটি অংশমাত্র, যুদ্ধের সাথে শাস্ত্রের যোগ এই পথ দিয়েই। একারণে নতুন কোনো বিবরণ তৈরির চেয়ে মূল প্রসঙ্গ উত্থাপনের জন্য একটি প্রায়োগিক বিবরণ হিসেবে বেছে নেওয়া যাক পরিস্থিতি বিষয়ে সর্বশেষ প্রকাশিত আন্তর্জাতিক দলিলটি।

এ বছরের ৫ মে লন্ডনে প্রকাশিত আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের বার্ষিক রিপোর্টের পত্রিকান্তর প্রকাশে

জানা যায়, '... যুক্তরাষ্ট্রের ওপর হামলা এবং এর প্রতিক্রিয়ায় সন্ত্রাসবিরোধী মার্কিন তৎপরতার ফলে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী এবং ধর্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভেদ বেড়েছে। বিভিন্ন অঞ্চলে যেসব অন্যায় অবিচার চলছে তার থেকে নজর অন্যত্র সরে যাচ্ছে। ... সন্ত্রাসবাদী যুদ্ধ শুরুর পর বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সরকার এ ধারণাতেও উপনীত হয়েছে যে, জরুরী পরিস্থিতিতে মানুষের সাধারণ অধিকারকে বিসর্জন দেওয়া যায়। ... ব্রিটেন ও যুক্তরাষ্ট্রসহ বিভিন্ন দেশের সরকার সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধের অজুহাতে মানবাধিকার পদদলিত করছে। ... নিরাপত্তা, রাজনীতি ও মুনাফার নামে বিভিন্ন দেশের সরকার, সশস্ত্র গোষ্ঠী এবং কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানগুলো মানুষের অধিকারের তোয়াক্কা করছে না। ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বরের এক দিন আগেও যা অগ্রহণযোগ্য ছিল, আজ তা স্বাভাবিক বিষয়ে পরিণত হচ্ছে। শীতল যুদ্ধের সময় পশ্চিমের দেশগুলো নির্যাতন, বিনা বিচারে আটক, খণ্ডিত বিচারের মতো ঘটনায় ক্ষোভে ফেটে পড়ত। কিন্তু তারা আজ কোনো কোনো দেশের ক্ষেত্রে, কিছু কিছু মানুষের ক্ষেত্রে এসব মেনে নিতে যেন প্রস্তুত হয়ে উঠেছে। ... সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধে কোটি কোটি ডলার ব্যয় করা হলেও বিশ্বের উত্তর থেকে দক্ষিণে, ধনী-গরিব নির্বিশেষে মানুষ আজ অনেক বেশি নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। শীতল যুদ্ধের পর মানুষের এ রকম অসহায়ত্ব আর সৃষ্টি হয়নি। ... বিশ্বের অনেক দেশের উদ্বেগজনক মানবাধিকার চিত্র এখন আর গুরুত্ব পাচ্ছে না। অনেক দেশেই মানবাধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে। কিন্তু সব দেশের দিকে সমানভাবে নজর দেওয়া হচ্ছে না। অনেক ঘটনাই সংবাদ মাধ্যমের আড়ালে থেকে যাচ্ছে।' (প্রথম আলো। ২৯ মে ২০০৩)

রিপোর্ট উত্থাপনকালে সংস্থা প্রধান আইরিন খানের বক্তব্য থেকে আমরা আরো জানতে পারি, '... শীতল যুদ্ধের পর যে কোনো সময়ের তুলনায় বিশ্ব এখন অনিরাপদ। পশ্চিমা দেশগুলোর সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধ বিশ্বকে নিরাপদের ধারেকাছেও নিতে পারেনি বরং ওই সব দেশগুলো মানবাধিকার সঙ্কুচিত, আন্তর্জাতিক আইন খর্ব এবং বিভিন্ন সরকারকে ওই সব অপকর্ম রাখঢাক করার সুযোগ দিয়ে বিশ্বকে আরো বিপজ্জনক করে তুলেছে। ... বর্তমান

পরিস্থিতিতে বিভিন্ন জাতি ও ধর্মের ভিত্তিতে মানুষের মধ্যে বিভেদ আরো বেড়ে সংঘাতের বীজ রোপিত হয়েছে। ... এই দেশটি (যুক্তরাষ্ট্র) নিজের স্বার্থে মানবাধিকারের বিষয়গুলো নিজের মতো করে নির্ধারণ করছে। ব্যাপক বিধ্বংসী অস্ত্র আছে সন্দেহে ওয়াশিংটন ইরাক আক্রমণ করেছে কিন্তু বিশ্বের অনেক স্থানে ব্যাপক আকারে মানবাধিকার লঙ্ঘন ও সংঘাতের পেছনে অস্ত্র রপ্তানীর প্রত্যক্ষ প্রমাণ থাকলেও মার্কিন প্রশাসন চোখ বুজে থাকছে। কলম্বিয়া, বুরুন্ডি, চেচনিয়া ও নেপালের মতো দেশের মানুষকে সংঘাতের জন্য কঠিন মূল্য দেওয়া সত্ত্বেও প্রচার মাধ্যম তা ভুলে থাকছে। ... আফগানিস্তানে যুদ্ধ শেষ হওয়ার ১৮ মাস পরে লাখ লাখ আফগান এক অনিশ্চিত ও অনিরাপদ ভবিষ্যতের মুখোমুখি। ইরাকে মানবাধিকার ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় সত্যিকারের কোনো পদক্ষেপ নেওয়া না হলে ইরাকীদেরও আফগানদের দশা হবে।'(প্রাগুক্ত)

কাজেই বোঝা যাচ্ছে একটি চরম পরিস্থিতির মুখোমুখি আমরা, আজকের সময় ইতিহাসের একটি প্রদোষকাল, অনেকে মনে করছেন 'এবার পাশ ফিরছে ইতিহাস'। কাজে কাজেই, এই পরিস্থিতি যে মানুষের বোধ ও চিন্তনকে বদলে দিচ্ছে এবং আরো দেবে সেটা পরিষ্কার। পৃথিবীও নিউ ইয়র্কের দিগন্ত রেখার মতো আর কখনোই আগের মতো হবে না। নিঃসন্দেহে মানব শাস্ত্রগুলোও বদলে যাওয়া জ্ঞান যোগাযোগ দশায় নতুন প্রশ্নের মুখোমুখি হবে। উপনিবেশবাদের সময়কার মানবশাস্ত্র এবং উত্তর উপনিবেশিক সময়ের মানবশাস্ত্র যে কারণে এক হয় না, একই কারণে উদ্ভূত পরিস্থিতির একটি গাঢ় স্বাক্ষর প্রাতিষ্ঠানিকভাবে চর্চিত মানবশাস্ত্রগুলোর ওপরও পড়তে বাধ্য, সেটা পড়ছেও। এবং সেটা ঘটছে শাস্ত্র চর্চার ভূগোল নিরপেক্ষভাবেই। কাজেই এই পরিবর্তিত সময়ে আমাদের নিজ কর্তব্য নির্ধারণের প্রথম উপায়, পরিস্থিতির সাথে শাস্ত্রের সংবেদনশীল জায়গাসমূহ চিহ্নিত করা এবং সমস্ত শাস্ত্র প্রাচীরের উর্ধ্বে উঠে মানবীয়তাকে পুনর্নির্মাণের দৃষ্টি হিসেবে নিয়ে প্রকৃত সামগ্রিকতা অর্জন করা।

আমরা বলেছি, যুদ্ধ মানুষের প্রজাতিগত স্থিতির বিপরীতে এক চরম বাস্তব সংকট। ক্ষুধা, দারিদ্র, প্রাকৃতিক বিপর্যয়সহ মানুষের মৌলিক সংগ্রামের অন্য যে কোনো চেহারাই এই পরিস্থিতির কাছে নস্যি। এই সেই পরিস্থিতি যখন মানুষের প্রজাতিগত ধারাবাহিকতা বিনষ্ট হয়, উম্মে কসরে চার সন্তানের লাশ কবর দেন পিতা নিজে। ক্ষমতার অভ্যন্তরীণ সংকট মেটানোর শেষ রাস্তা হিসেবে প্রজাতি পরস্পরের 'অপর'কে হত্যা করে। সপ্তদশ শতকের ইংরেজ দার্শনিক হবস্ (১৬৫১) বলেছিলেন, 'যুদ্ধ মানে মাত্র ঘটনা নয়, আবহাওয়া। সময় যুদ্ধে একটা বড় ভূমিকা পালন করে। শুধু খণ্ড খণ্ড লড়াই বা সংঘাতকেই যুদ্ধ গণ্য করা হয় না। যুদ্ধের মাধ্যমে মীমাংসার ইচ্ছাটা যখন থেকে পরিষ্কার ব্যক্ত হয়—সময়ের সেই পরিসরের সবটুকুকেই যুদ্ধের অন্তর্ভুক্ত ধরে নেওয়া যায়। যুদ্ধের মধ্যেই এই 'সময়' বিষয়টা অন্তর্ভুক্ত।'

সুতরাং আমরা একটি যুদ্ধ সময়ে বাস করছি। এই যুদ্ধ সময়কে বুঝতে গিয়ে হবস্ আদি দশায় মানব জীবনের প্রতিকৃতি এঁকেছিলেন স্মরণীয় কিছু বিশেষণ দিয়ে—সলিটারি, পুওর, ন্যাস্টি, ব্রুটিশ, শর্ট। 'প্রত্যেকের সাথে প্রত্যেকের যুদ্ধ' এই দশার বৈশিষ্ট্য বলে তিনি উল্লেখ করেন। হবসের সময়ের সাড়ে তিনশ বছর পরে এসে আমরা মানব জীবনের এই দশা দেখতে পাই ইরাক, আফগানিস্তান, প্যালেস্টাইন, গুজরাট, মোজাম্বিক, সোমালিয়া, নাইজেরিয়াসহ প্রায় গোটা দরিদ্র বিশ্বজুড়ে। যেহেতু যুদ্ধ জিনিসটাই একটি সময়, তার ঝাপটা আমাদের চারপাশেও লাগে। যে পরিস্থিতিতে গোটা ইতিহাসজুড়ে পণ্য সভ্যতাগুলো যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে, তার প্রবল উপস্থিতি আমাদের সময়েও আছে। এই সেই সময় যখন বৈশ্বায়নের মুলা আর মৌলবাদের জুজু ঝুলিয়ে, দুই মিলিয়ে প্রকারান্তরে আদি মৌলবাদ জারি থাকে। এই উপলব্ধি ভারতের পদার্থবিদ, নারীবাদী ও পরিবেশবাদী আন্দোলনকর্মী বন্দনা শিবার (২০০৩)। তিনি বলেন, 'মৌলবাদের দুটি সমকেন্দ্রাভিমুখী স্বরূপ এখন বিদ্যমান যারা পরস্পরকে শক্তি ও

সমর্থন যোগায়। প্রথমটি বৈশ্বায়নের নিজস্ব সৃষ্টি—বাজার মৌলবাদ। এই মৌলবাদ জীবন মানে পণ্য এবং সমাজ মানে বাজার বোঝে, বাজারকে মনে করে মানুষের যাবতীয় সক্রিয়তার অদ্বিতীয় ক্ষেত্র এবং অনিবার্য পরিণতি।' অন্যদিকে "বৈশ্বায়নের এই বাজার মৌলবাদ এবং তৎপ্রসূত অর্থনৈতিক বিচ্ছিন্নতা জন্ম দিচ্ছে 'ধর্মীয় মৌলবাদ'/জাতিগত ঔশ্বিবাদ নির্ভর রাজনৈতিক দলের, শক্তি যোগাচ্ছে পিতৃতন্ত্র আর বর্ণভেদকে এবং নিজে শক্তি সঞ্চয় করছে তৎপ্রসূত অপরায়ণের রাজনীতি থেকে।"

এখন কথা হচ্ছে, এই যাবতীয় সবকিছুর সাথে শাস্ত্রচর্চার সম্পর্ক কোথায়? প্রচলিত ধারণা মোতাবেক আমরা প্রাতিষ্ঠানিক বিদ্যায়তনকে সামাজিক সক্রিয়তা এবং সমসাময়িকতা 'মুক্ত' সিলেবাস, পাঠদান, পরীক্ষা ও ফলাফলের সমষ্টি হিসেবে দেখতে পছন্দ করি। আমাদের ছাত্র-শিক্ষকদের রাজনৈতিক সক্রিয়তার সাথে শাস্ত্রচর্চার তেমন কোনো যোগ নেই। আমরা 'বিদ্যা' এবং পরিস্থিতি বা সমাজবদ্ধ মানুষের রাজনৈতিক কর্তব্যের ফারাক বজায় রাখতে পেরে স্বস্তি পাই। ফলত শাস্ত্র ক্ষমতার হাতে এবং শাস্ত্রবিদ বাজারের হাতে কয়েদ থাকেন। অসম সামাজিক উৎপাদন ব্যবস্থা, ক্ষমতার বিন্যাসকে টিকিয়ে রাখবার জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান উৎপাদনের মাধ্যম হিসেবে নিজের জান্তে বা অজান্তে আমরা ব্যবহৃত হই। অন্যভাবে বলা যায়, উৎপাদনের অপরিহার্য অঙ্গ—বিরাজমান জ্ঞান-যোগাযোগ দশায় আধিপত্য বিস্তারের কাজে লাগে এই জ্ঞান উৎপাদনের রাজনীতি। ইতিহাস, সমাজ, রাষ্ট্র তথা যাবতীয় মানব শাস্ত্রেই আমরা এই রাজনীতির জাতীয় ও বৈশ্বিক পটভূমি খুঁজে পাই। কাজেই বিদ্যায়তনিক শাস্ত্রচর্চা আর ক্ষমতার সম্পর্কমালা দুনিয়ার তাবৎ বিদ্যাপীঠেরই দ্বান্দ্বিকতার প্রথম ক্ষেত্র।

প্রাতিষ্ঠানিকতার বাইরেও জ্ঞানজাগতিক অনুসন্ধান বিরাজিত বাস্তবতার সাথে সম্পর্করহিত হতে পারে না। জটিলতায় না গিয়ে বলা যায়, জ্ঞানের কোনো বায়বীয় বা অলৌকিক অবতরণ নেই। পরিস্থিতির বস্তুগত শর্ত নির্ভর সামাজিক অস্তিত্বই মানুষের চিন্তা ও তার ভাষিক প্রকাশের ভিত্তি। সপ্তদশ শতকে ইংল্যান্ডের গৃহযুদ্ধের

তাপদাহই দার্শনিক হবস্‌কে মানবীয়তার সংজ্ঞা অবিনির্মাণে প্রণোদিত করে। তারও বহু আগে, খ্রীস্টপূর্ব ৪৫০ সনে গ্রীক ঐতিহাসিক হেরোডোটাস গ্রীক-পার্সিয়ান যুদ্ধের সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট ব্যাখ্যা করেন, যা নৃবিজ্ঞানের সংস্কৃতি অধ্যয়নের ভিত্তি হিসেবে স্বীকৃত। ফরাসী সমাজতাত্ত্বিক এমিল ডুর্খেইম মোকাবেলা করেছেন ফ্রাঙ্কো-প্রুশিয়ান যুদ্ধ পরিস্থিতি। প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, প্রযুক্তিগত অগ্রসরতা, বাজার পরিস্থিতি, যোগাযোগ দশার বিস্তৃতি সব কিছু মানব শাস্ত্রগুলোকে একদফা বদলেছে, বলা যায় আমূলভাবেই। চিন্তার বস্তুগত ভিত্তি আরো পরিষ্কার হয় যখন মধ্য ৫০ ও ৬০-এর দশকে কম্পিউটার প্রযুক্তির বাইনারি কোড এবং লেভি-স্ত্রাউসের বাইনারি বিপরীতের ধারণাকে একসাথে আবির্ভূত হতে দেখি।

আজকের পরিস্থিতিও আমাদের এই ইশারা দেয় যে, আমরা চাই বা না চাই—ক্রান্তিকাল আসন্ন। আমাদের অক্ষমতার জায়গা শাস্ত্রজ্ঞান এবং জারি থাকা পরিস্থিতির একটা যুৎসই সম্পর্ক স্থাপন। অক্ষমতার বোধ এই হুঁশ ফিরিয়ে দেয় যে বাজারি নিয়মে আমদানিকৃত শাস্ত্র, উপনিবেশিক স্থবিরতার নির্বিচার গলাধঃকরণ এর জন্য দায়ী। তখন বিকল্প পথের খোঁজ পড়ে। কোথাও নিশানা পেলে হাঁটা শুরু করি। হয়তো সেই পথের হাল নাগাদ অভিজ্ঞতার বিবরণ আমাদের কহতব্যকে স্পষ্ট করবে।

সাম্প্রতিক নৃবিজ্ঞান : আদিকল্পের সংকট, নিরীক্ষা ও নিশানার স্বরূপ

গবেষণা আদিকল্পের বিচারে আমরা ব্রিটিশ নৃবিজ্ঞানের সবচেয়ে সুসংহত এবং সংগঠিত বিকাশটি দেখতে পাই ১৯৫০ ও ৬০-এর দশকে, যা তৎকালীন উত্তর আমেরিকান নৃবিজ্ঞানের ওপরও সুদূর প্রসারী প্রভাব বিস্তার করে। এসময়কালেও এর কেন্দ্রীয় প্রশ্নটি ছিল নৃবিবরণের মাধ্যমে অন্য সংস্কৃতিকে পরিবেশন/উপস্থাপনের নিখুঁত উপায় কী? সে সময়ে উত্তর আমেরিকার নৃবিজ্ঞান নিজস্ব ঐতিহ্যের সাথে এই প্যারাডাইমের সফল সংশ্লেষ ঘটিয়েছে। এই সময়ে এসে এই সংশ্লেষিত আমেরিকান নৃবিজ্ঞান প্রভাব বিস্তার করছে স্বয়ং ব্রিটিশ নৃবিজ্ঞানের ওপর (মার্কাস ও ফিশার, ১৯৯৯)। কাজেই আজকের আমেরিকান নৃবিজ্ঞানকে ব্রিটিশ ও আমেরিকান নৃবিজ্ঞানের

সংশ্লেষ হিসেবে বিবেচনা করলে তার ওপরে প্রভাব বিস্তারকারী পশ্চিমের নৃবিজ্ঞানের তৃতীয় শক্তিশালী ধারা হিসেবে আমরা পাই ফরাসী নৃবিজ্ঞানকে। ফলে আজকের পশ্চিমা নৃবিজ্ঞানকে আমরা এই তিনটি জাতিগত ধারার সংমিশ্রণ হিসেবে দেখলেও, প্রভাব বিচারে ফরাসী নৃবিজ্ঞান তথা ফরাসী মার্কসীয় কাঠামোবাদ, উত্তর-কাঠামোবাদ ও উত্তরাধুনিকতাবাদকে সাম্প্রতিক নৃবিজ্ঞানের সবচেয়ে সম্ভাবনাময় তাত্ত্বিক প্রকরণ হিসেবে দেখতে পাই।

কিন্তু গোলকায়ন যুগে পারস্পরিক নির্ভরতার অনিবার্যতা শাস্ত্র চর্চার এই জাতিভিত্তিক সীমানাগুলোকে নিঃসন্দেহে চ্যালেঞ্জ করে। অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক অপরায়ন তীব্র মাত্রায় জারি থাকলেও তথ্য-মাধ্যমের বিকাশ জ্ঞান-জাগতিক মিথষ্ক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করবার ফলে পরিবাহিত পশ্চিমা নৃবিজ্ঞানের কোলেই নিজস্ব স্বকীয়তা নিয়ে দাঁড়াচ্ছে 'অপর' বিশ্বের নৃবিজ্ঞানের বেশ কয়েকটি জাতিভিত্তিক ধারা। ব্রাজিল, ভারত, মিশর, ইন্দোনেশিয়া, জাপান বা মেক্সিকো এর উদাহরণ। কিন্তু সে তুলনায় প্রাতিষ্ঠানিক চর্চার দুই দশকের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছালেও আমাদের 'নিজস্ব নৃবিজ্ঞান' এর অর্জন নিতান্তই অপ্রতুল। সে প্রসঙ্গ আমাদের পরের বিষয়।

পেশাদারী বিদ্যায়তনিক শাস্ত্র হিসেবে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে প্রতিষ্ঠা পাওয়া সব সমাজ বা মানবশাস্ত্রই নিজেদের তাত্ত্বিক বুনন এবং বিকাশের প্রশ্নে বিগত কয়েক যুগ ধরে নতুন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হচ্ছে। বিশ্ববাস্তবতা, ভেঙ্গে বলতে গেলে প্রযুক্তি, রাজনীতি আর অর্থনীতির আমূল পরিবর্তন উৎসরিত এই চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ে মানবশাস্ত্রগুলো এখন সমাজ বাস্তবতা বিশ্লেষণের স্বনির্ধারিত দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে একটি গভীর পদ্ধতিগত সংকটে নিপতিত। প্রবণতার দিক থেকে বিশেষায়ণমুখীন শাস্ত্রগুলোর ক্ষেত্রে এটি যেমন সত্য তেমনি নৃবিজ্ঞানের মতো সমন্বয়মুখীন শাস্ত্রের ক্ষেত্রে সংকটের চেহারা আরো জটিল। ফলে বর্ণিত পরিস্থিতিতে সমসাময়িক সব শাস্ত্রই, যাদের পর্যবেক্ষণ বা অধ্যয়নের বিষয় হচ্ছে মানুষ বা তার সমাজ, নিজস্ব শাস্ত্রীয়

পরিসরে এই সংকটের মোকাবেলা করবার চেষ্টা করেছে নানা ভাবে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিষয়গত পুনর্বিন্যাসের মাধ্যমে বিকাশের নতুন দিক সৃষ্টি করে, আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে উদ্ভূত পরিস্থিতির সাথে তাত্ত্বিক সংশ্লেষণের নিরিখে নতুন শাস্ত্রীয় এজেন্ডা নির্ধারণের মাধ্যমে চেষ্টা করা হয় সংকট মোকাবেলার।

নৃবিজ্ঞানের শাস্ত্রীয় পরিসরে এই আলোড়ন অভিনব কোনো ঘটনা নয়। মানুষ বা তার সমাজ অধ্যয়নের একটি সর্বজনীন বিজ্ঞানের খোঁজ চলছে সেই সুদীর্ঘকাল ধরে। কিন্তু এই মুহূর্তে বিশ্বের ক্রমাগত পরিবর্তনশীল রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং প্রযুক্তিগত পরিস্থিতি এবং চর্চিত মানব শাস্ত্রগুলোর ওপর তার অভিঘাতের সাথে সম্পর্করহিত যে কোনো শাস্ত্রীয় আলোচনা চটুল বাচনিকতায় পর্যবসিত হবে। এই পরিস্থিতির ছায়া আমরা সাম্প্রতিক নৃবিজ্ঞানে টের পাই, যখন এর কেন্দ্রীয় পদ্ধতিগত সমস্যা হিসেবে হাজির হয় দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্বের সমাজ বাস্তবতাকে পরিবেশন/উপস্থাপনের প্রশ্ন। নৃবিজ্ঞানের তাত্ত্বিকতার প্রথম ক্ষেত্র নৃচিত্র/নৃবিবরণ রচনা বা নৃতাত্ত্বিক মাঠ গবেষণার ক্ষেত্রেও সাম্প্রতিক সময়ে সবচেয়ে জরুরি বিবেচনা হচ্ছে বৃহত্তর রাজনৈতিক, ঐতিহাসিক এবং দার্শনিক উন্মোচনের প্রতি এর সংবেদনশীলতা। কেবল এই সংবেদনশীলতার মাত্রার ওপর নির্ভর করছে সমাজ বাস্তবতার ডিসকোর্সসমূহে নৃবিজ্ঞানের একটি কেন্দ্রীয় অবস্থান অর্জনের ব্যাপারটি। কাজেই বিদ্যমান পরিস্থিতি, যা ইতিমধ্যে মানবশাস্ত্রগুলোর জন্য একটি 'নিরীক্ষা কাল' (মার্কাস ও ফিশার, ১৯৯৯) হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে, তা মানব শাস্ত্রবিদদের কাছ থেকে নিঃসন্দেহে একটু ভিন্নতর সংবেদনশীলতা দাবি করে।

১৯৮০'র দশকের শুরু হতে সামাজিক/সাংস্কৃতিক বাস্তবতা ও পরিস্থিতিকে বিশ্লেষণ করবার ক্ষেত্রে বিদ্যমান শাস্ত্রীয় কায়দাগুলোর মাঝে একটি আলোড়ন পরিলক্ষিত হয়। নৃবিজ্ঞানের ভেতরেই আমরা একাধিক উদ্যোগ দেখতে পাই সাহিত্যতত্ত্ব, দর্শন ও ইতিহাস শাস্ত্রের প্রাচীর ভেঙে আন্তঃশাস্ত্রীয় সংশ্লেষণের মাধ্যমে নিজেকে ঋদ্ধতর করবার। এই উদ্যোগগুলোর প্রথম ও আপাত উপলব্ধি

হচ্ছে অনুসন্ধানের গভীরতা দিয়ে শাস্ত্রীয় প্রাচীর জয় করলে পরে আপাত বিচ্ছিন্ন শাস্ত্রগুলোর আন্তঃসম্পর্কের শক্তিশালী কিন্তু অবিকশিত সম্পর্কমালার হদিস পাওয়া যায়। কিন্তু জ্ঞানবৃক্ষের স্বতন্ত্র ডালপালাগুলো বাজারি 'বিশেষায়িত' জ্ঞানের ফেরে পড়ে সংকীর্ণ শাস্ত্রপ্রাচীরে ঘিরে ফেলে নিজেদের। তখন এই তর্ক চলে কোনটি নৃবিজ্ঞান এবং কোনটি নৃবিজ্ঞান নয়, কোনটি একাডেমিক কোনটি নয়, কোন শাস্ত্রবিদ একাডেমিক রচনার নামে (কাল্পনিক) সাহিত্য রচনা করছেন, কোনটি বস্তুনিষ্ঠ কোনটি নয়, মার্কসকে কি নৃবিজ্ঞানী বলা যায় নাকি যায় না, উত্তর-আধুনিকতাবাদ কি বুদ্ধিবৃত্তিক বেপরোয়াবৃত্তি, কারা বইয়ের কথাকে ব্যক্তি জীবনে টেনে নামিয়ে পেশা ও ব্যক্তি জীবনের 'পবিত্র' ফারাক লঙ্ঘন করছেন ইত্যাকার কূটতর্ক। 'বুর্জোয়া বিকাশের তুরীয় পর্যায়ে মানুষ নিজেকে নিজে যেভাবে ছিন্নভিন্ন করে ফেলে, তেমনি নিজের সমুদয় চিৎশৈলীকেও ভেঙ্গে ফেলে লক্ষ ভাগে। শিল্প ও বিজ্ঞানের বিভক্তিকরণ ঘটে দ্রুত। সবকিছুই যেন ডিপার্টমেন্টাল, ভাঙ্গা ভাঙ্গা, টুটাফাটা। নিটোল সম্পূর্ণতা, যা আমাদের কাম্য, তা অপসৃত হয়। সমগ্রতার যে লাবণ্য তা আমাদের কৃৎকলার শরীর থেকে শীতগ্রস্ত পাতার মতো টলে টলে ঝরে যায়।' (মজহার, ১৯৭৭)

কিন্তু এই প্রবণতা সংখ্যা বিচারে প্রধান হলেও ব্যতিক্রমহীন নয়। আগেই বলেছি, প্রাচীর ভাঙ্গার কাজ শাস্ত্র জগতের তীব্রতর অনুসন্ধান প্রসূত বিরুদ্ধভাবনার তাগিদে একভাবে শুরুও হয়ে গেছে। স্মরণ করা যেতে পারে ১৯৮০'র দশকের গোড়া থেকে উত্তর আমেরিকার টেকসাসের রাইস বিশ্ববিদ্যালয়ের 'রাইস সার্কেল' নামে খ্যাত নৃবিজ্ঞানীদের কথা যারা একদিকে নিরীক্ষাধর্মী নৃবিবরণী বা এথনোগ্রাফি চর্চা করেছেন (স্টিফেন টাইলর, জর্জ মার্কাস, মাইকেল ফিশার), অন্যদিকে নৃতত্ত্বে উত্তরাধুনিক পাঠ বিচার পদ্ধতির প্রায়োগিক দিক নিয়ে কাজ করেছেন নিষ্ঠার সাথে (পল রেবিনো, রেনাতো রোসালদো, ভিনসেন্ট ক্রাপনজানো, জেমস ক্লিফোর্ড)। নৃবিজ্ঞানের এই নিরীক্ষাধর্মী চর্চার পরিবৃত্তের সমস্ত লেখালেখির পর্যালোচনা করেছেন মার্কাস ও ফিশার তাদের

'অ্যানথ্রোপলজি অ্যাজ কালচারাল ক্রিটিক' গ্রন্থে। তাদের এই পাঠ অভিজ্ঞতা থেকে বেরিয়ে এসেছে ১৯৯০ দশক থেকে একবিংশ শতকে পা রাখবার মুহূর্তে পশ্চিমের নিরীক্ষামূলক নৃবিজ্ঞানের প্রধান ক্ষেত্র ও প্রবণতাগুলো।

মার্কাস ও ফিশার নৃবিজ্ঞানের শাস্ত্রীয় ভূমিকাকে তারা পুনর্নির্ধারণ করেছেন 'কালচারাল ক্রিটিক' হিসেবে। 'ক্রিটিক' প্রত্যয়টি মূলত বিভিন্ন শাস্ত্রীয় পরিসরে ব্যবহৃত হয় কোনো জ্ঞান-জাগতিক ধারণাকে তার যৌক্তিক ভিত্তি ও প্রামাণ্যতার মাত্রা বিচারে পরীক্ষা-নিরীক্ষা বোঝাতে। প্রত্যয়টির প্রায়োগিকতা অনুধাবনে উদাহরণ হিসেবে মার্কসের *Contribution to the Critique of Political Economy* বা ইমানুয়েল কান্টের *The Critique of Pure Reason* প্রণিধানযোগ্য। কান্ট ইউরোপের সন্দীপন যুগের দার্শনিক ধারণাসমূহ, বিশেষত রেনে দেকার্তের যুক্তিবাদ এবং ফ্রান্সিস বেকনের প্রত্যক্ষবাদের সাথে আত্মগত বোঝাপড়া করতে গিয়ে যে রচনাগুলো পেশ করেন শিরোনামেই আমরা তার তরিকাগত পরিচয় পেয়ে যাই।

কাজেই 'ক্রিটিক' যা জ্ঞান-জাগতিক বোঝাপড়ার একটি সুসংহত তরিকা হিসেবে সন্দীপন পর্ব থেকেই প্রতিষ্ঠিত, তাকেই সংস্কৃতি পাঠে ব্যবহার করা রাইস সার্কেলের এই নিরীক্ষাধর্মী নৃবিজ্ঞান চর্চার মূল প্রতিপাদ্য, যার দুটি প্রধান সক্রিয় রূপ হচ্ছে নিরীক্ষামূলক এথনোগ্রাফি রচনা এবং নৃতাত্ত্বিক পাঠ বিচার (সোরবো, ১৯৯৪)। সংস্কৃতি পাঠে এই চর্চার পূর্বসূরি ধারা হিসেবে চিহ্নিত করা যায় জার্মানির ফ্রাঙ্কফুর্ট ঘরানা, ফ্রান্সের পরাবাস্তববাদ ও ফরাসী নৃবিজ্ঞানে তার অনুসারি তাত্ত্বিক এবং আমেরিকার মহামন্দাকালের প্রামাণ্য-বাস্তববাদীদের সংস্কৃতি বিচারকে।

অখণ্ড জ্ঞানকাণ্ডে সাংস্কৃতিক প্রক্রিয়ার তুলনামূলক বিচার শাস্ত্র হিসেবে নৃবিজ্ঞানের অন্যতম একটি মৌলিক অবদান হচ্ছে জ্ঞানের উৎসরণ এবং তার বৈচিত্র্যময় পরিপ্রেক্ষিতের আন্তঃসম্পর্কের ওপর গুরুত্ব আরোপ। কাজেই শাস্ত্রীয় পদ্ধতি হিসেবে কালচারাল ক্রিটিক শুধু উৎসরিত জ্ঞানের প্রাসঙ্গিকতাই আলোচনা করে না, তার

পরিপ্রেক্ষিত হিসেবে মানুষের সামাজিক বা সাংস্কৃতিক জীবনের স্বরূপ অনুসন্ধানের পদ্ধতিগত দিকগুলোরও চুলচেরা বিশ্লেষণ করে।

কাজেই এটা পরিষ্কার যে নৃবিজ্ঞান এখন আর শুধু 'নতুন বিশ্বের' সংস্কৃতি আবিষ্কার বা 'অপর'/'ক্ষুদ্র'/'আদিবাসী'/'অপাশ্চাত্য'/'অশিল্পায়িত'/'দরিদ্র'/'উন্নয়নকামী' সংস্কৃতির অধ্যয়ন নয়। বিশ্বায়ন/বৈশ্বায়ন/গোলকায়নের জমানায়, একদিকে বিগত শতকের শেষ ভাগ জুড়ে দুনিয়া জোড়া উন্মুল মানুষের একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে স্থানান্তরের ফলে সাংস্কৃতিক অভিন্নতার প্রাচীরে ঘেরা জাতিরাষ্ট্রের ধারণার ক্ষয়িষ্ণু রূপ, অন্যদিকে মুক্তবাজার যুগে পুঁজিবাদী পণ্যায়নের হাত ধরে আসা নয়া আধিপত্যবাদী রাজনীতি বিশ্ব বাস্তবতার তথা বিদ্যমান সমাজের খোলনলচে যেভাবে পাল্টে ফেলছে, তার স্বরূপ উন্মোচনে মরহুম ম্যালিনোস্কি বা র‍্যাডক্লিফ ব্রাউনের নৃবিজ্ঞান আমাদের খুব একটা কাজে লাগে না।



১৯৮০'র দশকের গোড়াতেই পশ্চিমের নৃবিজ্ঞানের বিকাশমান ধারায় এই উপলব্ধি অর্জিত হয় যে, ১৯২০-এর দশক থেকে নৃবৈজ্ঞানিক চর্চায় পৃথিবীর নানা প্রান্তের সমাজগুলোর তুলনামূলক পাঠের যে প্রত্যয় উচ্চারিত হয়েছে তা পদ্ধতিগত প্রকরণ হিসেবে আর ততটা শক্তিশালী নয় এবং তাত্ত্বিক তাৎপর্য বিচারে তা কেবল প্রত্যয় হিসেবেই থেকে গেছে। ফলে 'অপর'/'ক্ষুদ্র'/'আদিবাসী'/'অপাশ্চাত্য'/'অশিল্পায়িত' সমাজের জায়গায় অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে নৃবিজ্ঞানীর নিজ সমাজ বা সংস্কৃতির অধ্যয়ন। রাইস সার্কেল এই উপলব্ধিকে চিহ্নিত করেন নৃবিজ্ঞানের 'প্রত্যাবর্তন' যুগ হিসেবে। এই উত্তরণের প্রেক্ষাপটে ছিল সনাতন সমাজ অধ্যয়ন পদ্ধতিতে উপস্থাপন/পরিবেশনের সংকট। নিরীক্ষাধর্মী নৃবিজ্ঞান তখন পরিবর্তিত পরিস্থিতির বস্তুনিষ্ঠ বর্ণনায় রক্ষণশীল ধারার নৃবিজ্ঞানের পদ্ধতিগত সামর্থ্য নিয়েও প্রশ্ন তোলে।

প্রথাগত নৃতাত্ত্বিক বিবরণের মাধ্যমে 'অপর'/'ক্ষুদ্র'/'আদিবাসী'/'অপাশ্চাত্য'/'অশিল্পায়িত' জনগোষ্ঠীর (নৃবিজ্ঞানীর) স্বচৈতন্য জারিত মুখাবয়ব নির্মাণের চেয়ে তখন অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর ভাষা, যোগাযোগ, শাস্ত্র, ইতিহাস, সাহিত্যে বা অন্যবিধ জ্ঞান-জাগতিক প্রতিভাসে উদ্ভাসিত সাংস্কৃতিক/সামাজিক/রাজনৈতিক যূথ-চৈতন্যের নিবিষ্ট পাঠ। এই

পাঠে পরাবাস্তবিক দৃশ্য ও প্রতিভাসের বিচ্ছিন্ন আনন্দ আছে, কিন্তু যা উন্মোচিত তা অবশ্যই সত্য এবং বস্তুনিষ্ঠ। নৃবিজ্ঞানের এই পাঠ-পদ্ধতি বিকশিত হচ্ছে লেভি-স্ত্রাউসের কাঠামো প্রত্যাশী চিন্তা এবং তার অব্যবহিত কালে রোলা বার্থ ও জাক দেরিদার উত্তর কাঠামোবাদ, ফার্দিনান্দ দ্য সস্যুরের ভাষাতত্ত্বের অব্যবহিতকালে রোমান জ্যাকবসন, নোম চমস্কির কাঠামোবাদী ভাষাতত্ত্বের মতো শক্তিশালী তাত্ত্বিক প্রকরণের ছায়ায়। পরিপূরক প্রকরণ হিসেবে এই পদ্ধতিকে আরো শক্তি যুগিয়েছে ক্লিফোর্ড গিয়ার্টজ, ভিক্টর টার্নার, ডেভিড শ্নাইডার এবং মেরি ডগলাসের প্রতীকী নৃবিজ্ঞানের অর্থ ও যোগাযোগের সম্পর্ক উদঘাটন প্রয়াস। রক্ষণশীল নৃবিজ্ঞানের বিপরীতে এই পাঠ পদ্ধতির বিকাশ গবেষণার ধারণা এবং তৎপ্রসূত জ্ঞান সম্পর্কিত অনেক শাস্ত্রীয় প্রশ্নকে যেমন উসকে দেয়, তেমনি অপরায়নের যুগে বিরাজমান 'জ্ঞান যোগাযোগ দশা'য় নতুন আমলনামা নিয়ে হাজির হয়। মানুষের ভূ-সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য ব্যাখ্যাতার প্রথাগত কর্তৃত্ববাদী ভূমিকা ছেড়ে নৃবিজ্ঞান তখন মানবিক সত্তা ও তার কলাক্রিয়ার বিশ্লেষণ বিজ্ঞান হিসেবে, হাল জমানার পরিদৃশ্যমান আয়োজনের ভেতর এক অন্তর্লীন, নির্দিষ্ট এবং নৈর্ব্যক্তিক সম্পর্ক উদঘাটনে ব্রতী হয়।

সুতরাং, শাস্ত্রবিদের দায়-দায়িত্ব এবং আমাদের কহতব্য

প্রবন্ধের শুরুতে আমরা পরিবর্তিত সময়ে নিজ কর্তব্য নির্ধারণে প্রথম উপায় হিসেবে বেছে নিয়েছিলাম পরিস্থিতির সাথে শাস্ত্রের সংবেদনশীল জায়গাগুলো চিহ্নিত করা এবং সমস্ত শাস্ত্র প্রাচীরের উর্ধ্বে উঠে মানবীয়তাকে পুনর্নির্মাণের দৃষ্টি হিসেবে নিয়ে প্রকৃত সামগ্রিকতা অর্জন করা। সামগ্রিক দৃষ্টিতে মানুষের প্রকৃতি ও প্রজাতিজনিত কলাক্রিয়ার সাথে সম্পর্কিত করে মানবীয়তার সংজ্ঞা নির্মাণ, নৃবিজ্ঞানের আদি দার্শনিক তাড়না। এতে সাম্প্রতিক অনুভব হচ্ছে স্থবির অতীতে নয়, অস্তিত্বের শাশ্বত প্রবহমানতায় সপ্রশ্ন আত্মানুভ্রমণে নিজ অস্তিত্বকে প্রতিনিয়ত আবিষ্কার ও উন্মোচনই এই সংজ্ঞা নির্মাণের পথ।

সংবেদনশীলতার খোঁজে আমরা যদি বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে চর্চিত একটি মানবশাস্ত্র হিসেবে নৃবিজ্ঞানের প্রাতিষ্ঠানিকতাকে আমল না দিয়ে ইস্যুটি সামাজিকভাবে (একাডেমিকভাবে তো



বটেই) সক্রিয় একজন শাস্ত্রবিদ, যাকে আমরা নৃবিজ্ঞানী বলছি, তাঁর ব্যক্তিগত বোঝাপড়ার দিক থেকে উল্টানো শুরু করি, তাহলে প্রথম প্রশ্ন হিসেবে পুরানা একটি প্রশ্নই আবার ফিরে আসে—একজন নৃবিজ্ঞানী যখন তাঁর গবেষণাধীন জনগোষ্ঠীকে কোনো প্রাকৃতিক/সামাজিক/ রাজনৈতিক/যুদ্ধনৈতিক বিপর্যয়ের মধ্যে দেখতে পান, তখন তার প্রতিক্রিয়ার ধরন কী হবে? স্মরণ রাখতে হচ্ছে, এই জনগোষ্ঠীগুলোর সাংস্কৃতিক জীবন থেকে আহরিত জ্ঞান তার পেশাদারী জীবনের মূল সঞ্চালক, তাদের উৎপাদন উদ্বৃত্তের হরণকৃত অংশ দিয়ে তার গ্রাসাচ্ছাদন হয়। প্রশ্নগুলো সম্প্রতি আবার তুলেছেন ব্রিটিশ নৃবিজ্ঞানী রিচার্ড ট্যাপার (২০০২)। ট্যাপার দীর্ঘদিন মাঠ গবেষণা করেছেন আফগানিস্তানে। ইঙ্গ-মার্কিন বোমা হামলার পর রয়্যাল অ্যানথ্রোপলজিক্যাল ইনস্টিটিউট কর্তৃক প্রকাশিত নিবন্ধে তিনি ক্ষোভে ফেটে পড়েন। 'অ্যানথ্রোপলজি এন্ড দি ক্রাইসিস : রেসপন্ডিং টু ক্রাইসিস ইন আফগানিস্তান' শিরোনামের এই নিবন্ধে তার জবানবন্দী, "আমি 'তালিবান = পশতুন = ইসলাম = সন্ত্রাসবাদ' জাতীয় মিডিয়া সম্প্রচারে অনেক শাস্ত্রবিদের মতো গলা মেলাতে পারিনি কারণ এই ভণ্ডামি ও অসততার চেহারা আমার জানা ছিল। জানা ছিল যুদ্ধের প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ উদ্দেশ্য হাসিলের বর্বর পথগুলো সম্পর্কে। শুধু জানা ছিল না কত জন নিরীহ আফগানের প্রাণ ১১ সেপ্টেম্বরের ঘটনার মূল্য হিসেবে দিতে হবে।" কিন্তু বসে থাকেননি ট্যাপার, বর্হিবিশ্বে কর্মরত আফগান নৃবিজ্ঞানীদের সংগঠিত করেছেন, এদের মধ্যে তাঁর উল্লেখ থেকে জানা যায় ইন্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ের নাজিফ শাহরানি, বিশ্ব ব্যাংকের আশরাফ গনি, মিসিগান বিশ্ববিদ্যালয়ের জামিল হানিফি এবং অক্সফোর্ডের সৈয়দ আসকার মৌসাভির নাম। সংগঠিত হয়েছেন অন্যান্য দেশের আরো বহু শাস্ত্রবিদ, আফগানিস্তান থেকে আসা উন্নয়ন বা সংবাদ কর্মীসহ বিভিন্ন পেশার মানুষ। ১৯৯১ সনের উপসাগরীয় যুদ্ধে সিএনএন'র ভূমিকার কথা স্মরণ রেখে বিকল্প যোগাযোগ মাধ্যম হিসেবে তারা তৈরি করেন একটি ইন্টারনেট লিস্ট সার্ভার 'আফগানিয়াত', প্রবল মিডিয়ায় 'আফগান = তালেবান =

মৌলবাদ = সন্ত্রাসবাদ = বধযোগ্য মানুষ' জাতীয় প্রচারণার বিপরীতে আফগান জাতিসত্তার স্বকীয়তা উন্মোচন যার লক্ষ্য।

অন্যদিকে আজকের পরিস্থিতিতে আমরা পশ্চিমের নৃবিজ্ঞানীদের একটি অংশকে নিমেষেই পেয়ে যাই মিডিয়ার পর্দায়। রেডিও, টেলিভিশন, সংবাদপত্রে তারা সাক্ষাৎকার, নিবন্ধ-প্রবন্ধে, আলোচনা আর টকশোতে অংশ নিয়ে নিজেদের 'বিশেষজ্ঞ জ্ঞান' তুলে ধরেন। এই বিশেষজ্ঞ জ্ঞানের তেজারতিতে যারা নতুন অর্থাৎ নভীস—তাদের একাজে উন্নতি করবার বিষয়টি নির্ভর করে কতিপয় মিডিয়া এজেন্ডার আলোকে নিজের 'বিশেষজ্ঞ জ্ঞান' প্রয়োজনমত পরিবর্ধন/পরিকর্তন/পরিবর্তনের পারঙ্গমতার ওপর।

সুতরাং সংকট প্রশ্নে বৃহদাংশ শাস্ত্রবিদের নিরবিচ্ছিন্ন কর্মতন্দ্রার বাইরে আমরা এই দুটি বিপরীতধর্মী সক্রিয়তা দেখতে পাচ্ছি। মিডিয়া তথা ক্ষমতার ধামাধরাদের বাইরে রিচার্ড ট্যাপারদের মতো আরো অনেকের প্রয়াস আমাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ ইশারা দেয়—জ্ঞান উৎপাদনের রাজনীতির পরিবৃত্তে ফরমায়েশী জ্ঞান বানিয়ে, বিলিয়ে শাস্ত্রবিদ হিসেবে নিজের কর্তব্য শেষ করা 'নৈতিক সংকট প্রশ্নে নিরপেক্ষতা'র মতোই বড় পাপ। শাস্ত্র বিকাশের এই পর্বে অনুসন্ধানলব্ধ-জ্ঞান উৎসরিত তৎপরতা শাস্ত্রচর্চার অনিবার্য দাবি। আধিপত্যবাদী মিডিয়ার বিপরীতে সামাজিক ভূমিকার পুরা পরিসর জুড়ে তৎপর হওয়া, নব্য সাম্রাজ্য/বর্ণবাদের বিরুদ্ধে মানবিক মুক্তির সংগ্রামে শামিল হওয়া নতুন যুগের তৎপর-শাস্ত্রচর্চার দাবি। এই নবশাস্ত্রচর্চা স্থবির শাস্ত্রচর্চাকে খারিজ করে। মানবশাস্ত্র জগতে নৃবিজ্ঞান এই উপলব্ধির নবীন পথিকৃত। স্থবির শাস্ত্র হতে একটি তৎপরতার শাস্ত্র হয়ে উঠবার ক্ষেত্রে নৃবিজ্ঞান মানবশাস্ত্রগুলোর মধ্যে সর্বাধিক ঐতিহ্যিক শক্তি সম্পন্ন বিজ্ঞান। মানুষের সমাজ ও সংস্কৃতিকে সক্রিয় অংশীদারিত্বের মধ্য দিয়ে জানার সুবিশাল ঐতিহ্য, শক্তিশালী তাত্ত্বিক প্রকরণ ইত্যাদির সাথে এখন যোগ হয়েছে এর পরিসরগত পুনর্বিন্যাস এবং বিস্তৃতি। বিকশিত হচ্ছে দৃশ্যরূপ নৃবিজ্ঞানের মতো সম্ভাবনাময় শাখা যা বাস্তবতার উপস্থাপনের পদ্ধতিগত প্রকরণে

একটি বিশাল উত্তরণ, অন্যদিকে ভাষা-নৃবিজ্ঞানের বিকাশ আমাদের জ্ঞান যোগাযোগে অর্থ নির্মাণ ও আধিপত্যের স্বরূপ উন্মোচনের কাজে লাগছে।

আপাতত, আর যে বিষয়টি ছুঁয়ে যাওয়া বাকি তা হলো—বিদ্যায়তনিক শাস্ত্র চর্চার ভূ-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট বিচারে এই সমস্ত শাস্ত্রেরই উৎসমূল যেমন অষ্টাদশ শতকে ইউরোপীয় সন্দীপন পর্বের যৌক্তিক জ্ঞান, তেমনি তার পরবর্তী সময়ে উপনিবেশবাদ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর নব্য-উপনিবেশবাদ, বাজারি প্রচারণা এবং সর্বোপরি 'উন্নয়ন' এর কবলে পড়ে তৃতীয় বিশ্বজুড়ে এই একই জ্ঞানের প্রশ্নহীন, বোঝাপড়াহীন পুনরুৎপাদন। এনলাইটেনমেন্ট, যোগ রেনেসাঁ, যোগ ফরাসী বিপ্লব, যোগ শিল্প বিপ্লবের মধ্য দিয়ে বিকশিত পশ্চিমা সভ্যতার বিপরীতে অপাশ্চাত্য সমাজগুলোর অধঃস্তনতা রাজনীতি বা অর্থনীতির মতোই শাস্ত্রনীতির মধ্যেও সমানভাবে জারি ছিল, জারি আছে। আমাদের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর পরিসরে চর্চিত শাস্ত্রবয়ানগুলোর আধিপত্যবাদী (বুর্জোয়া/শ্বেতাঙ্গ/পুরুষ) চেহারাটি/গুলো চিনতে পারলে বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যায়। প্রায় এক শতাব্দীর বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার ইতিহাসও আমাদের নিজস্ব কোনো সমাজবিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বা নৃবিজ্ঞান দেয়নি। কতিপয় ব্যতিক্রম ব্যতীত আমরা এখনো সম্পূর্ণ পশ্চিমা ধাঁচের একটি নৃবিজ্ঞান পড়ি এবং পড়াই। এখানে শিক্ষার্থীদের ভূমিকা ঔপনিবেশিক চৈতন্য গ্রাহকের এবং শিক্ষকের ভূমিকা এই কনশাসনেসের ধারক, বাহক ও বিতরকের।

আমাদের 'নিজস্ব নৃবিজ্ঞান' ধারণাটি জাতীয়তাবোধ প্রসূত কোনো ধারণা নয়, এটি বলে রাখলে বোধ করি বিভ্রান্তির সুযোগ কিছুটা কমে। উত্তর উপনিবেশিক সময়ে আমাদের মতো দেশে, যার শিক্ষা ব্যবস্থার রন্ধ্রে রন্ধ্রে উপনিবেশিক অবশেষ, সে দেশে যেকোনো শাস্ত্র বিকাশের মৌলিক দ্বন্দ্বটি হচ্ছে উপনিবেশযুগে গোড়া পত্তন হওয়া এবং বাজার যুগে ডালপালা মেলা পশ্চিমা আধিপত্যবাদী শাস্ত্র বয়ানগুলোর সাথে বোঝাপড়া করা। এই বোঝাপড়ায় আমরা সাথে পাই তালাল আসাদ, এডোয়ার্ড সাইদ,

ক্যাথেলিন গফ, গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাকের মতো উত্তর-উপনিবেশবাদীদের, রণজিৎ গুহসহ সাব-অলটার্ন স্টাডিজ গ্রুপের বিকল্প ইতিহাস পাঠকে। তখন আমাদের সামনে কর্তব্য রয়ে যায় ইতিহাসহীন মানুষ হিসেবে নিজ ইতিহাসের পুনর্নির্মাণ এবং সে কাজে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রাজেন্দ্রলাল, ভূপেন্দ্রনাথ দত্তসহ আমাদের নিজস্ব মনীষাদের শরণ নেওয়া, বঙ্গের সাহিত্য ও জ্ঞানচর্চার লোকজ ধারায় নৃবিজ্ঞানের জন্য নতুন প্রসঙ্গ অনুসন্ধান।

বাজার যুগে শাস্ত্রজ্ঞানও যখন পণ্য হিসেবে আটলান্টিক পাড়ি দেয়, তখন এটা পরিষ্কার যে, অসম এবং আধিপত্যবাদী প্রক্রিয়ায় হলেও জাতীয়তাবাদী প্রাচীরগুলো ভেঙ্গে পড়তে থাকে; অর্থনীতি, রাজনীতি সংস্কৃতিতে তো বটেই, মানবশাস্ত্র তথা নৃবিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও। সেই পরিস্থিতিতে সামনে ভবিতব্য থাকে দুইটি—এক. সাম্রাজ্যবাদী বৈশ্বায়নের বাজারি শাসন ও তার সম্পূরক আধিপত্যবাদী শাস্ত্র, দুই. মানবীয়তাবাদী বিশ্বায়ন ও শাস্ত্রীয় চর্চার সমন্বিত বৈশ্বিক রূপ। এই দুই ভবিষ্যতের প্রথমটিতে পৌঁছানোর সিরাতুল মুসতাকিম নির্বিরোধ আত্মসমর্পণ, মাথা-মগজ-বর্গাদান; দ্বিতীয়টি লড়াই, মনোজগতে জারি থাকা উপনিবেশের সাথে লড়াই, নিজ নিজ শাস্ত্রীয় পরিসরে সপ্রশ্ন বোঝাপড়া ও সংশ্লেষের মাধ্যমে নৃবিজ্ঞানের অভীষ্ট বৈশ্বিক চর্চায় নিজেদের অর্জন যোগ করবার নিরন্তর প্রচেষ্টা। নিঃসন্দেহে ইতিহাসের এই পর্ব আত্মসমর্পণের নয়, লড়াইয়ের—সপ্রশ্ন বোঝাপড়ায় উদ্ভাসের আগের অন্ধকার মোকাবেলার।

তথ্য ও বইপত্রের হদিস

এস এম নুরুল আলম, আইনুন নাহার, মানস চৌধুরী (সম্পাদিত) ১৯৯৯, *সাম্প্রতিক নৃবিজ্ঞান*, সেমিনারে উপস্থাপিত প্রবন্ধাবলীর সংকলন, নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।

রেহনুমা আহমেদ ও মানস চৌধুরী ২০০৩, *নৃবিজ্ঞানের প্রথম পাঠ*, একুশে পাবলিকেশন্স লিমিটেড, ঢাকা।

প্রথম আলো, ২৯ মে ২০০৩, ঢাকা।

নোম চমস্কি ২০০১, 'এই প্রথমবার বন্দুকের নল উল্টাদিকে ঘুরেছে', (আ-আল মামুন অনূদিত) সেলিম রেজা নিউটন ও অন্যান্য (সম্পাদিত), *মানুষ: মানুষ ও প্রকৃতি বিষয়ক পত্রিকা*, সন্ত্রাস-মিডিয়া-যুদ্ধ সংখ্যা, সমাবেশ, ঢাকা।

এডোয়ার্ড সাইদ ২০০১, 'ইসলাম এবং পশ্চিম ব্যানার হিসেবে অপর্যাপ্ত' (সেলিম রেজা নিউটন অনূদিত), সেলিম রেজা নিউটন ও অন্যান্য (সম্পাদিত), *মানুষ: মানুষ ও প্রকৃতি বিষয়ক পত্রিকা*, সন্ত্রাস-মিডিয়া-যুদ্ধ সংখ্যা, সমাবেশ, ঢাকা।

ফরহাদ মজহার ১৯৭৭, *প্রস্তাব*, বুক সোসাইটি, ঢাকা।

বন্দনা শিবা ২০০৩, *বৈশ্বায়নের বিস্ফোরণ*, (বখতিয়ার আহমেদ অনূদিত), *দৈনিক যুগান্তর*, ১৮ এপ্রিল ২০০৩, ঢাকা।

Alan Barnard 2000, *History and Theory in Anthropology*, Cambridge University Press.

Thomas Hobbes. *Leviathan* 1651, Everyman's Library. London. 1970 edition.

Talal Asad. Afterword: From the History of Colonial Anthropology to the Anthropology of Western Hegemony in George Stocking (ed). *Race, Culture & Evolution: Essays in the History of Anthropology.* 1988. Cambridge University Press, Cambridge.

Talal Asad (ed.) 1973, *Anthropology & the Colonial Encounter*, Ithaka Press, London.

Immanuel Kant 1781, *The Critique of Pure Reason.* in Encyclopaedia Britannica. 2002 Deluxe Edition.

Immanuel Kant 1781, *The Critique of Practical Reason.* in Encyclopaedia Britannica. 2002 Deluxe Edition.

Robert Layton 1997, *An Introduction to Theory in Anthropology*, Cambridge University Press, Cambridge.

Claude Levi-strauss 1973, *The Scopes of Anthropology in his Structural Anthropology*, vol.2, Penguin Books, London.

George E. Marcus & Michael M. J. Fischer. 1999, *Anthropology as Cultural Critique: An experimental moment in the human sciences*, The University of Chicago Press, USA.

James Clifford & George E. Marcus (eds) 1990, *Writing Culture: The Poetics and Politics of Ethnography.* (1986). Oxford University Press, Delhi.

Edward W. Said 1978, *Orientalism: Western conceptions of the orient*, Penguin Books India (2001), New Delhi.

Gunar M. Sorbo. 1994, *Anthropology and Postmodernism*, Report. Bergen, Norway. Chr. Michelsen Institute.

Richard Tapper, 2002, Anthropology and (the) Crisis: Responding to crisis in Afghanistan. Royal Anthropological Institute.

জুন ২০০৩
জুবেরি ভবন, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

এডোয়ার্ড সাইদ ও পশ্চিমের প্রাচ্য দর্শন

এডোয়ার্ড সাইদ আর নেই। ২৫ সেপ্টেম্বর ২০০৩ সন্ধ্যায় নিউ ইয়র্ক শহরের এক হাসপাতালে দুনিয়ার মুক্তিমুখীন প্রতিরোধ আন্দোলনের এই লড়াকু সৈনিক ৬৭ বছর বয়সে এসে হার মানলেন লিউকোমিয়ার কাছে, তাও খুব সহজে নয়, গোটা একটি দশক ধরে এই মরণব্যাধিকে প্রাণপণ প্রতিরোধ করেই। আমরা যারা পৃথিবীর আরেক প্রান্তে ইন্টারনেট মারফত আল-আহরাম উইকলি, আল হায়াত, কাউন্টার পাঞ্চ বা জেট নেটের বদৌলতে তার নিয়মিত কলামগুলো অনিয়মিত পড়তাম, এই নিঃশব্দ লড়াইয়ের পুরো খোঁজ তাদেরও জানা ছিল না। নিজ সামাজিক পরিচয়ের পরিসর জুড়ে তৎপর একজন শাস্ত্রবিদ হিসেবে, মধ্য ৬০-এর দশক থেকে সাম্রাজ্যবাদ ও বর্ণবাদ বিরোধী সংগ্রামের প্রতিটি ধাপে ক্ষুরধার বিশ্লেষণী ক্ষমতা দিয়ে জগৎ শাসন ও জগৎ বিচারের পশ্চিমা তরিকার স্বরূপ উন্মোচনের অগ্রণী চিন্তক হিসেবে, এমনকি ১১ সেপ্টেম্বরের টুইন টাওয়ারে হামলা এবং তার অব্যবহিতকালে আফগানিস্তান ও ইরাকে মার্কিন আগ্রাসন ও গণহত্যার মধ্য দিয়ে সূচিত হওয়া তীব্র রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অপরায়নের ডামাডোলেও সাইদের কলম আমাদের সচকিত করেছে পদে পদে। একই সময় থেকে তার তৎপর বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চার

প্রথম প্রতিধারণাগত রূপায়ন 'প্রাচ্যবাদ' আলোড়িত করেছে তুলনামূলক সাহিত্য থেকে নৃতত্ত্ব পর্যন্ত জ্ঞানকাণ্ডের অনেকগুলো শাখাকেই। পাশাপাশি নিজ জন্মভূমি প্যালেস্টাইন প্রশ্নে একাধারে মোকাবেলা করেছেন গোটা পশ্চিমা বুদ্ধিবৃত্তিক জগতকে, অন্যদিকে পূব-পশ্চিমের সম্ভাব্য প্রতিটি বুদ্ধিবৃত্তিক আয়োজনে সোচ্চার কণ্ঠে উত্থাপন করেছেন প্যালেস্টাইনি স্বাধিকার আন্দোলনের দাবি, কর্মজীবনের প্রায় পুরোটাই কাটিয়েছেন নিউ ইয়র্কে, কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি ও তুলনামূলক সাহিত্যের অধ্যাপক হিসেবে কাজ করেছেন ১৯৬৩ সাল থেকে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত। তারপরেও গোটা পশ্চিমা জগতে তার পরিচিতি 'ভয়েস অফ প্যালেস্টাইন' হিসেবেই।

তার কর্মজীবনের আরেকটু বিস্তারিত হদিস করতে গেলে জানা যায়, ১৯৭৪ সালে তুলনামূলক সাহিত্যের অতিথি অধ্যাপক হিসেবে কাজ করেছেন হাভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে, ১৯৭৯-এ জন হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং মাঝখানে ১৯৭৫-৭৬ সাল কাটিয়েছেন স্ট্যানফোর্ডের সেন্টার ফর অ্যাডভান্স স্টাডি ইন বিহেভিওরাল সাইন্সে গবেষক হিসেবে। সম্পাদনা করেছেন 'আরব স্টাডিজ কোয়ার্টারলি' নামে একটি পত্রিকা। সর্বাধিক পঠিত ও আলোচিত 'অরিয়েন্টালিজম' ছাড়াও উল্লেখযোগ্য রচনার মধ্যে আছে 'জোসেফ কনরাড এন্ড দ্য ফিকশন অফ অটোবায়োগ্রাফি', 'বিগিনিংস : ইনটেনশন এন্ড মেথড', 'দ্য কোয়েশ্চেন অফ প্যালেস্টাইন', 'লিটারেচার এন্ড সোসাইটি', 'কাভারিং ইসলাম', 'আফটার দ্য লাস্ট স্কাই : প্যালেস্টাইনিয়ান লাইভস', 'ব্লেমিং দ্য ভিকটিমস', 'মিউজিক্যাল ইলাবোরেশনস', 'কালচার এন্ড ইম্পেরিয়ালিজম', 'রিপ্রেজেন্টেশন অফ ইন্টেলেকচুয়াল', 'আউট অফ প্লেস', 'দা এন্ড অফ পিস প্রসেস : অসলো এন্ড আফটার', 'পিস এন্ড ইটস ডিসকন্টেন্টস'। কাছের জনদের ধারণায় তিনি একজন গুণী পিয়ানোবাদক, দূরবর্তী পাঠকেরা তার কিছুটা আঁচ পাবেন তার সঙ্গীত বিষয়ক লেখালেখি থেকে। কাজেই তার বুদ্ধিবৃত্তিক প্রতিরোধ তৎপরতার এই সুবিশাল ক্যানভাস বরাবরই

আড়াল করেছে ঘাতক ক্যান্সারের সাথে যুগব্যাপী লড়াই ও বসবাসের ইতিবৃত্ত। ফলে জেনিন, নাবলুস, জাফা, আক্রা, গাজা, জেরুজালেম, বাগদাদ, তিকরি, উম্মে কসর, কারবালা, কাবুল, মাজার-ই-শরিফ, কান্দাহারসহ পৃথিবীর তাবৎ করদ নগরীর অবিশ্রান্ত রক্তপাত থামবার আগেই তার এই মৃত্যু বড় আকস্মিক ঠেকে, বিহ্বল করে।

এডোয়ার্ড সাইদের জন্ম ১৯৩৫ সালে জেরুজালেম নগরীতে, প্যালেস্টাইনি ঐতিহ্যের এক খ্রীস্টান পরিবারে। ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর এই ব্যবসায়ী পরিবারটি চলে আসে কায়রোতে। শৈশব ও স্কুল জীবনের একাংশ কেটেছে কায়রোর ভিক্টোরিয়া কলেজে এবং আরেক অংশ ম্যাসেচুসেটস এর মাউন্ট হারমনে। নিজের এই শৈশবে পশ্চিমা শিক্ষা কাঠামোর সাথে প্রাচ্য সংস্কৃতির সংশ্লেষণের ঠিকুজি তালাস করেছেন আত্মজীবনীমূলক রচনা *আউট অফ প্লেস* এবং *নট কোয়াইট রাইট*-এ। ১৯৬৪ সালে হাভার্ডে পিএইচ ডি শেষ করবার আগে প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক পর্যায় শেষ করেন ১৯৫৭ সালে। এর মাঝেই যোগ দেন প্যালেস্টাইনি স্বাধিকার আন্দোলনে এবং ১৯৭৭ সালে প্রবাসী প্যালেস্টাইন পার্লামেন্টের সদস্য নির্বাচিত হন এবং তার পরের এক যুগেরও বেশি সময় ধরে ইয়াসির আরাফাতের ঘনিষ্ঠ সহযোদ্ধা হিসেবে নেতৃত্ব দিয়েছেন পিএলও তথা প্যালেস্টাইনি স্বাধীনতা আন্দোলনকে। ১৯৯১ সালে অসলো চুক্তি নিয়ে রাজনৈতিক মতান্তর ঘটে ইয়াসির আরাফাতের সাথে, অনেকটা নিঃশব্দেই সরে আসেন সাইদ। কিন্তু আরাফাতের সাথে যুগব্যাপী এই সংগ্রামী বন্ধুত্বের অবসান প্রসঙ্গে নিজের দৃঢ় রাজনৈতিক অবস্থান স্পষ্ট করেছেন মধ্যপ্রাচ্য প্রশ্নে দুই রচনা *অসলো এন্ড আফটার* এবং *পিস এন্ড ইটস ডিসকন্টেন্টস*-এ। পিএলও এবং ইজরাইলের মধ্যে সম্পাদিত অসলো শান্তিচুক্তিকে সাইদ মূল্যায়ন করেন 'প্যালেস্টাইনি আত্মসমর্পণের দলিল' হিসেবে যা পুরো আরব জনগোষ্ঠীর ওপর সামরিক ও অর্থনৈতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠার পুরোন ইজরাইলি নীতির সম্প্রসারণ মাত্র। সাইদের বিচারে এই প্রহসনে

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা 'অসৎ দালালে'র যে তার মক্কেল ইজরাইলকে আগাগোড়া মদদ দিয়ে এসেছে।

১৯৯১ সালে পিএলও'র রাজনীতি থেকে সরে আসার পরপরই তার লিউকোমিয়া ধরা পড়ে। ১৯৯২ সালে এক সাক্ষাৎকারে সাইদ নিজের ক্যান্সার নিয়ে কথা বলেন, জানান জটিল পদ্ধতির চিকিৎসা এবং নিজের কাজের মাঝে সমন্বয়ের চেষ্টা করছেন। সেই সমন্বয়ের ফলাফল হচ্ছে এই যে, পরের ১১ বছরে শুধু তার একাডেমিক লেকচারের তালিকাতেই এসে যায় ভারত, মধ্যপ্রাচ্য, ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকার শীর্ষ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর নাম। এ সময়েই বিবিসি রেডিও, কানাডিয়ান ব্রডকাস্টিং রেডিও, অস্ট্রেলিয়ান রেডিওতে নিয়মিত উপস্থিতি তাকে অচিরেই শীর্ষ স্থানীয় মধ্যপ্রাচ্য বিশেষজ্ঞ হিসেবে পরিচিতি এনে দেয়। প্যালেস্টাইন রাষ্ট্রের অধিকার আদায়ের আমৃত্যু সংগ্রাম এবার নতুন মাত্রা পায়। প্যালেস্টাইনি উদ্বাস্তু হয়ে খোদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বাস করেও সাইদ মধ্যপ্রাচ্য তথা দুনিয়াজুড়ে ইজরাইল-ইঙ্গো-মার্কিন নীতির কঠোর সমালোচকদের অন্যতম একজন হয়ে উঠেন। মুস্তফা বারঘাওতির সাথে গড়ে তোলেন প্যালেস্টাইনের গণতান্ত্রিক মুক্তিকামী সংগঠন প্যালেস্টাইনিয়ান ন্যাশনাল ইনিশিয়েটিভস। ১৯৯৮ সালে বিবিসি টেলিভিশন ইজরাইল রাষ্ট্রের ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে প্যালেস্টাইনি দৃষ্টিকোণ থেকে ইহুদি রাষ্ট্র ইজরাইলের ইতিহাস সম্বলিত তথ্যচিত্র নির্মাণের জন্য সাইদকে মনোনীত করে। ইজরাইল, বেশ কয়েকটি আরব দেশ এবং ব্রিটেনে ঘুরে ঘুরে অজস্র সাক্ষাৎকার গ্রহণ ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে সাইদ এই তথ্যচিত্রে প্যালেস্টাইন ভূখণ্ডের দাবিকে কেন্দ্র করে ইহুদিবাদী জ্ঞানতত্ত্ব যে 'আরব মুখ' পরিবেশন করে তাকে চ্যালেঞ্জ করেন। প্রবল আধিপত্যশীল মিডিয়া এবং তার রাষ্ট্রকাঠামোর ভেতর থেকে সাইদের এই বুদ্ধিবৃত্তিক প্রতিরোধের পথ সব সময় কুসুমাস্তীর্ণ ছিল না। ৯০ দশকের শুরুতে ইজরাইলি মিডিয়ায় সাইদের বিরুদ্ধে বিষোদগারের ধরন জানা যায় দুটি ঘটনা থেকে, একবার ইজরায়লি মিডিয়া লিখল যে সাইদ আদৌ কোনো

প্যালেস্টাইনি উদ্বাস্তু নন, কাজেই তিনি রাজনৈতিক যুক্তরাষ্ট্রে রাজনৈতিক আশ্রয় পাওয়ার যোগ্য নন, বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতার চাকুরি তো নয়ই। আরেকবার বৈরুতে ইজরাইল সীমান্তবর্তী ফিলিস্তিনি উদ্বাস্তু শিবির পরিদর্শনে গিয়ে উদ্বাস্তুদের ইজরাইলি ভূখণ্ডের প্রতি পাথর নিক্ষেপের প্রতীকী অনুষ্ঠানে অংশ নেন। ব্যস, পরদিন পশ্চিমা মিডিয়া ফলাও করে 'ইহুদি বিদ্বেষী' সাইদের পাথর ছুড়ে মারার ছবি ছাপায়।

কিন্তু তবু বিশ্বের নানা প্রান্তে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ৫০ লক্ষ প্যালেস্টাইনি উদ্বাস্তু এখন শোক, শ্রদ্ধা আর কৃতজ্ঞতায় স্মরণ করছে সাইদকে। গাজা, পশ্চিম তীরে ইজরাইলি কর্তৃপক্ষ এবং মধ্যপ্রাচ্যের আরো কয়েকটি আরব সরকার তার একাধিক বই নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে, কিন্তু সাইদের কণ্ঠ তাতে রোধ করা যায়নি। ১৯৯৩ সালে পিএলও তথা আরাফাতের সাথে বিচ্ছেদের পরে তিনি আরো উচ্চকিত হয়েছেন ইজরাইলি আগ্রাসনের বিরোধিতার পাশাপাশি আরব সমাজ তথা আরব নেতৃত্বের রাজনৈতিক পশ্চাৎপদতা, মানবাধিকার লঙ্ঘন, প্রায় অচল প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা এবং উৎপাদন বিমুখ অর্থনৈতিক নীতির সমালোচনায়। কায়রোর আল আহরাম এবং লন্ডনভিত্তিক আরবী দৈনিক 'আল হায়াত' এ প্রকাশিত ধারাবাহিক রাজনৈতিক নিবন্ধগুলো হাজার হাজার আরব তরুণকে নতুন করে ভাবতে শিখিয়েছে। পৃথিবীর সবচেয়ে নিষ্পেষিত একটি জনগোষ্ঠীর বুদ্ধিবৃত্তিক নেতৃত্বের ভার ইতিহাস সাইদকে দিয়েছে, আমৃত্যু তিনি তাতে পিছু হটেননি এক পাও।

এই সুদীর্ঘ প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক সক্রিয়তার পাশাপাশি এডোয়ার্ড সাইদ পশ্চিমের সাহিত্য তথা বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চায় উত্তর-উপনিবেশিক ধারার শীর্ষ স্থানীয় বোদ্ধা হিসেবে স্বীকৃত। ১৯৬০'র দশকের মাঝামাঝি তুলনামূলক সাহিত্যে তার প্রথম গবেষণা ছিল জোসেফ কনরাডের উপন্যাস নিয়ে। ১৯৭০ এর দশকের শুরুতেই তিনি আকৃষ্ট হন ইউরোপীয়, বিশেষত ফরাসী কাঠামোবাদের দিকে। ১৯৭৫ সালে ফরাসী কাঠামোবাদের অন্যতম দুই পুরোধা জাঁক দেরিদার অবিনির্মাণ এবং মিশেল ফুকোর ক্ষমতা তত্ত্বের আলোচনায় আনুষ্ঠানিকভাবে যোগ দেন *বিগিনিংস : ইনটেনশন এন্ড*

মেথড শিরোনামের বইটি প্রকাশের মধ্য দিয়ে। নিজের অনুকল্প প্রাচ্য ও প্রতিচ্যের ঐতিহাসিক আন্তঃসম্পর্কের স্বরূপ উন্মোচনের ক্ষেত্রে তিনি ফুকোর ক্ষমতা ও জ্ঞানের গভীর কাঠামোগত আন্তঃসম্পর্কের ধারণা প্রয়োগ করেন। প্রবল ক্ষমতাতন্ত্রের বিপরীতে দাঁড়িয়ে সত্য বলবার জন্য প্রয়োজনীয় সাহসের স্বাক্ষর তিনি রেখেছেন তার সবচেয়ে আলোচিত রচনা, ১৯৭৫–৭৬ সালে স্ট্যানফোর্ডের সেন্টার ফর অ্যাডভান্স স্টাডি ইন বিহেভিওরাল সাইন্সে গবেষক হিসেবে কাজ করবার সময় লেখা *অরিয়েন্টালিজম*-এ।

শিল্প-সাহিত্য, সংস্কৃতি, দর্শন, মনস্তত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, রাজনীতি তথা সমসাময়িক বুদ্ধিবৃত্তির প্রতিটি প্রত্যঙ্গাকে আলোড়িত করেছে তার এই প্রাচ্যবাদ বিচার যার আওতায় সাইদ আধুনিক পশ্চিমা সভ্যতার বুদ্ধিবৃত্তি যে বহুমাত্রিক প্রক্রিয়ায় নিজের ঐতিহাসিক 'অপর' হিসেবে প্রাচ্যের সাংস্কৃতিক পরিচয় নির্মাণ করে তার সাথে উপনিবেশিক তথা সাম্রাজ্যবাদী আধিপত্য ও শোষণের যোগসূত্র বিশ্লেষণ করেন। এক্ষেত্রে তিনি আগ্রহী প্রাচ্য-প্রতীচ্যের আন্তঃসম্পর্কের রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও জ্ঞান-জাগতিক প্রক্রিয়ারগুলোর স্বরূপ অনুধাবনে। তার বিবেচনায় 'প্রাচ্য' একটি পশ্চিমা জ্ঞান জাগতিক নির্মাণ যার সাথে জড়িয়ে আছে উপনিবেশ যুগের প্রথম দিকে পৃথিবীর এই আধা-কল্পিত রহস্যময় ভূমিতে ইউরোপীয়ান অভিযাত্রীদের অভিনব রোমাঞ্চকর অভিযান ও অভিজ্ঞতার স্মৃতি। ফলে আধুনিক পশ্চিমের যাবতীয় জ্ঞান জাগতিক প্রতিভাসে এই 'প্রাচ্য' 'পরিবেশিত/উপস্থাপিত' হয়েছে প্রান্তিক অপর হিসেবে। প্রস্তাবের সমর্থনে সাইদ চুলচেরা বিশ্লেষণ করেছেন একাধারে পশ্চিমের দেশগুলোর ক্রুসেড থেকে সমসাময়িক কাল পর্যন্ত পররাষ্ট্রনীতি, শেক্সপিয়ার থেকে কিপলিং পর্যন্ত সাহিত্য, ভ্রমণ বৃত্তান্ত, ইতিহাস ও ইতিহাস তত্ত্ব, রাজনীতি, শিল্প-কলা, ব্রিটিশ সামাজিক নৃবিজ্ঞানের নৃতাত্ত্বিক মাঠ গবেষণা, প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর কর্তৃত্ববাদী শাস্ত্রচর্চা এমনকি আরব-ইজরাইল উত্তেজনা নিরসনে হেনরি কিসিঞ্জারের মতামত পর্যন্ত।

প্রত্যয় হিসেবে 'প্রাচ্যতন্ত্র/প্রাচ্যবাদ/প্রাচ্যবিদ্যা'র একাধিক অর্থ বা পরিবেশনজনিত, আন্ত-নির্ভরশীল দ্যোতনা আছে। সবচেয়ে বেশি প্রচলিত অর্থে এটি প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর আওতায় প্রাচ্যবিদ্যার যেকোনো ধরনের চর্চাকে বোঝায়। চর্চাকারী প্রাথমিক পরিচয়ে নৃবিজ্ঞানী, ইতিহাসবিদ, সমাজবিজ্ঞানী বা ভাষাবিজ্ঞানী যাই হোন না কেনো, তার প্রাচ্য সম্পর্কিত যেকোনো জ্ঞান জাগতিক তৎপরতাই বিশেষ বা সাধারণ অর্থে তাকে প্রাচ্যবিদ বলার জন্য যথেষ্ট এবং এক্ষেত্রে তিনি যা করেন তাকে 'প্রাচ্যবাদ' বলা চলে।

অন্যদিকে এই শাস্ত্রীয় ঐতিহ্যের নিরিখে, যে জনগোষ্ঠীগুলোর ঐতিহাসিক রাজনৈতিক নিয়তি, বিচ্ছিন্নতা ও অভিবাসন, স্বাতন্ত্র্য ও বিকাশ—প্রাচ্যবিদ্যার গোড়ার বিষয়বস্তু, আরো সাধারণতর অর্থে প্রাচ্যবাদ ঐ জনগোষ্ঠীগুলোর সাংস্কৃতিক পরিচয়কে ক্ষমতা সম্পর্কের পরিপূরক রূপে বিন্যস্ত ও পরিবেশন করে। এক্ষেত্রে প্রাচ্যবাদ হয়ে যায় 'প্রাচ্য' ও 'প্রতীচ্যে'র মধ্যে সত্তাগত বা চৈতন্য পর্যায়ের সুনির্দিষ্ট বিভাজন নির্ভর একটি চিন্তন পদ্ধতি। তখন এই পদ্ধতির প্রকরণগত আওতায় চলে আসে আধুনিক ইতিহাসের অসংখ্য লেখক, কবি, উপন্যাসিক, দার্শনিক, অর্থনীতিবিদ, সমাজবিজ্ঞানী, নৃবিজ্ঞানী, রাজনীতিবিদ, প্রশাসনিক কর্মকর্তাসহ আরো অনেকে যারা প্রাচ্য-প্রতীচির এই বিভাজনকে স্বতঃসিদ্ধ ধরে নিয়ে, প্রাচ্যের মানুষের চিন্তা, জীবন ও সংস্কৃতিকে নিজের কাজের বিষয় বা ক্ষেত্র হিসেবে নির্ধারণ করেন। প্রাচ্যবিদ্যার এই সংজ্ঞায়ন একাইলাস ও ভিক্টর হুগো বা দান্তে ও কার্ল মার্কসের রচনার তুলনামূলক পাঠ ও বিশ্লেষণের ক্ষেত্র তৈরি করে শাস্ত্রীয় প্রকরণ হিসেবে প্রাচ্যবিদ্যার শক্তিমত্তার প্রমাণ দেয়।

অষ্টাদশ শতকের শেষভাগকে প্রাচ্যবিদ্যার আবির্ভাব কাল ধরলে, বিগত একশ-দেড়শ বছর বয়সী প্রাচ্যবিদ্যার চেহারা দাঁড়ায় আধুনিক ক্ষমতাতন্ত্রের মতোই। আবির্ভাবের কিছুদিনের মধ্যেই এটি একটি মতাদর্শিক সংহতি সংঘের রূপ নেয় এবং এর মধ্য দিয়ে এনলাইটেনমেন্ট যোগ রেনেসাঁ যোগ উপনিবেশবাদ যোগ শিল্প বিপ্লব যোগ ফরাসী বিপ্লব যোগ রুশ বিপ্লবের উত্তরাধিকার নিয়ে

'আধুনিক' পশ্চিম মুখোমুখি হয় 'প্রাক-আধুনিক' প্রাচ্যের। এই প্রাচ্যবিদ্যা তখন নিজেকে উপনিবেশিক সম্প্রসারণবাদী ক্ষমতাতন্ত্রের পরিপূরক মতাদর্শ তৈরির কাজে লাগায়। এই প্রাচ্যবিদ্যাই তখন প্রাচ্যের মানুষ ও সমাজের বিবরণ লেখে, তাদেরকে দেখবার দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করে, তাদের কাছে সভ্যতার আলো পৌঁছে দেয়, শিক্ষা দেয় এবং সর্বোপরি শাসন করে ... মোদ্দাকথা হচ্ছে এই বিচারে প্রাচ্যবিদ্যা হচ্ছে প্রাচ্যের ওপর পশ্চিমা কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার একটি সুসংহত তরিকামাত্র। ফুকোর অনুগামী হিসেবে সাইদ এই তরিকাটিকে বিবেচনা করেন 'ডিসকোর্স' হিসেবে, যার কল্যাণে ইউরোপীয় সংস্কৃতি 'প্রাচ্য'কে রাজনৈতিক, সামাজিক, সামরিক, মতাদর্শিক, বৈজ্ঞানিক এমনকি কাল্পনিকভাবেও নিয়ন্ত্রণ ও পুনরুৎপাদন করে।

সাইদের মতে প্রাচ্য-প্রতীচ্য কোনো প্রাকৃতিক বিভাজন নয়, এমনকি এটা কোনো ভৌগোলিক বিভাজনকেও নির্দেশ করে না। 'প্রাচ্য' একটি ধারণা মাত্র যা পশ্চিমের একটি ঐতিহাসিক চিন্তন প্রক্রিয়ার ধারবাহিকতা, একটি কল্পিত ভৌগোলিক সীমানা, কিছু আধা কল্পিত সাংস্কৃতিক পরিচয়, বিচ্ছিন্ন কিছু চিত্রকল্প এবং ভাষার সমন্বয়ে ঐ ধারণার একটি বাস্তব প্রতিরূপ সৃষ্টি করে। একইভাবে 'প্রতীচ্য'ও একটি ধারণা যা একই ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ায় 'অপর' 'প্রাচ্যে'র বিপরীতে 'অহম' হিসেবে 'প্রতীচ্য'কে উপস্থাপন/নির্মাণ করে মানবিক চিন্তন প্রক্রিয়ার দ্বৈত বিপরীত কাঠামো পূর্ণ করে। সাইদের তাত্ত্বিক পরিগঠনে ফরাসী কাঠামো ও উত্তর-কাঠামোবাদী নৃবিজ্ঞানের প্রভাব ছাড়াও প্রাচ্য-প্রতীচ্যের সম্পর্ক বিচারে তিনি শরণ নিয়েছেন নব্য মনঃসমীক্ষণবাদী তাত্ত্বিক জাঁক লাঁকা'র। লাঁকার মতে, ব্যক্তি মানুষ কেবল নিজের বিপরীতে 'অপরে'র অস্তিত্বের সাপেক্ষেই নিজের ভেতর 'আমি'র অস্তিত্ব নির্মাণ করতে পারে। সাইদ এই একই যুক্তি প্রয়োগ করে দেখান যে, আধিপত্যশীল পাশ্চাত্য সংস্কৃতি প্রাচ্য সংস্কৃতির অপরায়নের মধ্য দিয়েই নিজের পরিচয় নির্মাণ করেছে।

এই ঐতিহাসিক চিন্তন প্রক্রিয়ার ধারাবাহিকতাকে সাইদ যুক্ত করেন উপনিবেশিক ক্ষমতাতন্ত্র এবং আধিপত্যবাদী ভৌগোলিক

সম্প্রসারণের সাথে। ১৯৯৮ সালের ক্যামব্রিজ এক্সপিডিশন এবং তার পরবর্তীকালে ব্রিটিশ ক্রিয়াবাদী নৃবিজ্ঞানের মাঠকর্মলব্ধ জ্ঞান উপনিবেশগুলোতে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলন, বিদ্রোহ ইত্যাদি মোকাবেলায় উপনিবেশিক প্রশাসনিকতাকে শক্তিশালী করেছে। তখনও কিন্তু প্রাচ্যবিদ্যাচর্চা বর্বর অপাশ্চাত্য সমাজগুলোকে 'সুসমাচার' শুনিয়ে সভ্য বানানোর জন্য পশ্চিমা সভ্যতার মহান মিশন হিসেবেই উপস্থাপিত। কিন্তু সাইদ একে গুরুত্বপূর্ণ মনে করছেন প্রাচ্যের ওপর ইউরো-আটলান্টিক ক্ষমতাতন্ত্রের জারি রাখা আধিপত্যের প্রতীক হিসেবে, তার আচার, সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের বিচারমূলক বয়ান হিসেবে। পরিবেশন ও উপস্থাপনের গুনে এই বয়ান এমনকি, একাধারে জৈবিক এবং সাংস্কৃতিক বর্ণবাদের জন্ম দিতে সক্ষম। তার এই সক্ষমতার পেছনে আছে জ্ঞান ও ক্ষমতার অন্তর্লীন সম্পর্কের বুনিয়াদ যা প্রাচ্যবিদ্যার বয়ানগুলোর কর্তৃত্বের উৎসও বটে। সাইদ প্রাচ্যের এহেন বাঙ্ময় বাস্তবতাকে শুধু পশ্চিমা কল্পনার জাল হিসেবেই বিবেচনা করেন না, তার বস্তুগত অস্তিত্বকেও আমলে নেন। প্রাচ্যবিদ্যা তাই চূড়ান্ত বিচারে পশ্চিমের বিভিন্ন সামাজিক, রাজনৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক প্রতিষ্ঠানের সমর্থনপুষ্ট মতাদর্শিক কথকতার প্রকাশ এবং তার প্রতিনিধিত্ব করে।

১৯৭৮ সালে 'অরিয়েন্টালিজম' প্রকাশের মধ্য দিয়ে সাইদের কলম যে বিতর্কের জন্ম দিয়েছিল, গোটা পশ্চিমা দুনিয়াকে বিগত একশ বছরে এত বড় আর কোনো বুদ্ধিবৃত্তিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হয়নি। গত ২৫ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় এই কলম যখন চিরদিনের মতো স্থির হল, তার আগের প্রায় তিন যুগে তা থেকে নিঃসৃত শব্দমালা আরো বহু যুগ হাজারো কলমকে ব্যতিব্যস্ত রাখবে জ্ঞান, ক্ষমতা ও সংস্কৃতির আন্তঃসম্পর্কের নিবিড় অনুধাবনে, শক্তি জোগাবে আসন্ন সব ইন্তিফাদাকে।

২৭ সেপ্টেম্বর ২০০৩
জুবেরি ভবন, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

ভাষা, সংস্কৃতি ও জাতিসত্তা প্রশ্নে আমাদের জাতিরাষ্ট্র

গৌরচন্দ্রিকা

> সৃষ্টির আদিতে আল্লাহ *বলিলেন* "আলো হউক"। আলো হইল। ... তিনি অন্ধকার হইতে আলো পৃথক করিয়া আলোর *নাম রাখিলেন* 'দিন' আর অন্ধকারের *নাম রাখিলেন* 'রাত'। ... অতঃপর আল্লাহ *বলিলেন* "আমার মতন করিয়া, আমার সহিত মিল রাখিয়া এই ক্ষণে মানুষ সৃষ্ট হউক"। সৃষ্টি হইল। হাঁ, তিনি তাহার মত করিয়াই মানুষ সৃষ্টি করিলেন ... ।
>
> (পবিত্র তৌরাত শরীফ। ১ম সিপারা : পয়দায়েশ। রুকু-১। আয়াত ৩-৫, ২৬-২৭)[১]

ভাষা, সংস্কৃতি ও জাতিসত্তা নিয়ে আমাদের আলোচনা শুরু হতে পারে আদি কিতাবের এই আদ্যকথা থেকেই। নবী মুসার ভাষা হিব্রুতে আশ্রিত এই তৌরাত শরীফ থেকে শুরু করে নবী মোহাম্মদের ভাষা আরবিতে আশ্রিত কোরান শরীফ পর্যন্ত বর্ণিত সৃষ্টিজগৎ ও মানুষের পয়দায়েশগুলির মধ্যে পার্থক্য আছে সামান্যই। নবী মুসার সময়, নবী ইসার জন্মেরও প্রায় পনেরশ বছর আগে থেকে শুরু করে অদ্যাবধি প্রধান তিনটি সেমেটিক ধর্মালম্বী—ইহুদি, খ্রীস্টান ও মুসলমান জনগোষ্ঠীর মানুষেরা

---

১ *কিতাবুল মোকাদ্দস*, বাংলাদেশ বাইবেল সোসাইটি, ঢাকা।

সৃষ্টিজগতের আদি উৎস প্রশ্নে এই পয়দায়েশই বিশ্বাস করে আসছে। সেই মোতাবেক সৃষ্টিকর্তা তাঁর ছয় দিনব্যাপী সৃষ্টিযজ্ঞের শেষ দিনে, তাঁর নিজেরই আদলে মানুষ সৃষ্টি করে অপরাপর সৃষ্টির ওপরে তাঁকে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করেন। মানুষ হয়ে যায় 'আশরাফুল মাখলুকাত'। তৌরাত শরীফের প্রথম সিপারার দ্বিতীয় রুকুর ষোল আয়াতে এসে আমরা প্রথমবারের মতো সৃষ্টিকর্তার সাথে আদি মানব আদমের কথোপকথন দেখতে পাই। আল্লাহ আদমকে আদেশ করেন তাঁর সৃষ্ট স্বর্গোদ্যানের মাঝে শুভ-অশুভ ভেদবিচারি জ্ঞানবৃক্ষের ফল গন্দম খাওয়া থেকে বিরত থাকতে।

আমাদের জানা নাই আল্লাহর সাথে আদমের এই কথোপকথন কোন ভাষায় হয়েছিলো। এই পবিত্র কিতাবসমুহেরও কোথাও বলা হয় নাই কোন সে ভাষা যাতে 'কুন' বলে সৃষ্টিকর্তা নিখিলের অজৈব অন্ধকার থেকে সৃষ্টি করলেন আলোকময় সঞ্চরণশীল জৈব-প্রাণ, সৃষ্টি করলেন বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড। কিতাবের বয়ান-বচনে শুধু পাওয়া যায় যে, তিনি নিজেকে প্রকাশ করেন বজ্র আর বিদ্যুৎ রূপে। তৌরাতের দ্বিতীয় রুকুর উনিশ আয়াতে আমরা দেখি তিনি আদমকে তার সৃষ্টিযজ্ঞের সামনে এনে দেখছেন তাঁর সৃষ্টির কোনটিকে আদম কী নামে ডাকছেন। আমাদের এও নিশ্চিত জানা নাই যে, আদম কেনো কোনটিকে কী নামে অভিহিত করেছিলেন। আমরা শুধু ভাবতে পারি, আদি এই ভাষাটি ছিলো এমন একটি ভাষা যা একই সাথে আল্লাহ ও আদমের, সৃষ্টি ও স্রষ্টার ভাষা, এই ভাষিক যোগাযোগের মধ্য দিয়েই সৃষ্ট হয়েছে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড। দার্শনিক যুক্তি-পরম্পরার পরের ধাপে গিয়ে তখন ভাবা যেতেই পারে—তবে কি মানুষ এই ভাষিক যোগাযোগ তথা ভাষারই সৃষ্টি? ভাষাই কি তবে সেই আদ্যগুণ যা তাবৎ সৃষ্টির 'নাম' রেখে তার অধিপতি হয়ে যাওয়ার ক্ষমতা দিয়ে মানুষকে করেছে ঈশ্বরের প্রতিরূপ? আদি কিতাবের পয়দায়েশ কি আমাদের এই ইশারাই দেয়?[২]

---

[২] 'পয়দায়েশ' বাংলা ভাষায় 'ভিসাপ্রাপ্ত' ফারসি শব্দ যার ইংরেজি প্রতিশব্দ জেনেসিস। সাম্প্রতিক বিজ্ঞানে মানুষ এবং ভাষার আদি উৎস

কিন্তু ইশারাবাজি এই রচনার উদ্দেশ্য নয়। নিজেকে প্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন করে 'আমি/আমরা' ভাবতে পারবার মুহূর্ত থেকে অদ্যাবধি মানুষের 'মানবীয়তা' সম্পর্কিত যে অভিজ্ঞান সেখানে ভাষার একটি অন্তর্লীন, কিন্তু গুরুতর রকমের কেন্দ্রীয় ভূমিকা আছে। এই ভূমিকা যাকে আমরা ব্যক্তির সাথে নিখিলের বা মানুষের সাথে প্রকৃতির সম্পর্ক হিসেবেও পাঠ করে থাকি, তার উন্মোচন প্রয়াস রয়েছে পৃথিবীর সব ধর্মদর্শনেই। নিজের সাথে নিখিলের সম্পর্ক নির্ণয়ে

নিয়ে তর্কের দুইটি ধারা রয়েছে–মনোজেনিসিস আর পলিজেনিসিস। প্রথমটিতে মনে করা হয় এক অভিন্ন উৎস থেকে পৃথিবীর তাবৎ মানব/ভাষাগোষ্ঠীর উদ্ভব। দ্বিতীয়টিতে মনে করা হয় বিভিন্ন উৎস থেকে বিভিন্ন মানব/ভাষাগোষ্ঠী উদ্ভূত হয়েছে। ভাষার ক্ষেত্রে প্রথমোক্ত ধারার ভাবুকেরা মানবেতিহাসের আদিতে একটি পরমা-ভাষার (ল্যাংগুয়েজ ইউনিভার্সেল) অস্তিত্বের কথা মাথায় রেখে ভাষা নিয়ে ভাবেন। এই ধারার সাম্প্রতিক দুই চিন্তকের কাজের সাথে আমার সামান্য চিন-পরিচয় আছে। প্রথম জন কলিম খান, যিনি মহাত্মন হরিচরণ বন্দোপাধ্যায়ের 'বঙ্গীয় শব্দকোষ' ভিত্তি করে, প্রাচীন বাংলা ও সংস্কৃত ভাষার ক্রিয়া-ভিত্তিক শব্দার্থ বিধি প্রয়োগ করে ভারতীয় পুরাণসমূহের এমন এক পাঠ-সম্ভাবনা দাঁড় করাচ্ছেন যা সাম্প্রতিক বিজ্ঞানের পরমা-ভাষা সংক্রান্ত গবেষণায় অভিনব এক অধ্যায়ের সূচনা করতে সক্ষম। তাঁর ভাষা-চিন্তা নিয়ে সাম্প্রতিক সময়ে মাথায় কিছু অমীমাংসিত সংশয় পুষে রাখলেও ভাষাতত্ত্বের জটিল জমিনে আমার প্রথম পদার্পণ কলিম খানের 'মারফতি' ভাষাতত্ত্বের হাত ধরেই। দ্বিতীয় জন প্রখ্যাত ইতালীয় ভাবুক, উপন্যাসিক ও প্রতীকার্থবিদ উমবার্তো ইকো, যিনি হিব্রু-ভাষার ঠিকুজি তালাশের মধ্য দিয়ে পরমা-ভাষা সংক্রান্ত চিন্তাকে উসকে দিয়েছেন দারুণভাবে। বলা বাহুল্য সংস্কৃত ও হিব্রু, এই ভাষা দুটি ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞানীদের মনোযোগের কেন্দ্রে রয়েছে ভাষাবিজ্ঞান চর্চার গোড়া থেকেই। দেখুন :

কলিম খান ২০০১, *পরমা ভাষার সংকেত : ক্রিয়াভিত্তিক শব্দার্থবিধি ও ভাষাতত্ত্বের নতুন দিগন্ত*, প্যাপিরাস, ঢাকা।

কলিম খান ২০০২, *পরমা ভাষার বোধন-উদ্বোধন : ভাষাবিজ্ঞানের ক্রিয়াভিত্তিক রি-ইঞ্জিনিয়ারিং*, অর্ফবিট পাবলিশার্স, কলকাতা।

Umberto Eco 1995, *The Search for the Perfect Language*, FontanaPress, London.

মানুষ এখানে সৃষ্টিকর্তার দ্বারস্থ। আদিকল্প ভিন্ন হলেও আধুনিক সাহিত্য, বিজ্ঞান বা শিল্পেরও কেন্দ্রীয় দার্শনিক তাড়না হচ্ছে ব্যক্তির সাথে নিখিলের এই সম্পর্কের উন্মোচন

যেখানে ভাষাই সাম্প্রতিক সময়ে রয়েছে মনোযোগের কেন্দ্রে। ভাষা কীভাবে কোন কারণে মানুষের প্রজাতিগত অনন্যতা তথা 'মানবীয়তা'র একটি মৌল-গাঠনিক উপাদান তার পুনরোপলব্ধি এই রচনার শিরোনামে ধার্য্য কর্তব্য পালনেও সহায়ক হবে।

প্রকৃতির রাজ্যে মানুষের যে বৈশিষ্ট্যগুলি আর সব প্রাণরূপের থেকে মানুষকে অনন্য করে তোলে ভাষা তার কেন্দ্রীয় একটি। বস্তু আর শক্তি দিয়ে গড়া এই নিখিল যার পুরোটাই চলে প্রকৃতির নিয়ম বা অনিয়মে। এর মাঝে মানুষ হচ্ছে একমাত্র প্রাকৃতিক সত্তা যার রয়েছে স্বাধীন চিন্তা। এই চিন্তার শ্রমনিষ্ঠ প্রয়োগে সে প্রকৃতির রূপান্তর সূত্রকে বদলে রূপ দেয় সৃজনের, সৃষ্টি করে সংস্কৃতি। ভাবা যেতে পারে আদি-সংস্কৃতি কৃষির কথা যার উদ্ভাবনের মধ্য দিয়ে মানুষ প্রকৃতির সাথে তার খাদ্য সম্পর্কটিও বদলে নিয়েছিলো আজ থেকে প্রায় ১২ হাজার বছর আগে। মানুষের সাংস্কৃতিক বিবর্তনে কৃষি আবির্ভাবের ভূমিকা/তাৎপর্য আমাদের অজানা নয়। ভাষা কিন্তু মানুষের তারও বহু আগের অর্জন, যার মধ্য দিয়ে বদলে গিয়েছিলো এই প্রজাতির জৈবযুথবদ্ধতার যাবতীয় সূত্র আর শর্ত। যুথবদ্ধতার জৈবিক সূত্রকে ছাড়িয়ে মানুষ পা রেখেছিলো এক প্রতীকী জগতে। যা কিছু ঘটমান বাস্তবে হাজির নেই তাকেও বাস্তবতার অনুষঙ্গ করে ফেলবার মানবীয় যে সামর্থ্য তাও মানুষ অর্জন করেছে ভাষার মাধ্যমে। চিন্তাশক্তি ছাড়া যে মানুষের অস্তিত্ব নেই এটা আমরা জানি কিন্তু ভাষার বাইরে যে চিন্তার আর কোনো আশ্রয় নেই সেটা আমরা আমাদের ঘিরে সদাবিরাজমান বাতাসের বাতাবরণের মতোই ভুলে থাকি। কিন্তু তারপরও ঘটনা এই যে, অদ্যাবধি মানবিক অস্তিত্বের সবচেয়ে বড় আশ্রয় ভাষাই, ভাষাই মানবীয়তা, নাম ছাড়া নামীর অন্য আশ্রয় আর কীই বা হতে পারে?

ভাষার আবির্ভাব মানুষের প্রজাতিগত জৈবযুথবদ্ধতার সূত্র/শর্তগুলোকে বদলে দেওয়ার পরে মানুষের যুথবদ্ধতার ইতিহাস হয়ে উঠেছে ব্যক্তি, সমাজ, সভ্যতা আর রাষ্ট্রের ইতিহাস। নিজের

প্রাকৃতিক সত্তার বিপরীতে একে আমরা মানুষের সাংস্কৃতিক ইতিহাস বলতেই পারি। সংস্কৃতি-চিন্তার ইতিহাসে সংস্কৃতিকে প্রকৃতির বিপরীতে ব্যাখ্যার সুদীর্ঘ একটি তরিকাগত রেওয়াজ চালু আছে।[০] সেই মোতাবেক সংস্কৃতি সৃজনকে মানুষের প্রজাতিগত প্রতিভা জ্ঞান করে সংস্কৃতিকে সংজ্ঞার্থে মানবীয়তার একেবারে কাছাকাছি নিয়ে আসা হয়। জৈবিক বা প্রাকৃতিক নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত মানুষের স্বাধীন সত্তাজাত ক্রিয়াকলাপ বা এর ফলাফলই সংস্কৃতি। সাংস্কৃতিক মানুষ হচ্ছে তার 'প্রাকৃতিক' বা জৈবিকসত্তা হতে নিষ্ক্রমণের ফলাফল আর এই নিষ্ক্রমণ পথে মানুষের যুথবদ্ধ প্রয়াসের ভিত্তি কাঠামো নিঃসন্দেহে সাংস্কৃতিক জ্ঞানের ভাষা নির্ভর বিস্তার। সাংস্কৃতিক মানুষের যা কিছু ঐতিহাসিক অর্জন, ব্যক্তি-সমাজ-রাষ্ট্রকাঠামোজুড়ে যে বিশাল সংস্কৃতির দেহ তার শিরা-উপশিরা-ধমনীজুড়ে ভাষার স্রোত নিরন্তর বয়ে চলে বলেই তা প্রাণবান।

ঠিক কি কারণে মানুষের আদিম সাম্যবাদী কৌম সমাজ ভেঙ্গে গিয়ে, কলিম খানের ভাষাতাত্ত্বিক ব্যাখ্যায় 'ইষৎ অগ্নিপ্রাপ্ত আম' হিসেবে 'আমি' তথা ব্যক্তি-মালিক ইন্দ্রের আবির্ভাব ঘটে গিয়েছিলো

---

০ এ প্রশ্নে স্মর্তব্য ইমানুয়েল কান্ট আর জর্জ ডব্লিউ এফ হেগেলের নাম। কান্ট মনে করতেন সংস্কৃতি হচ্ছে মানুষের সেই সামর্থ্য যার মাধ্যমে সে প্রকৃতির নিয়মের বিরুদ্ধে 'স্বেচ্ছাচারী' (আরবিট্রারি) প্রতিরূপ প্রতিষ্ঠা করে। এই স্বেচ্ছাচারিতার মূল সূত্রটি রয়েছে মানুষের ভাষাতেই। ভাষায় শব্দ বা চিহ্ন প্রতীকের সাথে তৎসংশ্লিষ্ট অর্থের কোনো প্রাকৃতিক কার্যকারণ সম্পর্ক নেই (যদিও ক্রিয়াভিত্তিক শব্দার্থবিধিতে মনে করা হয় আছে)। সেই বিচারে সংস্কৃতি হচ্ছে স্বাধীন চিন্তার মাধ্যমে প্রাকৃতিক উপাদানের রূপান্তর এবং তার প্রতীকী প্রতিরূপ নির্মাণের মানবিক সামর্থ্য। অন্যদিকে হেগেল সংস্কৃতিকে দেখেন নিজের প্রাকৃতিক সত্তা থেকে মানুষের ক্রমাগত নিষ্ক্রমণের প্রক্রিয়া হিসেবে। সংস্কৃতি এখানে নিজের প্রাকৃতিক সত্তার বাইরে পা রাখবার সামর্থ্য। দেখুন :

George W F Hegel 1967, *The Phenomenolgy of Mind*, Herper & Row Publishers, New York. (Trans. George Lichtheim)

Immanuel Kant 1798, 'Anthropology from a Pragmatic Perspective', as quoted in Allessandro Duranti 1997, *Linguistic Anthropology*, Cambridge University Press, Cambridge.

সে আমাদের প্রাসঙ্গিক হলেও খানিকটা দূরের প্রশ্ন। কিন্তু তার আবির্ভাবই যে ভাষা আশ্রিত সংস্কৃতির সূত্র মুছে দিয়ে মানুষের যুথবদ্ধতার সূত্রগুলোকে বিন্যস্ত করেছিলো ক্ষমতার বিন্যাসে, আধুনিক ইতিহাস সেই সাক্ষ্য দেয়। ফলত, সাংস্কৃতিক সমস্বত্ত্বতা বা বৈচিত্র্যের চেয়েও ক্ষমতার বিন্যাসই অনেক বেশি বিন্যস্ত করেছিলো মানুষের আধুনিকতম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্রকে। পশ্চিমা সভ্যতার ছায়ায় এই রাষ্ট্রের প্রকৃষ্টতম বিকাশটি আবার উপনিবেশিকতায় ভর করে পৃথিবীর পুরো মানচিত্রের মানুষের অনিবার্য ঐতিহাসিক নিয়তি করে তুলেছে এই আধুনিক রাষ্ট্রকে। এনলাইটেনমেন্ট, রেনেসাঁ, ফরাসী বিপ্লব আর রুশ বিপ্লবের ঔরসপুত্র হিসেবে যে আধুনিক রাষ্ট্রের আবির্ভাব ঘটেছে পশ্চিমে, ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিশ্বায়ন মানবীয়তার প্রতি তার তাবৎ প্রতিশ্রুতিকেই নির্জলা বাচনিকতায় পর্যবসিত করে এক সংঘাতময় বিশ্ব পরিস্থিতি এনে দিয়েছে আমাদের। বিশ্ব ইতিহাসের এই ছকে আমাদের জাতিসত্তা আর জাতিরাষ্ট্রের স্বরূপ অনুধাবনের উপলক্ষ্য হিসেবে 'একুশ' কি আমাদের ভিন্নতর কোনো উপলব্ধির মুখোমুখি দাঁড় করাতে পারে?

আমাদের জাতিসত্তা ও জাতিরাষ্ট্র

কী ছিলো একুশের পলাশ-রাঙা বুক জুড়ে?

সংস্কৃতি সৃজনের মধ্য দিয়ে মানুষ নিজেকেই সৃষ্টি করে চলে নিরন্তর। এই সৃজনযজ্ঞে মানুষ শুধু আমিই সৃষ্টি করে না, সৃষ্টি করে আমরাও, সৃষ্টি করে পরিবার-কৌম-সমাজ-জাতির আদলে নিজেদের সামষ্টিক পরিচয়ের বহুবিধ রূপ। এই যুথবদ্ধ সৃজনযজ্ঞের মধ্য দিয়ে ব্যক্তি মানুষের নামের সাথে জুড়ে যায় আরো অনেকগুলো পরিচয়। ক্ষমতার ইতিহাস এই সৃজনযজ্ঞের নিয়ন্তা হয়ে উঠবার পরে এই ইতিহাসের সবচেয়ে পরিশীলিত অর্জন হিসেবে আধুনিক জাতিরাষ্ট্র আবির্ভূত হয়। আধুনিক ব্যক্তি মানুষের অনিবার্য আইনি-পরিচয় হয়ে দাঁড়ায় তার জাতিরাষ্ট্রের পরিচয়, বৈশ্বিক ক্ষমতা বিন্যাসেরও মৌলিক একক হয়ে দাঁড়ায় জাতিরাষ্ট্র। ব্যক্তি-পরিচয়ের পাশাপাশি এই রাজনৈতিক পরিচয়ের চর্চা বা এই দুই পরিচয়ের সম্পর্কটির চর্চা আধুনিক মানুষের অমোঘ নিয়তি হয়ে

দাঁড়ায়। পৃথিবীর তাবৎ জাতিরাষ্ট্রের ভূ-রাজনৈতিক সীমার ভেতরে এবং বাইরে এই পরিচয় চর্চার ইতিহাস এক নয়। কিন্তু তারপরেও বলা যায় মুখ্যত সাংস্কৃতিক সমস্বত্ত্বতার ধারণা এবং ক্ষমতার আর্থ-রাজনৈতিক বিন্যাস এই দুইয়ের দ্বান্দ্বিক ছকেই বিন্যস্ত হয় মানুষের এই পরিচয়টি।

কোনো ভাষার কি এই জাতিরাষ্ট্র গঠন করবার ক্ষমতা আছে? আমাদের জাতিসত্তা নিয়ে বাঙালি/বাংলাদেশি জাতীয় রাজনৈতিক দলজাত কূট-কথকতার ধোঁয়া জাল সরাতে পারলে ভাষার প্রশ্নটিই আমাদের জাতিগত পরিচয় নির্মাণের প্রথম রাজনৈতিক সংগ্রামের ক্ষেত্র হিসেবে নির্ণিত হয়। একারণেই এখনও 'একুশ' আমাদের জাতিসত্তাগত পরিচয়ের সবচেয়ে বড় প্রতীক, একুশের চেতনা আমাদের জাতিত্ববোধের আদি সোপান হিসেবে চিহ্নিত। সেই বিচারে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের আবির্ভাব, একটি ভাষা কি করে একটি জাতিরাষ্ট্র গঠন করে সেই প্রশ্নের সামনে নিয়ে এসেছিলো রাষ্ট্রচিন্তকদের, আমাদের জাতিরাষ্ট্রটি গঠনের ক্ষেত্রে বাংলা ভাষার কেন্দ্রীয় উপাদান হিসেবে ভূমিকা পালন করাটা আধুনিক রাষ্ট্রের ইতিহাসে অভিনব ঘটনাই বটে। বিষয়টিকে বোধ করি আরেকটু তলিয়ে দেখবার প্রয়োজন আছে।

পৃথিবীর উত্তরের সভ্যতাগুলোর পরিবৃত্তে আধুনিক জাতিরাষ্ট্রের ইতিহাস যাই হোক না কেনো, ঐতিহাসিকভাবে আমাদের আধুনিক রাষ্ট্র আর উপনিবেশিকতার অভিজ্ঞতা অভিন্ন। অনড় সাংস্কৃতিক প্রাচীর ঘেরা, অর্থনৈতিকভাবে অর্ন্তমুখীন প্রাচীন ভারতীয় গ্রামসমাজের যে দিকটি কার্ল মার্কসসহ সে সময়ের পশ্চিমা ইতিহাসবিদদের ভাবিয়েছে তা হলো কেন্দ্রীভূত কোনো রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রতি এই গ্রামসমাজগুলোর স্থবির নির্লিপ্ততা। গোড়ার দিকে কার্ল মার্কসও এই স্থবিরতার অবসানে একমাত্র সম্ভাব্য কার্যকর শক্তি হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন আধুনিক রাষ্ট্রের অস্ত্র-সজ্জিত ব্রিটিশ শাসনকেই। ব্রিটিশ শাসনেরও আগে, হিন্দু রাজবংশ বা মুঘল শাসন আমলেও এই গ্রাম সমাজের 'আদার ব্যাপারীরা' রাষ্ট্র 'জাহাজে'র খোঁজ-খবরে খুব একটা আগ্রহী

ছিলেন না। বহিরাগত বা অনুপস্থিত শাসকদের খাজনা/নজরানা দিয়ে নিজেদের যাপিত জীবনটি নিরুপদ্রব ও নিরবিচ্ছিন্ন রাখাটাই ছিলো এই গ্রাম সমাজগুলোর ঐতিহাসিক প্রবণতা। মার্কসের নিজস্ব ইতিহাসতত্ত্ব যত পরিশীলিত হয়েছে, ভারতবর্ষের ইতিহাস ও সমাজ সম্পর্কে তাঁর পরিচয় যত গভীর হয়েছে ততই তিনি সরে এসেছেন ভারতে ব্রিটিশ শাসনের সঞ্জীবনী ভূমিকার প্রবক্তা অবস্থান থেকে। এসময়কালে তার অত্যন্ত স্পষ্ট পর্যবেক্ষণ হচ্ছে 'ব্রিটিশ শাসন একদিকে ভারতের নিজস্ব সমাজকাঠামোকে ভেঙ্গে তছনছ করে দিচ্ছে, কিন্তু পরিবর্তে কোন বৈপ্লবিক গতিশীলতার সৃষ্টি হচ্ছে না। আধুনিক ইউরোপের পুঁজিবাদী রীতিনীতি, কলাকৌশল, রাষ্ট্রীয় গঠন প্রক্রিয়া, আইনকানুন, ধ্যানধারণা সেখানে চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে বটে, কিন্তু দেশজ সমাজপ্রক্রিয়ার সংমিশ্রণে তা এক উদ্ভট চেহারা নিচ্ছে। ফলে ঔপনিবেশিক স্বার্থে ভারতবর্ষের মানুষের ওপর শোষণের চাপ ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে কিন্তু অন্য দিকে কোনও অগ্রসর সমাজ ব্যবস্থার ভিত রচিত হচ্ছে না।'[৪]

আমাদের রাষ্ট্রের সাথে ব্যক্তি ও সমাজের ঐতিহাসিক সাংস্কৃতিক বিচ্ছিন্নতার একধরনের ব্যাখ্যা আমরা মার্কসের এই পর্যবেক্ষণ থেকে পেতে পারি।[৫] বাস্তবিক অর্থে উপনিবেশিকতা বা সাম্প্রতিক সময়ে ভিন্ন কোনো উপায়েই হোক, অন্যের সংস্কৃতি গ্রহণ বরাবরই ছিলো দখলেরই নামান্তর। ইতিহাসের সব দাপুটে পণ্য সভ্যতাই তার ঐতিহাসিক অধিকারভুক্ত পথে মুখোমুখি হওয়া সমস্ত পূর্বাপর সমাজকে চূর্ণবিচুর্ণ করে। কথাটিকে উল্টে বললে প্রাক-ধনতান্ত্রিক সমাজ ও তার অর্থনীতি ধনতান্ত্রিক সমাজের

---

৪ পার্থ চট্টোপাধ্যায় ২০০০, *ইতিহাসের উত্তরাধিকার*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা।

৫ এই ঐতিহাসিক বিচ্ছিন্নতা দৃশ্যমান আমাদের প্রাত্যহিক কথকতাতেও। দেশ বলতে আমরা যেমন এখনও খুলনা, রাজশাহী, বরগুনা, বরিশাল বা চট্টগ্রাম বা অন্য কোনো অঞ্চলের এক গ্রামীণ জনপদকে যতটা বুঝি ততটা সামষ্টিক একটি দেশকে বুঝি না। 'সরকারকা মাল দরিয়ামে ঢাল' জাতীয় কথকতাও জাতির সাথে জাতিরাষ্ট্রের এই ঐতিহাসিক ছেদেরই বহিঃপ্রকাশ।

বাজারের কবলে পড়ে এত দুর্বল আর শক্তিহীন হয়ে পড়ে যে নিজের সনাতন সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য আর ধরে রাখতে পারে না। এক্ষেত্রে এই টলায়মান সমাজগুলো, তার মানুষেরা ব্যক্তি হিসেবে বেঁচে থাকবার প্রয়োজনে অধিকতর সক্ষম সংস্কৃতির মানদণ্ড গ্রহণ করে। কিন্তু এই গ্রহণ তাদের স্বেচ্ছাপ্রণোদিত নয়, অনিবার্য ঐতিহাসিক পরিণতি। এই 'টলায়মান উদ্বাস্তুদল'কেই স্ট্যানলি ডায়মন্ড উল্লেখ করেন 'পশ্চিমা সভ্যতার আবশ্যিক গ্রাহক' হিসেবে।[৬]

প্রায় দুইশত বছরের ব্রিটিশ শাসনের মধ্য দিয়ে আমরা আবশ্যিক গ্রাহক হিসেবে পশ্চিমা সভ্যতার যে প্রধান সাংস্কৃতিক মানদণ্ডটি গ্রহণ করতে পেরেছি তা হলো আধুনিক রাষ্ট্র। পৃথিবীর প্রথম বহুজাতিক ব্যবসাদার ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এবং তার অব্যবহিতকালে ব্রিটিশরাজের শাসন ভারতের কৃষিজ উদ্বৃত্ত নির্ভর অভিজাতদের বড় অংশটিরই চিন্তা, মনন ও মানসে ধনতান্ত্রিক ইউরোপীয় সভ্যতাকে মোহনীয় করে তুলেছিলো। ধনতান্ত্রিক সভ্যতার সবচেয়ে উদ্ভিন্ন রূপটিকে স্থানিক ক্ষমতা কাঠামোতে নিজের অবস্থানের সাথে মেলাতে গিয়ে এই অংশটির মনে উপ্ত হয়েছিলো একটি স্বাধীন আধুনিক রাষ্ট্রের স্বপ্ন। ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন আদতে পাশ্চাত্য সভ্যতার রস-নিষিক্ত এই অভিজাত সম্প্রদায়টির পশ্চিমা অংশীদার বিবর্জিত কিন্তু পাশ্চাত্য ধাঁচের 'নিজের' একটি রাষ্ট্রকাঠামোর অধিকর্তা হয়ে উঠবার আকাঙ্ক্ষারই রাজনৈতিক অভিপ্রকাশ। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন সে অর্থে ভারতে ব্রিটিশ বিপ্লবেরই ফলাফল।[৭]

---

৬ তালাল আসাদ উদ্ধৃত। দেখুন, Talal Asad 1992, 'Conscripts of Western Civilization', chapter 17 in Christine Ward Gailey (ed.) *Civilization in Crisis: Anthropological Perspectives*, Dialectical Anthropology, Essays in Honor of Stanley Diamond, University Press of Florida, Gainesville. (*পশ্চিমা সভ্যতার আবশ্যিক গ্রাহক* শিরোনামে রেহনুমা আহমেদের অনুবাদ।)

৭ তালাল আসাদের পূর্বোক্ত রচনাটির অন্যতম একটি উপলব্ধি এটি। কিন্তু নিঃসন্দেহে এটি ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের পূর্ণাঙ্গ চেহারা নয়। শুধু অভিজাত অংশ নয়, ভারতের নিম্নবর্গীয় বিশাল জনগোষ্ঠীর সম্পৃক্ততা ছাড়া এই আন্দোলন কখনই কোনো সফল রূপ পেত না। কিন্তু সে সম্পৃক্ততার ধরন ছিলো ভিন্ন। জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে নিম্নবর্গের

উপলব্ধিটি একটু অস্বস্তিকর হতেই পারে। কিন্তু 'রাষ্ট্র' ধারণাটির সাথে আমাদের বৃহদাংশ গণ-মানুষের চৈতন্যগত ছেদটি মূলত 'আধুনিক রাষ্ট্র' ধারণার সাথে তার সাংস্কৃতিক ছেদ। ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের ধারায় পরবর্তীতে কীভাবে ধর্মীয় পরিচয়কে কেন্দ্র করে বিভক্ত হয়ে ১৯৪৭ এসে দুটি ভিন্ন রাষ্ট্রের জন্ম হয়েছিলো সে আমাদের জানা প্রসঙ্গ। কিন্তু ধর্মকে আশ্রয় করেও নব প্রতিষ্ঠিত দুটি রাষ্ট্রই কেনো তার জনগণের সাথে সাংস্কৃতিক যোগ সাধনে ব্যর্থ হলো সেটা প্রচলিত জাতীয়তাবাদী ইতিহাসগুলোতে কখনই তলিয়ে দেখা হয়নি। পৃথিবীর সবচেয়ে বৈচিত্র্যপূর্ণ সাংস্কৃতিক মানচিত্রের যুক্তরাষ্ট্র ভারতের ক্ষেত্রে একথা যেমন সত্য তেমনি সত্য মুসলমান জাতিসত্তাকে পুঁজি করে জন্ম নেওয়া পাকিস্তানের ক্ষেত্রেও। দ্বিতীয়টির ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠার তৃতীয় বছরেই মুসলমান জাতিসত্তার ধারণাকে ছাপিয়ে এর পূর্ব অংশটির জনগণ ভাষাকে কেন্দ্র করে ভিত গড়ে ফেলল স্বকীয় একটি জাতিসত্তার যা ৬২, ৬৯, ৭০-এর গণআন্দোলন আর একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে বিকশিত হয়ে আশ্রয় খুঁজে পেল বাংলাদেশ নামের একটি স্বাধীন, সার্বভৌম রাষ্ট্রের মধ্যে।

সম্পৃক্ততার স্বরূপ নিয়ে সাম্প্রতিককালে বহুল আলোচিত 'নিম্নবর্গের ইতিহাস' ধারার যে ইতিহাস চর্চা তাতেও আসাদের এই উপলব্ধিরই প্রতিধ্বনি ঘটে। জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে এই বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর সম্পৃক্ততায় যতনা স্থানিক ক্ষমতা বিন্যাস ক্রিয়াশীল ছিলো একটি কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রের ধারণা ততটা স্পষ্ট ছিলো না। ফলে অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের নামেই এই নিম্নবর্গীয় কৃষকেরা ১৯২১ সালে চৌরিচৌরায় থানা আক্রমণ করেছিলো গান্ধিজীর নামে জয়ধ্বনি দিয়েই। যার ফলশ্রুতিতে গান্ধী নেতৃত্বাধীন কংগ্রেসকেও পিছিয়ে আসতে হয়েছিলো অসহযোগ আন্দোলন থেকে। কংগ্রেস সমর্থক পত্রিকাগুলোও সমালোচনা মুখর হয়ে উঠেছিলো গান্ধীজির এ ধরনের 'আনঅফিসিয়াল ক্যানোনাইজেশনে'র বিরুদ্ধে। দেখুন :
শাহিদ আমিন ১৯৯৭, 'গান্ধী যখন মহাত্মা', গৌতম ভদ্র ও পার্থ চট্টপাধ্যায় (সম্পাদিত), *নিম্নবর্গের ইতিহাস*, আনন্দ পাবলিশার্স লিমিটেড, কলকাতা।
গৌতম ভদ্র ১৯৯৪, *ঈমান ও নিশান : উনিশ শতকে বাংলার কৃষক চৈতন্যের এক অধ্যায়*, সুবর্ণরেখা, কলকাতা।

অর্থনৈতিক শোষণ-বঞ্চনা থেকে মানবিক মুক্তিই রাষ্ট্র বিপ্লবে জনগণের সম্পৃক্ততার সবচেয়ে বড় ভিত্তি। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার আয়োজনে শোষণ যখন মানবিক অস্তিত্বকে বিপর্যস্ত করে তোলে তখনই মানুষ বিদ্রোহ করে প্রচলিত ক্ষমতা বিন্যাসের বিরুদ্ধে। মানুষের ইতিহাস তখন কথা বলে সংঘবদ্ধ মানুষের স্বরে। কোন ঐতিহাসিক প্রয়োজনে এদেশের মানুষেরা নিজেদের জাতিত্ববোধের নিশান হিসেবে বেছে নিয়েছিলো মাতৃভাষাকে? বাংলার ঐক্যবদ্ধ মানুষের কণ্ঠস্বরে ইতিহাসের কোন সম্ভাবনা উঁকি দিয়েছিলো বায়ান্ন'র একুশে ফেব্রুয়ারিতে? ইতিহাসে প্রথমবারের মতন রাষ্ট্রের সাথে ব্যক্তির ঐতিহাসিক ছেদ ঘুচিয়ে দিতেই কি সেদিন ভাষাকে নিয়ে আসা হয়েছিলো আর্থ-রাজনৈতিক অধিকার আদায়ের নিশান বানিয়ে? মানুষের রাজনৈতিক সংঘবদ্ধতাকে ভাষার সূত্রে গেঁথে ইতিহাস কি আরো মানবিক কোনো রাষ্ট্র-সমাজের স্বপ্ন দেখেছিলো সেই ফেব্রুয়ারিতে?

উনবিংশ শতকের শেষভাগেই নিজ ক্ষমতা কাঠামোর আয়োজনে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার অসম সামাজিক বিন্যাসের অভিভাবকত্ব এবং পরবর্তী সময়ে ব্যক্তি মানুষের মানবিক-অস্তিত্ব হন্তারক ভূমিকা পালনের অভিযোগে আধুনিক রাষ্ট্র একটি মানবিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃতি হারাতে থাকে, খোদ পাশ্চাত্যেই। মাতৃভাষার দাবিকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের আবির্ভাবের মধ্যে এই প্রতিষ্ঠানটির মানবিকীকরণের একটি ঐতিহাসিক সম্ভাবনার সৃষ্টি হয়েছিলো। একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের অর্থনৈতিক পরিমণ্ডল, একটি ভাষা এবং একটি স্বাধীন স্বতন্ত্র পরিচয়—যেগুলোকে তাদের বলে অন্যরা স্বীকৃতি দেবে—এই মানবিক রাষ্ট্র-কল্পনার মধ্য দিয়েই আবির্ভাব ঘটেছিলো বাংলাদেশ রাষ্ট্রের। সাবেক উপনিবেশিত পৃথিবীর মানচিত্রজুড়ে আর দশটি উত্তর-উপনিবেশিক জাতিরাষ্ট্রের মতো নিজ গণমানুষের সাথে সাংস্কৃতিকযোগহীন পশ্চিমা ধাঁচের আধুনিক রাষ্ট্র গড়বার বদলে নিজের মানবসত্তার উদ্ভাসে মানবিক একটি রাষ্ট্র গড়বার প্রত্যয়ই ঘোষিত হয়েছিলো একুশের লাল জমিনে। কোনো

ধর্ম বা বর্ণের পরিচয়ে নয়, সংকীর্ণ কোনো জাতীয়তাবাদ নয়, ভাষাকে যুথজীবীতার সূত্র করে একুশের পলাশ রাঙা বুক জুড়ে ইতিহাস পৃথিবীর মানবিকতম রাষ্ট্রটির স্বপ্নই দেখেছিলো সেদিন।

আমাদের জাতি রাষ্ট্র : ইতিহাসের স্বপ্নভঙ্গের ইতিবৃত্ত

কিন্তু হয়নি, অগ্রসরতর কোনো মানবিক রাষ্ট্রের জন্ম হয়নি একুশের গর্ভ থেকে। গণমানুষের প্রতিবাদী কণ্ঠে ধ্বনিত ইতিহাসের আকাঙ্ক্ষা অবিশ্রুতই থেকে গিয়েছিলো আমাদের রাজনৈতিক নেতৃত্বের কাছে। একুশের চেতনার এই মানবিক অনুধাবনের প্রস্তুতি বা সামর্থ্য কোনোটিই ছিলো না আমাদের জাতীয়তাবাদী রাজনীতির। একাত্তরে এসে একুশের চেতনার উত্তাপ আমাদের একটি স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দ্বারপ্রান্তে নিয়ে এসেছে সত্যি, কিন্তু সে রাষ্ট্রও তার নাগরিকের সাথে মানবিক কোনো যোগ-সাধনে সমর্থ হয়নি। উপনিবেশিক আধুনিক রাষ্ট্রের সাথে দেশজ সমাজ প্রক্রিয়ার সংমিশ্রণে যে 'উদ্ভট চেহারা'র কথা মার্কস লিখেছিলেন ভারত ইতিহাস প্রশ্নে, আমাদের স্বাধীন রাষ্ট্রটিও তার প্রতিরূপ হয়ে গিয়ে আর দশটি উত্তর-উপনিবেশিক দেশের ঐতিহাসিক রাজনৈতিক পরিণতিকেই বরণ করে নিল। আমাদের জাতিরাষ্ট্রের তৎপরবর্তী ইতিহাস একটি মানবিক রাষ্ট্রের স্বপ্নভঙ্গের ইতিহাস।

মাতৃভাষাকে কেন্দ্র করে একটি মানবিক রাষ্ট্র গঠন নিছক কোনো কল্প-বিলাসিতা নয়। একটি উত্তর উপনিবেশিক দেশের বাস্তবতায় আধুনিক রাষ্ট্রের সাথে ব্যক্তি মানুষের ঐতিহাসিক ছেদ মোচনের পথটি মূলত মাতৃভাষার রাষ্ট্রিক বিকাশের পথই। কেন্দ্রীভূত কোনো রাজনৈতিক ব্যবস্থা-বিমুখ ভারতের গ্রাম সমাজের মানুষেরা উপনিবেশিকতার মধ্য দিয়ে আধুনিক রাষ্ট্রের শাসনপ্রণালী, আইনি-ব্যবস্থা, অগ্রসরতর শিক্ষা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ইত্যাদির হাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ হতে হতেই এই রাষ্ট্রকে নিজের রাজনৈতিক নিয়তি হিসেবে বুঝে নিয়েছিলো। স্বনির্ভর অর্থনীতির গ্রামসমাজ যখন ধনতান্ত্রিক বিকাশের ধারায় বিপর্যস্ত হয়ে পড়ল, নিজের অর্থনৈতিক নিয়তিকে মোকাবেলার তাগিদ থেকেই এই মানুষেরা অংশীদার হয়েছিলো রাষ্ট্র-বিপ্লবের। ভারতের ঐতিহাসিকভাবে দরিদ্রতর নিম্নবর্গীয় মুসলমান জনগোষ্ঠী ধর্মকে আশ্রয় করে পাকিস্তান

রাষ্ট্র–কাঠামোর মধ্যে তার পরিবর্তিত আর্থ–রাজনৈতিক নিয়তি তথা আধুনিক রাষ্ট্রের সাথে সাংস্কৃতিক যোগ–সাধন ঘটাতে চেয়েছিলো। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানের অভিজাত মুসলিম জাতীয়তাবাদী নেতৃত্ব অধিকতর মুসলমানিত্বের যুক্তিতে নতুন জাতিরাষ্ট্রে ভাষাসহ তাবৎ সাংস্কৃতিক পরিচয়ের প্রশ্নে পশ্চিমের উর্দু সংস্কৃতিকেই চাপিয়ে দিতে চাইল সংখ্যাগরিষ্ঠ পূর্ববঙ্গের বাংলাভাষী জনগোষ্ঠীর ওপর। আধুনিক রাষ্ট্র ধারণার মাঝে নিজের আর্থ–রাজনৈতিক নিয়তির সাথে যুঝতে থাকা পূর্ববঙ্গের মানুষেরা নব্য রাষ্ট্রের বুর্জোয়া অধিপতিদের এই আধিপত্যকামী আকাঙ্ক্ষার জবাব কীভাবে দিয়েছিলো জাতীয়তাবাদী ইতিহাস চর্চার সুবাদে তা আমাদের সবার কাছেই সুবিদিত।

ধর্ম–ভিত্তিক জাতীয়তাবাদকে ছাপিয়ে ভাষাকে কেন্দ্র করে রাষ্ট্রের সাথে নিজের সম্পর্কের ফয়সালা করবার ব্যাপারটি শুধু একটি স্বতন্ত্র জাতীয়তাবাদের আবির্ভাবের চেয়ে অনেক গভীরতর বিষয়। শাসনপ্রণালী, আইনি–ব্যবস্থা, অর্থনৈতিক উৎপাদন, শিক্ষা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিসহ আধুনিক রাষ্ট্রের যা কিছু অর্জন, যুথবদ্ধ মানুষের আর সব অর্জনের মতোই তারও আদি ও মৌলিক আশ্রয় যে ভাষা, ফারসি–ভাষী মুঘল ও ইংরেজি–ভাষী ব্রিটিশ রাষ্ট্রের সাথে যুঝতে গিয়ে পূর্ববঙ্গের মানুষের ইতিহাসবোধে এই উপলব্ধি এসে গিয়েছিলো। ধর্ম–ভিত্তিক জাতীয় একাত্মবোধের ধারণা পাকিস্তান রাষ্ট্রের উষালগ্নেই হোঁচট খাওয়ায় সেই বোধ আরো পোক্ত হয়েছিলো। তার ফলেই নিজের একটি স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের পথে আমাদের প্রথম অনড় রাজনৈতিক প্রতিরোধের ক্ষেত্র হয়ে উঠলো রাষ্ট্রকাঠামোর ভাষা হিসেবে মাতৃভাষাকে অধিষ্ঠিত করবার সংগ্রাম।

বাংলাদেশের পরবর্তী জাতীয়তাবাদী নেতৃত্ব তার উপনিবেশিক অনুষঙ্গের ফেরে পড়ে গণ–মানুষের এই সংগ্রাম থেকে একটি অনেক বেশি মানবিক জাতিরাষ্ট্রের আকাঙ্ক্ষাকে নিষ্কাশন করতে ব্যর্থ হলেন। একুশের চেতনা আমাদের জাতিসত্তাগত পরিচয়ের 'টোটেম' হিসেবে উদযাপনে উদযাপনে গরিয়ান ও মহিয়ান বলে প্রতিপন্ন হলো বটে, কিন্তু তাতে রাষ্ট্রের ভূ–রাজনৈতিক পরিসীমায় মানুষের যাপিত জীবনে মাতৃভাষার স্রোতধারা সঞ্জননী হলো না

এতটুকুও। স্বাধীনতা-উত্তরকালেও শিক্ষা ব্যবস্থার রন্ধ্রে রন্ধ্রে উপনিবেশিক অবশেষের পুনরুজ্জীবনের ফলে রাতারাতি বাংলা ভাষায় শিক্ষাকে জনগোষ্ঠীর দরিদ্র ও শাসিত অংশটির জন্য বরাদ্দ রেখে অধিপতি অংশটি প্রত্যাবর্তন করলেন ইংরেজি শিক্ষার পেলব আভিজাত্যের মাঝে। শিল্প-উৎপাদন বিমুখ শ্রম-বাজার নির্ভর জাতীয় অর্থনীতি ক্রমাগত মজুরি আর দোকানদারির অর্থনীতিতে পর্যবসিত হওয়ার ভিতও রচিত হয়ে গেল এর মধ্য দিয়েই। কারণ একটি উৎপাদন-মুখর জাতীয় অর্থনীতির পূর্বশর্তই হচ্ছে সেই জাতি বা জনগোষ্ঠীর শিল্প-বিজ্ঞান-প্রযুক্তিগত জ্ঞানের উৎকর্ষ সাধন। কিন্তু মাতৃভাষার বিকাশকে এড়িয়ে কোনো জাতির পক্ষেই সম্ভব নয় এই উৎকর্ষ সাধন করা। একটি বিজ্ঞান শেখা মানে সেই বিজ্ঞানের ভাষাটি শেখা। স্বভাবতই আমাদের বিজ্ঞান চর্চার মৌলিকত্বও বাধা পড়ে গেল মাতৃভাষায় বিজ্ঞান চর্চার কোনো কার্যকরী প্রেক্ষাপটের অভাবে। কাগুজে আইনে সর্বস্তরে মাতৃভাষার প্রচলনের যে বাধ্য-বাধকতা তার ফলাফল হিসেবে খোদ বাংলা ভাষারই বাক্য সঞ্জননী কাঠামোটিকে গ্রাস করে 'উদ্ভট চেহারা'র এক জাতীয় বাংলা ভাষার প্রচলন ঘটিয়ে ফেলা হলো। উদাহরণ হতে পারে সরকারি নথিতে প্রচলিত বাংলা ভাষাটি যেখানে উপনিবেশিক প্রশাসনিকতার বাংলা অনুবাদ ঘটাতে গিয়ে আমাদের আমলাতন্ত্র তার সনাতন প্রভুর ভাষা ইংরেজির মাপে কেটে ছেটে নিয়েছে বাংলা ভাষার বাক্য উপপত্তির স্বাভাবিক সূত্রাবলি।

শুধু আমলাতান্ত্রিক প্রশাসনিকতাই নয়, এই একই পরিস্থিতি জুড়ে বসলো বা রইল আমাদের এই জাতিরাষ্ট্রের প্রতিটি মৌল গাঠনিক উপাদান থেকে শুরু করে বিকাশের তাবৎ শর্তাবলির মধ্যেও। আমাদের সংবিধান, আইন-কানুন ও বিচারালয় যতটুকু বা যে মানের বাংলায় চলে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর ভাষার সাথে তার আদৌ কোনো যোগসূত্র নেই।[৮] এই যোগসূত্রহীনতার ফলে যোজক

---

[৮] শুধু 'বৃহত্তর গণ-মানুষ' কেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়েই পাঠদানরত এই প্রবন্ধের লেখকের কাছেও আইনি নথির ভাষা, যদি সেটি বাংলা হয়ে থাকে তবুও, দুর্বোধ্যই। অনুভূতিটি

হিসেবে আইনের ভাষ্যকার তথা আইনজীবীদের রুটি-রুজির সংস্থান হয় বটে, রাষ্ট্রের সাথে ব্যক্তির যোগাযোগ রয়ে যায় সেই যোজন দূরত্বেই। বিজ্ঞান-প্রযুক্তির প্রশ্নে আমরা পশ্চিমা দাতাদের 'প্রযুক্তি হস্তান্তরে'র মুখাপেক্ষী হয়ে থেকেছি, নিজেদের ভাষাকে বিজ্ঞান চর্চার উপযোগী করে তুলে নিজেদের আর্থ-সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ বিজ্ঞান চর্চার উদযোগ নেইনি। উত্তর উপনিবেশিক রাষ্ট্র হিসেবে সাম্রাজ্যিক ইতিহাসের বাঁধা ছকের বাইরে গিয়ে একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র হিসেবে বিকশিত হওয়ার অপার সম্ভাবনা নিয়ে জন্ম নিয়েও আমাদের জাতিরাষ্ট্রটি আজ স্মৃতিভ্রষ্ট মানুষের মতো পশ্চিমা সাম্রাজ্যিক সভ্যতার অধঃস্তনতার ঐতিহাসিক নিয়তিকেই মেনে নিয়েছে, প্রায় নিঃশব্দেই।

ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদের মানবিক আদ্যগুণ নিয়ে উদ্ভূত আমাদের এই জাতিরাষ্ট্রটির এই ঐতিহাসিক প্রতিসরণ যে কেবল রাষ্ট্রের গঠন ও বিকাশের প্রশ্নটিকেই উপেক্ষা করে গেছে তাই নয়, একটি ভাষা এবং একটি স্বাধীন ভূখণ্ডের মানবিক দাবিকে কেন্দ্র করে জন্ম নিলেও এই রাষ্ট্র তার ভূ-রাজনৈতিক সীমার ভেতর আর সব প্রান্তিক কিন্তু স্বতন্ত্র জাতিসত্তাকে এই ন্যূনতম মানবিক স্বীকৃতিটুকুও দেয়নি। এই রাষ্ট্রের ইতিহাসে নির্মমতম প্রহসন হচ্ছে এই, যে বাংলা ভাষার দাবিকে কেন্দ্র করে নিজেদের মানবিকতম পরিচয়টি গড়তে রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছিলো এই জনপদের মানুষেরা, সেই বাংলা ভাষাই আবার ধনতান্ত্রিক সভ্যতার তল্পিবাহক জাতীয় রাজনীতির ফেরে পড়ে দাপুটে চেহারা নিয়ে চড়াও হয়েছে মানচিত্রের প্রান্তিক জাতিগোষ্ঠীগুলোর ভাষার ওপরে। সাঁওতাল, উরাও, মুন্ডা, পাহাড়ী, পাহান, মণিপুরী, মান্দি, হাজং, বোম, ম্রু, চাকমা, তঞ্চঙ্গা, মারমা, ত্রিপুরা, চাক, পাংখুয়াসহ আর সব প্রান্তিক ভাষাগোষ্ঠী আজ এই জাতিরাষ্ট্রেরই রাজনৈতিক আয়োজনে বাংলা ভাষার আধিপত্যের সামনে মুখ থুবড়ে পড়ছে। বাংলাদেশ রাষ্ট্রকে ঘিরে পৃথিবীর মানচিত্রে একটি মানবিক রাষ্ট্রের অভ্যুদয়ের যে আকাঙ্ক্ষা ইতিহাসে ঝলকে উঠেছিলো সেই ইতিহাসের স্বপ্নভঙ্গের ইতিবৃত্তের এও এক অনেপনীয় দিক।

পাঠকদেরও ক্ষেত্রেও সার্বজনীন হওয়ার সম্ভবনাই বেশি যদি না এর মাঝে কেউ আইনেরই ভাষ্যকার না হোন।

'ভুবন গাঁয়ের ভাষা-যুদ্ধ'

'একুশে' যে কারণে মাতৃভাষার আন্তর্জাতিক স্মারক হলো

আমাদের জাতিরাষ্ট্রের ইতিহাস এর চেয়ে ভিন্ন কী হতে পারতো শুধু এই আফসোসই নয়, অন্য কোনো কারণেই ইতিহাসের চাকা উল্টা ঘোরেনা বলেই তা ইতিহাস। কাজেই আমাদের জাতিরাষ্ট্রের হতে পারত রূপটি নিয়ে যে কোনো প্রলম্বিত আহাজারিই এখন অর্থহীন। এই শতকে এসে বিশ্ব-ইতিহাসে জাতিরাষ্ট্র আর মানুষের জন্য অমোঘ কোনো প্রতিষ্ঠান নয়, বদলে গেছে/যাচ্ছে মানুষের যুথবদ্ধতার আধুনিকতম সূত্রাবলিও। বিশ্বমানবসভ্যতার দ্রুত ধাবমান ট্রেনটিতে আমাদের রাষ্ট্রটির মতো আর সমস্ত পেছনের বগিতে জাতিসত্তা-জাতিরাষ্ট্র ধারণারই পরিষ্কার কোনো ফয়সালা না হলেও, অগ্রণী জাতিগুলোর মধ্যে ভুবনগ্রাম, বিশ্বসমাজ, বিশ্বায়নের মতো ধারণাকে কেন্দ্র করে শুরু হয়ে গেছে অঘোষিত ছায়াযুদ্ধ। ধনতান্ত্রিক পণ্য-সভ্যতার হাত ধরেই হোক আর মানবিকতার সূত্রে গাঁথা বিশ্বমানবের আকাঙ্ক্ষাতেই হোক, জাতিরাষ্ট্রের সীমা ছাড়িয়ে মানুষ এখন ভুবনীকরণের আবর্তেই মুখোমুখি হচ্ছে নিজ পরিচয়ের। নিজ পরিচয়ের নির্মাণের ইতিহাসজুড়ে নিজেকে ঘিরে যত সহস্র প্রাচীরই মানুষ গড়ে থাকুক না কেনো, একার্ণবের এই যুগে এসে একে একে ধসে পড়ছে এর প্রায় সবগুলোই।

মানুষের সমাজ-সংস্কৃতি-ভাষার আদি উৎস নিয়ে মনোজেনেসিস আদিকল্পে যে একীভূত আদি মানব সমাজের দেখা মেলে, ইতিহাসের আবর্তে সেই সমাজই টুকরো টুকরো হয়ে গিয়ে ভূগোল জুড়ে মানুষের মানচিত্রকে অভূতপূর্ব বৈচিত্র্য এনে দিয়েছিলো বলে জানা যায়। আধুনিক সভ্যতার ছায়ায় জাতি রাষ্ট্রের ধারণা পেরিয়ে সেই সমাজ এখন অখণ্ড ও একাকার প্রবণ হয়ে উঠেছে। এই প্রবণতা, বিশ্বমানবের পরিচয়ে একাকার হয়ে যাওয়ার মানবিক তাড়নার ইতিহাস আসলে আরো অনেক পুরনো। প্রাক-আধুনিক যুগে ধর্মগুলোও চাইত সব মানুষকে একই পরিচয়ের নিয়ে আসতে। আধুনিক সভ্যতার অন্যতম রূপকার খ্রীস্ট ধর্ম চেয়েছিলো 'সুসমাচারে'র মধ্য দিয়ে তাবৎ মানব জাতিকে ঈশ্বরপুত্রের আশীর্বাদে সিক্ত করতে। ইসলাম ধর্মও চেয়েছিলো

স্বাধীনতা, সাম্য আর ক্ষমাশীলতার জমিনে, সৃষ্টিকর্তার অভিভাবকত্বে তাবৎ মানবজাতির ঐক্য প্রতিষ্ঠা করতে। একই বাসনা ছিলো বৈদিক ও বৌদ্ধ ধর্ম-দর্শনেও কিন্তু তারপরও ধর্মের পক্ষে সম্ভব হয়নি এই বিশ্বসমাজ গড়ে তোলা। ধর্মীয় আন্তর্জাতিকতা ব্যর্থ হওয়ার পর পাশ্চাত্যের সেকুলার দর্শন থেকে উৎসরিত হয় আধুনিক আন্তর্জাতিকতার ধারণা। কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকও সেই আধুনিকতারই সন্তান—আপাতত ব্যর্থতার মোহর পড়ে রয়েছে যার গায়েও। ফলে আধুনিক রাষ্ট্রের মতোই, ভুবনীকরণেরও অভিভাবকত্ব পেয়ে গেছে ধনতান্ত্রিক পশ্চিমের পণ্যবাহী সভ্যতা, যা মানুষ বলতে একটি অর্থনৈতিক জীব, সমাজ বলতে বাজার এবং উৎপাদন বলতে কেবল পণ্যই বোঝে।

এই অমানবিক ভুবনীকরণের বিরুদ্ধে বিশ্বের নানা প্রান্তেই মানবিক রাজনীতি রুখে দাঁড়ালেও ইতিহাসের ছক-মাফিকতা এই ভুবনীকরণের পক্ষেই থাকছে। গত শতকের শেষ দশকে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রীয় পুঁজিকে পেছনে ফেলে কর্পোরেট পুঁজির বৈশ্বিক বিস্তার টান দিয়েছে মানুষের পূর্বাপর সমস্ত সাংস্কৃতিক শেকড় ধরে। এই প্রতিযোগিতামূলক দৃশ্যমান বা অদৃশ্য সব যুদ্ধের মধ্যে সবচেয়ে নির্মম লড়াইটি চলছে ভাষা নিয়ে। যেহেতু জাতি মাত্রেরই সমস্ত অর্জিত সম্পদের আদি ও প্রধানতম কোষাগার হচ্ছে তার ভাষা, ভাষা চলে গেলে তো তার কীর্তি, সংস্কৃতি, জ্ঞান-প্রজ্ঞা-দর্শন সবই চলে যাবে। কোনো জাতির ভাষাকে মেরে ফেললে পরে সেই ভাষাহীন জাতিটিকে আর না মারলেও চলে। নতুন অধিপতি সভ্যতায় সে তখন অনায়াসেই বিলীন হয়ে যায়। কাজেই, বিমানবিক ভুবনীকরণের যুগে মানবিক অস্তিত্ব রক্ষার যত রকম সংগ্রাম চলছে তার মধ্যে ভাষার লড়াইটিই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, সর্বাপেক্ষা সিদ্ধান্তমূলক।

কিন্তু ভাষাবিজ্ঞানীদের বরাতে এই লড়াইয়ের যে সংবাদ মিলছে তা রীতিমতো লোমহর্ষক এবং এক অশনি সংকেতই বটে। তারা জানাচ্ছেন আগামী শতাব্দীতেই মানুষের মাঝে প্রচলিত কমপক্ষে ৫০০০ ভাষার মধ্যে শতকরা ৯০টি অর্থাৎ কমপক্ষে ৪৫০০ ভাষাই

বিলুপ্ত হয়ে যাবে। ইতিমধ্যেই সারা পৃথিবীতে বহু ভাষাই বিলুপ্ত হয়ে গেছে, ভাষাভাষীর সংখ্যা ১০ হাজারেরও কম এরকম বিলুপ্ত-প্রায় ভাষার তালিকাটিও আশঙ্কাজনকভাবে দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়ে চলেছে। আগামী ৫০ বছরের মধ্যেই পৃথিবীতে জীবিত ভাষার সংখ্যা কমে অর্ধেকে দাঁড়াবে বলে পূর্বাভাস দিচ্ছেন ভাষাবিদরা। পৃথিবীর জনসংখ্যা ৬০০ কোটি ধরলে এর মধ্যে ৫৭০ কোটি জনসংখ্যাই কথা বলে একশটিরও কম ভাষায়। ভাষাযুদ্ধের এই চিত্র ভূ-ভাগের এই অংশেও কম ভীতিকর নয়। অবিভক্ত ভারতে প্রচলিত ১৫০০ ভাষার মধ্যে ৪৩৩টি ভাষারই নাম উঠে গেছে বিপন্ন ভাষার তালিকায়।[১] এর মধ্যে বোন্দা, গোরাম, লাই, গাতা প্রভৃতি ভাষা আর কখনই উচ্চারিত হবে না মানবিক ইথারে। আন্দামানি ভাষার বক্তাসংখ্যা এখন পাঁচজন এবং খামি ও লুঞ্জুল ভাষার বক্তাসংখ্যা একজনমাত্র মানুষ যাদের মৃত্যুর সাথে সাথে পৃথিবী থেকে মিলিয়ে যাবে একটি মানবগোষ্ঠীর তাবৎ সাংস্কৃতিক অর্জন, আমাদের কখনই জানা হবে না ভবিষ্যৎ বিশ্বসমাজে যোগ করবার মতো কী অমূল্য ধনই হয়তো ছিলো এই সব সংস্কৃতির কোষাগারে।

পণ্য সভ্যতা পরিবাহিত বাজার সংস্কৃতি কোনো ভাষা তথা জাতিসত্তার টিকে থাকবার প্রশ্নে নির্মম কিছু শর্ত নির্ধারণ করে দিয়েছে। পণ্যের দেহ অলংকৃত করে মুনাফা নিয়ে আসবার দাপট নিয়ে বিশ্ববাজারের 'মাস্তান-ভাষা'গুলোর (যেমন ইংরেজি, ফরাসী, স্প্যানিশ, জার্মান, রুশ, চীনা, জাপানি প্রভৃতি) সমকক্ষ হয়ে না উঠতে পারলেই যেন কোনো ভাষারই আর অস্তিত্ববান থাকবার অধিকার নেই। বেঁচে থাকতে হলে সব ভাষাকেই হয়ে উঠতে হবে তাদের মতো সর্বগামী ও সর্বজনগ্রাহ্য, হয়ে উঠতে হবে কম্পিউটার, কমোডিটি আর কনজুমার ফ্রেন্ডলি। বিশ্ববাজারে তাদের সমকক্ষ হয়ে উঠবার মুরোদ না হলেও ঘরের ভেতরে বাংলা ভাষাও বাদবাকি প্রান্তিক ভাষাগুলোর ওপর চড়াও হয়েছে একই

---

১ ভাষাযুদ্ধের এই 'বডি-কাউন্ট' বিবরণটির জন্য দেখুন:
কলিম খান ২০০১, *পরমা ভাষার সংকেত: ক্রিয়াভিত্তিক শব্দার্থবিধি ও ভাষাতত্ত্বের নতুন দিগন্ত*, প্যাপিরাস, ঢাকা।

রুস্তমি-চালে। একটি রাষ্ট্রের জন্মস্মৃতি বিস্মরণের এরচেয়ে বড় নজির আর কী হতে পারে?

আধুনিকতার আয়োজনে মানবিক ভুবনীকরণের সবচেয়ে বড় পদক্ষেপ হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিলো জাতিসংঘ। তারই অঙ্গ-প্রতিষ্ঠান ইউনেস্কো একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের মর্যাদা দিয়েছে সম্প্রতি। ভাষাযুদ্ধের নির্মম পটভূমিতে যখন মাতৃভাষার অগ্নিহুতি ঘটছে অবিরাম, তখন আমাদের 'একুশে' হয়ে উঠেছে মাতৃভাষার আন্তর্জাতিক স্মারক। নিছক প্রচলিত জাতীয়তাবাদী উচ্ছ্বাসে উদযাপনের মধ্যেই একুশের এই নব-মাহত্মকে বেঁধে রাখাটা হবে ১৯৫২ সালের একুশের সাথে আমাদের চেতনাগত ছেদেরই পুনরাবৃত্তি। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে 'একুশে'র অভিষেক আদতে সাম্রাজ্যিক বিশ্বায়নের বিরুদ্ধে লড়াইরত মানবিক রাজনীতিকে একটি শক্ত পাটাতন তৈরী করে দিয়েছে, শাণিত করেছে এই চেতনাকে যে ভাষা ও জাতিসত্তার অস্তিত্ব রক্ষার অধিকার সকল মানব গোষ্ঠীরই আছে। জাতিত্ববোধের ইতিহাসে একুশকে ঘিরে আমাদের অনুধাবন যাই হোক না কেনো, আন্তর্জাতিকতায় অভিষিক্ত হওয়ার পরে, একুশের উত্তরাধিকারী জাতিটিরই সবচেয়ে বেশি দায়িত্ব বর্তায় নিজের জাতিরাষ্ট্রের পরিসরে তাবৎ সাংস্কৃতিক জাতিসত্তার ভাষা ও জাতিসত্তাগত স্বীকৃতি নিশ্চিত করবার। একুশের চেতনার এমনতর উপলব্ধি উপযোগবাদীতা হলেও ক্ষতি কিছু নেই, কারণ ভুবনগাঁয়ের বিশ্বমানবের আবির্ভাবের লক্ষ্যে যে মানবিক রাজনীতি, তাকে সমর্থন যোগানোটা এই উপলব্ধির ঈপ্সিত উপযোগই বটে।

২০ ফেব্রুয়ারি ২০০৬
তালাইমারি, রাজশাহী।

ভাষা, সংস্কৃতি ও মানবসত্তা
একটি নৃবৈজ্ঞানিক আলাপচারিতা

গৌরচন্দ্রিকা

সত্যা জেমতো মাসিকে তলে বাহাসিন্দরি উপরে ধর্মদেবতা
বাবুরে আইঙ ডাগাতাইঞ্জো সামুইসেরে।
বেগাবেগি মোরনে ঠাররে।

[তলে বসুন্ধরা, উপরে ধর্মদেবতা, তোমরা যেমন সত্য
(তোমাদের দোহাই দিয়া বলিতেছি)
বাবুকে আমাদের ভাষা দান কর।
শীঘ্র (আমাদের) ঠার (তাঁহার নিকটে) আনিয়া দাও।]

নৃবিজ্ঞান মানুষের সমাজ ও সংস্কৃতির সক্রিয় ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে, তার প্রকৃতি ও প্রজাতিজনিত কলাক্রিয়ার সাথে সম্পর্কিত করে, মানবসত্তার স্বরূপ অন্বেষণ ও উন্মোচনের বিজ্ঞান। নৃবিজ্ঞানের ইতিহাসে বরাবরই রেওয়াজ ছিলো মানুষের প্রকৃতিঘনিষ্ঠ সত্তাকে বুঝবার তাগিদে, আদি মানব-প্রকৃতিকে জানবার তাগিদে, সভ্যতাপূর্ব আদি সমাজগুলোতে ফিরে যাওয়ার। ধ্রুপদী যুগের নৃবিজ্ঞান একারণেই বারবার ফিরে ফিরে প্রাক-আধুনিক সমাজগুলোকেই নিজেদের অধ্যয়নের উপজীব্য করেছে। ব্যতিক্রম নন ভূ-ভারতের প্রথম বাংলাভাষী নৃবিজ্ঞানী

নির্মল কুমার বসুও। ভারতের 'হিন্দু সমাজের গড়ন'[১] বুঝতে গিয়ে চৈতন্য চরিত্রামৃতে বর্ণিত পথ ধরে তিনি ফিরে গিয়েছিলেন হিন্দু সমাজের প্রতিরূপ অবৈদিক প্রাকৃত সমাজগুলোর কাছে। মহাপ্রভু শ্রী চৈতন্য একবার ছত্রভোগের 'প্রসিদ্ধ পথ' ছেড়ে উড়িষ্যার পশ্চিম দিকে যে পর্বত এবং বনাকীর্ণ প্রদেশ আছে, সেই 'উপপথে'ই কাশিধাম যাওয়ার জন্য রওনা করেছিলেন। মথুরা যাওয়ার সেই উপপথেই তিনি মুখোমুখি হন অজস্র প্রাকৃত সমাজের যারা তখনও হিন্দু সমাজের পরিবৃত্তের বাইরে ছিলো। সেই প্রাকৃত মানুষদের বিবরণও লিপিবদ্ধ হয়েছে কৃষ্ণদাস গোস্বামী বিরচিত শ্রী শ্রী চৈতন্য-চরিতামৃতে। ভারতের বৈদিক সভ্যতার বাইরের প্রাকৃত সমাজের প্রথম প্রত্যক্ষলব্ধ অভিজ্ঞতা বর্ণনা করবার কারণে চৈতন্য-চরিতামৃতই বাংলাভাষায় রচিত প্রথম নৃবৈজ্ঞানিক আকরিকও বটে। মহাপ্রভুর সেই যাত্রাপথে দেখা ঝাড়খণ্ডের আদিবাসীদের প্রত্যক্ষ বয়ানের একাংশে কৃষ্ণদাস লিখছেন—

> মথুরা যাবার ছলে আসি ঝাড়িখন্ড।
> ভিল্লপ্রায় লোক তাঁহা পরম পাষন্ড।।
> নামপ্রেম দিয়া কৈল সবার নিস্তার।
> চৈতন্যের গুঢ়লীলা বুঝে শক্তি কার।।

ভারতের হিন্দু সমাজের গড়নের গুঢ়লীলা বুঝবার তাগিদে ১৯২৮ সালে, শ্রী চৈতন্যের প্রায় চার'শ বছর পরে, নির্মল বসু ফিরে গিয়েছিলেন এই 'ভিল্লপ্রায়' 'পরম পাষণ্ড' বা 'আরণ্য' জাতিগুলোর একটি, জুয়াঙ্গাদের মাঝে। মধ্যভারতের সেকালের পাল লহড়া রাজ্যের কন্টলা নামের এক গ্রামের জুয়াঙ্গা ও শবরদের মাঝে তিনি কয়েক সপ্তাহ ছিলেন। আরো অনেক নৃবিজ্ঞানীদের মতন তিনিও প্রথমে মুখোমুখি হয়েছিলেন আদিবাসীদের সন্দেহ আর অবিশ্বাসের। বন বিভাগের লোক সন্দেহে জুয়াঙ্গারা তার কাছে ভিড়ছিলেন না। মহাপ্রভু যেমন তার যাত্রাপথে সমস্ত জাতির

---

[১] নির্মল কুমার বসু ১৯৪৯, *হিন্দু সমাজের গড়ন*, লোকশিক্ষা গ্রন্থমালা, বিশ্বভারতী গ্রন্থণ বিভাগ, কলিকাতা।

গ্রাম দেবতাকে পুজা দিতেন, সেই উপায় ধরেই নির্মল বাবুও কন্টলার গ্রাম-দেবতার জন্য পুজার আয়োজন করলেন। দুইটা মোরগ বলি দিয়ে গ্রামবাসীদের পেট পুরে খাওয়ানোর পরে, গ্রামবাসীরা তাকে 'বন্ধুভাবে' গ্রহণ করবার পরে, তিনি নিজের নৃবৈজ্ঞানিক উদ্দেশ্য খুলে বলেছিলেন তাঁদের। নির্মল বসু যদিও লেখেননি জুয়াঙ্গাদের তিনি নিজের অভীষ্ট কাজ সম্পর্কে ঠিক কী বলেছিলেন, কিন্তু সেই পুজা পরবর্তী পানাহার শেষে 'বাবু'র উদ্দেশ্য সাধনের জন্য গ্রাম দেবতা বুড়ামবুঢ়ী আর বুড়ামবুঢ়ার কাছে জুয়াঙ্গোরা প্রার্থনা করলেন : 'বাবুকে আমাদের ভাষা দান কর', 'শীঘ্রই আমাদের ঠার তাহার নিকট আনিয়া দাও'।

নির্মল বসু খেয়াল করছেন যে খুব সহজ সরল ভাষায় জুয়াঙ্গোরা তাঁদের গ্রামদেবতাকে নিজের প্রয়োজনের কথা জানিয়ে পুজা দেয়। নৃবিজ্ঞানীর প্রয়োজন কী, কীভাবে তার উদ্দেশ্য সাধন হতে পারে, সে বিষয়ে জুয়াঙ্গারা ঠিক কী বুঝেছিলেন তা আমাদের জানবার উপায় নেই। কিন্তু সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নিজেদের ভাষা, সেই ভাষার ঠার (ইশারা-ইঙ্গিত), তারা বাবুর জন্য জরুরি মনে করেছেন। মন্ত্রতন্ত্রের বালাই না থাকলেও তাঁদের এই প্রার্থনা কিন্তু নৃবিজ্ঞানীর জন্য একদম মোক্ষম এক প্রার্থনা। নৃবিজ্ঞান নামের শাস্ত্রটির ইতিহাস বলে যে ভাষার পথ ছাড়া তার স্বীয় উদ্দেশ্য সাধনের, মানুষের প্রকৃতি ও প্রজাতিজনিত কলাক্রিয়ার মধ্য দিয়ে মানবসত্তার স্বরূপ উম্মোচনের আর কোনো পথ নেই। কারণ শেষ বিচারে ভাষাই মানবীয়তা, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মানুষ আসলে ভাষারই সৃষ্টি। ভাষাই সেই আদ্যগুণ যা মানুষকে প্রকৃতি জগতের মাঝে অনন্য এক প্রজাতি করে তোলে। সংস্কৃতির প্রথম সূত্র আর সূতিকাগারও ভাষাই। কাজেই নির্মল বাবু বর্ণিত জুয়াঙ্গাদের সেই প্রার্থনাকে প্রণতি জানিয়ে বক্ষ্যমান রচনায় আমি নৃবিজ্ঞানের আলাপচারিতার পরিসরে ভাষার প্রশ্নটিকে সংস্কৃতি আর মানবসত্তার সাথে সম্পর্কিত করে দেখতে চাই। এই আলোচনা নৃবিজ্ঞানে একটা বুনিয়াদি বিষয় হলেও এর বিস্তারটা সুবিশাল ও জটিল, প্রভাবও সুদূরপ্রসারি। এই আলোচনা আসলে নৃবিজ্ঞানের

আদি পাটাতন। এর ওপর ভর করে নৃবিজ্ঞানে বহু পথ আরো বহু দিকে হেঁটে গেছে। প্রবন্ধের পরিসরে সেই পরিভ্রমণের পুরো পরিধিটাকে হাজির করা যায় না। এই প্রবন্ধ শেষ হয়েছে ভাষা নিয়ে নৃবৈজ্ঞানিক আলাপচারিতার সূচনাবিন্দুতেই। চরিত্রেও প্রবন্ধটি অসম্পূর্ণ ও খণ্ডিত। এই খণ্ডিত আলাপচারিতা ভাষা নিয়ে ভাবিতদের এনিয়ে নৃবিজ্ঞানের পথ-পরিক্রমার সামান্য আভাস দিতে পারলেও নিজেকে স্বার্থক মনে করবে।

ভাষা ও নৃবিজ্ঞান : আন্তঃশাস্ত্রীয় পরম্পরা

অদ্যাবধি ভাষা সম্পর্কে আমাদের যে অভিজ্ঞান, সেখানে শাস্ত্র হিসেবে নৃবিজ্ঞানের একটা তাৎপর্যময় অংশীদারিত্ব আছে। আধুনিক ভাষাতত্ত্বের বিকাশে নৃবিজ্ঞান চর্চার একটা বড়ো ভূমিকা আছে। এই ভূমিকা পালন করতে গিয়ে নৃবিজ্ঞানের একটি অনিবার্য শাখা হিসেবে বিকশিত হয়েছে ভাষা-নৃবিজ্ঞান। নৃবিজ্ঞানের মার্কিনী ধারায় যে চারটি প্রধান শাখাকে চিহ্নিত করা হয়, সেখানে জৈবিক, সাংস্কৃতিক, প্রত্নতাত্ত্বিক নৃবিজ্ঞানের সাথে ভাষা-নৃবিজ্ঞানও একটি স্বতন্ত্র শাখা হিসেবে স্বীকৃত। শাস্ত্র হিসেবে বিকশিত হওয়ার পুরো ইতিহাসেই ভাষার নিবিষ্ট পাঠ নৃবিজ্ঞান চর্চার অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে থেকেছে। আলাদা শাস্ত্র হিসেবে ভাষাবিদ্যার সাথেও নৃবিজ্ঞানের খুব নিকটাত্মীয়তার সম্পর্ক। দেখা গেছে নৃবিজ্ঞান কখনো ভাষাতত্ত্বের তাত্ত্বিক আদিকল্পগুলোকে পাল্টে দিচ্ছে, আবার নিজের তাত্ত্বিক সংকটের ঐতিহাসিক ক্ষণগুলোতে নৃবিজ্ঞান শাস্ত্র হিসেবে নতুন শক্তি অর্জন করছে ভাষাবিদ্যার কাছ থেকে। ফলে মানুষের ভাষার অধ্যয়ন যেমন নৃবিজ্ঞানের একটা গুরুতর পরিসর, তেমনি ভাষাবিদ্যার পরিসরেও নৃবিজ্ঞানীদের তাৎপর্যময় পদচারণা রয়েছে। ভাষাবিদ্যা আর নৃবিজ্ঞান, এই দুই শাস্ত্রের সম্পর্কের ইতিহাস খুব জটিল। নৃবিজ্ঞানের চর্চায় ভাষা, মানবসত্তা আর সংস্কৃতির সম্পর্কসূত্র বুঝবার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক বিকাশের ধারায় নৃবিজ্ঞান কীভাবে ভাষাবিদ্যার সাথে ভাষার অধ্যয়নে পাল্লা দিয়েছে, সেটা খোলাসা করা প্রয়োজন। তবে মনে রাখা ভালো যে, এই সমস্ত শাস্ত্র প্রাচীর, যেমন নৃবিজ্ঞান বনাম ভাষাবিজ্ঞান,

এগুলো প্রাতিষ্ঠানিকতার প্রয়োজনে মেনে চলা হলেও প্রাচীরগুলোর জ্ঞানগত ভিত্তি প্রায় নেই বললেই চলে। এইসব শাস্ত্রীয় সীমানা আসলে লঙ্ঘনের মধ্য দিয়েই সব সময় নির্ধারিত হয়। কাজেই কোনটা নৃবিজ্ঞান বা ঠিক কোনটাকে আমরা ভাষাবিজ্ঞান বলবো সেই তর্কে শক্তিক্ষয় করা অপব্যয় হয়ে যাবে।

আজকের সময়ে চর্চিত আরো অনেক সমাজ বা মানববিদ্যার মতোই নৃবিজ্ঞানেরও প্রাতিষ্ঠানিক বিকাশ আসলে ইউরোপীয় উপনিবেশিকতার কোলে। পঞ্চদশ শতক থেকে ইউরোপীয় দেশগুলোর অভিযাত্রীরা একের পর এক 'আবিষ্কার' করতে থাকে নতুন নতুন দেশ, আবিষ্কৃত হতে থাকে নতুন নতুন সমুদ্র পথ। দুই আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, আফ্রিকার পাশাপাশি নতুন করে সমুদ্রপথ আবিষ্কৃত হয় ভারতে আসবারও। নৌ শক্তিতে বলিয়ান ইউরোপের উপনিবেশিকরা এই সময়কালে মুখোমুখি হতে থাকেন তাদের নতুন আবিষ্কৃত ভূ-ভাগগুলোর মানুষদের সমাজ ও সংস্কৃতির। উপনিবেশের বিস্তার ও বিকাশ তখন পশ্চিমে একটা জ্ঞান জাগতিক প্রয়োজন তৈরী করতে থাকে এই সমাজগুলোকে জানবার। একদিকে ইউরোপের শিল্প-বিপ্লবের হাত ধরে জন্ম নেওয়া উপনিবেশের গর্ভে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার ভ্রূণকে নতুন বাজার তৈরির মাধ্যমে বিকশিত করা, অন্যদিকে আফ্রিকা, ভারত, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়ায় সেই লক্ষ্যে রাজনৈতিকভাবে উপনিবেশিক শাসন পোক্ত করবার প্রশাসনিক প্রয়োজনেই এই সমাজগুলোর গতি-প্রকৃতি বুঝবার প্রয়োজন দেখা দেয়। উপনিবেশিক ক্ষমতাতন্ত্র বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এই অ-ইউরোপীয় সমাজগুলোর রাজনৈতিক বিন্যাসকে অটুট রেখেই, এই রাজনৈতিক কাঠামোগুলোকে অঙ্গীভূত করেই উপনিবেশিক শাসন জারি রাখবার চেষ্টা করে। ফলে প্রয়োজন পড়ে এই সমাজগুলোর প্রথাগত রাজনৈতিক কাঠামোকে সবিস্তারে বোঝা। ক্রমাগত দেখা যায় যে, শুধু রাজনৈতিক ব্যবস্থার অধ্যয়ন নয়, রাজনৈতিক ব্যবস্থার অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটকে বিশ্লেষণ না করে, সমাজগুলোর পূর্ণাঙ্গ অধ্যয়ন না করে, তাদের জন্য উপযোগী

শাসনকৌশল নির্ধারণ করা যায় না। ফলে রাজনৈতিক কাঠামোর পাশাপাশি অর্থনীতি, সমাজ, সংস্কৃতির নিবিষ্ট পাঠেরও প্রয়োজন পড়ে যায়। এই ঐতিহাসিক প্রয়োজন মেটাতেই মূলত আবির্ভাব ঘটে নৃবিজ্ঞান বলে একটা নতুন জ্ঞানকাণ্ডের।

ফলে ইউরোপে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে নৃবিজ্ঞান চর্চা, মানে নৃবিজ্ঞান একটা পেশায় পরিণত হওয়া, মোটাদাগে শুরু হয় উনবিংশ শতকের শেষ ভাগে, মূলত ব্রিটেন ও ফ্রান্সে। কিন্তু শেষ বিচারে মানব প্রকৃতির অধ্যয়ন হওয়ার কারণে এই বিজ্ঞানটি জ্ঞান-জাগতিক উত্তরাধিকার দাবি করে বসে আরো অনেক সুদুর অতীত পর্যন্ত। বলা হয়ে থাকে খ্রীস্টপূর্ব পঞ্চম শতকের গ্রিক ইতিহাসবিদ হেরোডোটাসের রচনায় ইতিহাস ব্যাখ্যার যে সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গি পাওয়া যায় সেটাই নৃবিজ্ঞানের আদিতম শাস্ত্রীয় আকরিক। সেখান থেকে শুরু করে নৃবিজ্ঞানের পাঠ পদ্ধতির আভাস পাওয়া যায় খ্রীস্টীয় প্রথম শতকের রোমান ইতিহাসবিদ টেসিটাসের রচনাতেও। রোমান সাম্রাজ্যের প্রান্তসীমায় বসবাসকারী জার্মান কৌম সমাজগুলোর প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য ছিলো টেসিটাসের রচনার উপজীব্য।[২] সেই সমাজগুলোর রাজনৈতিক বিন্যাসের যে বিশদ বর্ণনা টেসিটাস লিখেছিলেন সেটাই পরবর্তী সময়ে আমরা নৃবিজ্ঞানে আরো বিকশিত রূপে দেখতে পাই এথনোগ্রাফি বা জাতিতাত্ত্বিক বর্ণনা হিসেবে। ফলত, নৃবিজ্ঞানের চর্চা বলতে প্রাথমিকভাবে দাঁড়িয়ে যায় কোনো জনগোষ্ঠীর জীবন নিয়ে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা, যাকে নৃবিজ্ঞান আজকে বলে 'অংশীদারি পর্যবেক্ষণ' বা পার্টিসিপেন্ট অবজার্ভেশন, তার ভিত্তিতে সমাজ ও সংস্কৃতি সম্পর্কিত জ্ঞান উৎপাদন। বলাই বাহুল্য যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগ পর্যন্ত নৃবিজ্ঞানের পর্যবেক্ষিত বা অধীত সমাজ বলতে বোঝাতো অপাশ্চাত্য সমাজ। আরো সুস্পষ্ট করে বলতে গেলে ঔপনিবেশিত বা উপনিবেশিত হওয়ার অপেক্ষায় থাকা সমাজগুলো।

---

২ Layton, Robert 1997, *An Introduction to Theories in Anthropology*, Cambridge University Press Ltd., Cambridge.

উপনিবেশিক নৃবিজ্ঞানের শুরুতে নৃবিজ্ঞান অনেক বেশি মনোযোগী ছিলো সমাজ বা সংস্কৃতি নিয়ে নয়, পৃথিবীর নানা প্রান্তের মানুষের জৈবিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে। সে সময় মানুষের জৈবিক বৈশিষ্ট্যের তুলনামূলক বৈজ্ঞানিক পাঠই ছিলো নৃবিজ্ঞানের প্রধানতম দিক। কিন্তু ক্রমান্বয়ে জৈবিক বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে মানুষের শ্রেণিকরণ অবৈজ্ঞানিক ও বর্ণবাদী হিসেবে অভিযুক্ত হতে থাকা, এবং খানিকটা এইসব জ্ঞান প্রশাসনিক উপযোগহীন হওয়ার কারণে জৈবিক নৃবিজ্ঞানের চর্চা অনেকটুকুই ঝিমিয়ে পড়ে। সেই জায়গায় ক্রমাগত জায়গা করে নিতে থাকে সমাজ ও সংস্কৃতির অধ্যয়ন, যা ইউরোপে সামাজিক নৃবিজ্ঞান আর আমেরিকায় সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞান নামে বিকশিত হয়। সমাজ ও সংস্কৃতি নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে বিষয়বস্তু নিয়ে নৃবিজ্ঞানকে শুধু ভাষাবিজ্ঞান নয়, বোঝাপড়া করতে হয়েছে আরো অনেক বিজ্ঞান, যেমন সমাজবিদ্যা, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, অর্থশাস্ত্র, ধর্মতত্ত্বসহ আরো অনেক মানববিদ্যার সাথে। দেখা গেল যে, নৃবিজ্ঞান যা নিয়ে কথা বলতে চায়, ভাবতে চায়, সেইসব বিষয় নিয়ে এই বিজ্ঞানগুলোরও চিন্তা-ভাবনার দীর্ঘ ইতিহাস আছে, ঐতিহ্য আছে। তাহলে নৃবিজ্ঞানের প্রয়োজন কী? তার বিশেষত্ব কী? শুরুর দিকে বলা হতো, এই বিজ্ঞানটি সামগ্রিক দিক থেকে (অপাশ্চাত্য/আদিম) সমাজের অধ্যয়ন। ফলে 'অংশীদারী পর্যবেক্ষণে'র পাশাপাশি নৃবিজ্ঞানের আরেকটি স্বকীয় বৈশিষ্ট্য হিসেবে তুলে ধরা হয় এই বিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গির সামগ্রিকতাকে। মানে হচ্ছে, অন্য বিজ্ঞানগুলো যেমন কেবল রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজ, সংস্কৃতি বা ভাষার কোনো একটিতে নিবন্ধ থাকে সেখানে নৃবিজ্ঞান সমাজকে বিচার করে এই সবকিছুর একটা সামগ্রিকতা নিয়ে। ফলত; আজকের যুগে এসেও অনেক নৃবিজ্ঞানীই মনে করেন যে অংশীদারিত্ব আর সামগ্রিকতাই নৃবিজ্ঞানকে অন্য মানব বা সমাজবিদ্যাগুলো থেকে আলাদা করে। এই সামগ্রিকতার কারণেই নৃবিজ্ঞানের অদ্যাবধি সার্বজনীন ও সর্বসম্মত কোনো সংজ্ঞা বা পরিধি নাই। মানবিক ক্রিয়াকলাপের এমন কোনো বিষয় নেই যা নৃবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু হতে পারে না। সে কারণেই নৃবিজ্ঞানের

সংজ্ঞা নির্ধারণে সমাজ ও সংস্কৃতির পরিবর্তে নিয়ে আসা হয় খোদ মানবীয়তার ধারণাকে। বলা হয়ে থাকে মানুষের সমাজ ও সংস্কৃতির তুলনামূলক বিশ্লেষণের মাধ্যমে মানবসত্তার স্বরূপ উন্মোচন করাটাই হচ্ছে নৃবিজ্ঞানের কাজ। এই কাজটি নৃবিজ্ঞান সাধারণত করে থাকে মানুষের প্রকৃতি ও প্রজাতিজনিত কলাক্রিয়ার সাথে সম্পর্কিত করে। মানুষের প্রজাতি ও প্রকৃতিজনিত কলাক্রিয়ার বিশ্লেষণ করে মানবীয়তার সংজ্ঞা প্রতিনিয়ত বিনির্মাণ করাটাই নৃবিজ্ঞানের মৌলিক আদিকল্প, মৌলিক দার্শনিক তাড়না।

ভাষা ও মানবসত্তা : নৃবিজ্ঞানের আদিকাণ্ড

মানবসত্তার বৈজ্ঞানিক অনুধাবনকে কর্তব্য হিসেবে নির্ধারণের মধ্য দিয়ে নৃবিজ্ঞান যুক্ত হয় আধুনিক বিজ্ঞানের একটা কেন্দ্রীয় দার্শনিক তাড়নার সাথে। এই আদিকল্প তখন নৃবিজ্ঞানের জ্ঞান-জাগতিক উত্তরাধিকারকে পশ্চিমের দার্শনিক ঐতিহ্যের সাথে যুক্ত করে। এই পর্যায়ে এসে নৃবিজ্ঞান হেরোডোটাস বা টেসিটাসের সাংস্কৃতিক ইতিহাসবিদ্যার ঐতিহ্য ছাড়িয়ে উত্তরাধিকার নেয় ইউরোপের সন্দীপণপর্ব বা এনলাইটেনমেন্ট উৎসারিত দার্শনিক ঐতিহ্যের। রেনে দেকার্তের সপ্রশ্ন আত্মানুভ্রমণ থেকে শুরু করে জন লক, থমাস হবস, জাঁ জ্যাক রুশো, ইমানুয়েল কান্ট, ডব্লিউ জি হেগেল, এবং সর্বশেষ কার্ল মার্কসের দর্শন পর্যন্ত নৃবিজ্ঞানের শাস্ত্রীয় আদিকল্পের ভিত্তি হয়ে উঠে। মানবসত্তার দার্শনিক উন্মোচনের পাশাপাশি সমাজ ও সংস্কৃতি নিয়ে মৌলিক কিছু প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে ব্রতী হয় নৃবিজ্ঞান। সমাজ ব্যবস্থার ধারণাকে কেন্দ্রীয় বিষয় করে নিয়ে ভাববার চেষ্টা করা হয় যে, ঠিক কোন কারণে মানুষ সমাজবদ্ধ হয়ে থাকে এবং এই সামাজিক যুথবদ্ধতার মৌলিক সূত্র কী? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে নৃবিজ্ঞান একাধারে মুখোমুখি হয় অ্যাডাম স্মিথের অর্থনৈতিক মিথষ্ক্রিয়া তত্ত্বের, অন্য দিকে অগাস্ট কোঁতের জৈব সমাজের ধ্যান-ধারণার। এই ধারাবাহিকতাতেই নৃবিজ্ঞানে ক্রমশ প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেন কার্ল মার্কস, বিশেষত তাঁর অপাশ্চাত্য সমাজ নিয়ে আলোচনার সূত্র ধরে। পাশাপাশি নৃবিজ্ঞানের পুরো আদিকল্পকে মৌলিকভাবে পালটে দেয় ডারউইনের বিবর্তনবাদী

ধ্যানধারণা। ফলে নৃবিজ্ঞান সমাজকে শুধু সমসাময়িক বাস্তবতার নিরিখেই না, সময়ের আবর্তে তার পরিবর্তনের সূত্র ধরেই ব্যাখ্যা করা শুরু করে। সমাজ ও সংস্কৃতির ঐতিহাসিক নির্মাণকেও ব্যাখ্যা করবার দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেয়।

এই সমস্ত দার্শনিক ও তাত্ত্বিক পাটাতনের ওপর ভিত্তি করেই শুরু হয় আধুনিক নৃবিজ্ঞানের যাত্রা। কিন্তু শুরুতে যেমনটা বলেছি, প্রাতিষ্ঠানিকভাবে নৃবিজ্ঞান চর্চার শুরু হয় উপনিবেশিক পৃষ্ঠপোষকতায়, উপনিবেশিক প্রশাসনিকতার প্রয়োজনেই। ফলে প্রাতিষ্ঠানিক নৃবিজ্ঞানের গোড়ার দিকের মাঠ হয়ে উঠে উপনিবেশিক জগৎ, মানে আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া, আমেরিকাসহ উপনিবেশিক পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চলগুলো। এই প্রশাসনিক চাহিদা পূরণ করবার ছাপ পড়ে নৃবিজ্ঞানের তাত্ত্বিক গড়নে। পদ্ধতি হিসেবে তখন নৃবিজ্ঞানে জনপ্রিয় হয়ে উঠে ব্রিটিশ নৃবিজ্ঞানের ক্রিয়াবাদী ধারা যা পূর্বাপর বিবর্তনবাদী ধারার বাইরে এসে উপনিবেশিক সমাজের সংস্কৃতিকে ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা করে সংস্কৃতির উপাদানগুলোর প্রায়োগিক ক্রিয়াশীলতা নিয়ে। অর্থাৎ সমাজগুলোর চর্চিত সাংস্কৃতিক আচরণ, আচার-অনুষ্ঠান বা প্রথা সেই সমাজগুলোর ঠিক কোন চাহিদা পূরণ করে সেই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া এবং এই উপাদানগুলোর বিশদ বর্ণনা একটা কথিত নিরপেক্ষতা, অংশীদারী অভিজ্ঞতা আর সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে লেখাটাই হয়ে ওঠে নৃবিজ্ঞানের কাজ। নৃবিজ্ঞানের সাথে শাস্ত্র হিসেবে ভাষাবিদ্যার যোগসূত্র ঘটে এই সময়েই, এই উপনিবেশিক মাঠেই।

নৃবিজ্ঞানীরা যেমন ইউরোপের দৃষ্টিতে নতুন পৃথিবী, মানে অস্ট্রেলিয়া বা আমেরিকার মতন উপনিবেশগুলোতে সমাজ ও সংস্কৃতি বোঝার চেষ্টায় নিয়োজিত ছিলো, তেমনি ইউরোপের ভাষাবিদরাও কাছাকাছি কারণেই এই সব জায়গায় অপাশ্চাত্য ভাষাগুলোর অধ্যয়ন করছিলেন। অনেকাংশেই সেই উপনিবেশিক প্রশাসনিকতার প্রণোদনাতেই। উত্তর আমেরিকায় দেখা গেল নৃবিজ্ঞানীদের সংস্কৃতিকে ব্যাখ্যা করবার প্রয়াস থমকে এসে দাঁড়াচ্ছে ভাষার সামনে। আমেরিকার আদিবাসীদের সংস্কৃতিকে

অধ্যয়ন করতে গিয়ে নৃবিজ্ঞানীরা দেখলেন যে, কোনো সমাজের ভাষাকে না জেনে সেই সংস্কৃতি বা সমাজকে বোঝা যায় না। ফলে তাঁদের মনোনিবেশ করতে হলো সেই আদিবাসীদের ভাষাকে নথিকরণ ও বিশ্লেষণের কাজে। অন্যদিকে অস্ট্রেলিয়ায় কাজ করতে থাকা অনেক ভাষাবিজ্ঞানী দেখলেন যে, কোনো সমাজের ভাষাকে বোঝা সম্ভব হচ্ছে না যদি না তার সংস্কৃতিকে বোঝা যায়। ফলে এখানে ভাষাবিজ্ঞানীদেরও মনোনিবেশ করতে হলো সমাজগুলোর সংস্কৃতিকে বোঝা ও ব্যাখ্যা করবার কাজে। ফলে দেখা গেল নৃবিজ্ঞানীর কাজ আর ভাষাবিজ্ঞানীর কাজ পরস্পরের সম্পূরক তো বটেই, একটিকে ছাড়া আরেকটি প্রায় অচল।[৩] উপনিবেশায়নের এই সময়ের আগ পর্যন্ত ইউরোপে ভাষাবিজ্ঞানের চর্চা সীমিত ছিলো মূলত লাতিন, হিব্রু বা রোমান ভাষার ক্রমবিবর্তন বা ইউরোপেরই এক ভাষার পণ্ডিতদের অন্য ভাষা জানবার চেষ্টার মধ্যে। উপনিবেশের এই সময়ে এসেই, যখন আধুনিক নৃবিজ্ঞান বিকশিত হচ্ছে, তখনই অপাশ্চাত্য ভাষাগুলো ইউরোপের ভাষাবিজ্ঞানীদের আগ্রহী করে তোলে। ফলে দেখা গেল একদম প্রয়োগিক অর্থে গবেষণার মাঠেই নৃবিজ্ঞান আর ভাষাবিজ্ঞানীদের দেখা হয়ে যাচ্ছে এবং তারা আবিষ্কার করছেন যে উভয়েই উভয়ের শাস্ত্রীয় সীমানা পার হয়ে একে অপরের কাজ অনেকখানি করে ফেলেছেন। দেখা যায় যে নথিকৃত অপাশ্চাত্য ভাষাগুলোর উপাত্তের একটা বড় অংশ এসেছে নৃবিজ্ঞানীদের কাছ থেকে। আবার সে সময়ের ভাষাবিজ্ঞানীদের কাজেও দেখা যাবে অজস্র সাংস্কৃতিক বর্ণনা যা মূলত নৃবিজ্ঞানীদের কাজ বলে নির্ধারিত হয়েছিলো।

কিন্তু নৃবিজ্ঞানের সাথে ভাষা অধ্যয়নের প্রেক্ষাপট আসলে মাঠ পর্যায়ে কাজ করবার প্রয়োজনের চেয়ে আরো অনেক বেশি গভীর। এই সম্পর্কসূত্র আসলে আমাদেরকে বুঝতে হবে মানবসত্তার সংজ্ঞা নির্মাণের জন্য নৃবিজ্ঞানের যে দার্শনিক এবং তাত্ত্বিক তাড়না তার পরিপ্রেক্ষিতে। মানবীয়তা আসলে কী? এই

[৩] Duranti, Alessandro 1997, *Linguistic Anthropology*, Cambridge University Press, Cambridge.

প্রশ্নের উত্তর নির্মাণ করবার একটা আদি পদ্ধতি হচ্ছে প্রকৃতি জগতের অন্যসব প্রাণীর চেয়ে মানুষ কেনো, কীভাবে আলাদা তা নির্ধারণ করে মানুষের স্বকীয়তাগুলোর ভিত্তিতে মানবীয়তাকে ব্যাখ্যা করা। দেখা যায় যে, মানুষের যে বৈশিষ্ট্যগুলো মানুষকে প্রকৃতি জগতের আর সব প্রজাতি থেকে আলাদা করে তোলে তার কেন্দ্রীয় একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে মানুষের ভাষা। মানুষ ছাড়া অন্য কোনো প্রাণীর ভাষা নেই। এমনকি আজকে আমাদের আটপৌরে আলাপাচারিতাতেও আমরা বলি যে, মানুষ অন্য সব প্রাণীর থেকে আলাদা কারণ সে চিন্তা করতে পারে। কিন্তু একটু খেয়াল করলেই আমরা দেখতে পাব যে, ভাষা ছাড়া চিন্তার আর কোনো আধার নেই। আসলে ভাষাই চিন্তা।

মানুষের উৎস কী, মানুষ কোথা থেকে এলো, পৃথিবীর নানা প্রান্তে মানুষে মানুষে দৈহিক গড়নের পার্থক্য কী করে হলো, এইসব প্রশ্নের উত্তর একসময় ডারউইনের বিবর্তনবাদী তত্ত্বের হাত ধরে জৈবিক নৃবিজ্ঞান বিশদভাবে দেওয়ার চেষ্টা করেছে। জীবাশ্মবিদ্যার তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করে মানুষের জৈবিক বিবর্তনের ধাপগুলোকে ব্যাখ্যা করেছে, তার ভিত্তিতে আবার পৃথিবীর নানা-প্রান্তের মানুষদের জৈবিক শ্রেণিকরণ করেছে যা পরবর্তী সময়ে সামাজিক পরিসরে অনেক বর্ণবাদী দৃষ্টিভঙ্গিরও জন্ম দিয়েছিলো। 'বানর থেকে মানুষ' উদ্ভূত হওয়ার জনপ্রিয় ধ্যান-ধারণা পেশ করবার পাশাপাশি বিবর্তনবাদ পৃথিবীর নানা প্রান্তের মানুষদেরকে জৈবিক বিবর্তনের একরৈখিক ছকে বিন্যস্ত করে বর্ণবাদী মতাদর্শের জন্ম দিয়েছে। অগাস্ট কোঁতে বা হার্বার্ট স্পেনসারের জৈব সমাজের ধ্যান-ধারণা জৈবিক বিবর্তনের ধারণার সাথে যোগ হয়ে মানুষের সমাজ আর সংস্কৃতিকেও বিবর্তনের আবর্তে ব্যাখ্যা করবার একটা ঐতিহ্য দাঁড়িয়ে যায় নৃবিজ্ঞানে। এই সাংস্কৃতিক বিবর্তনবাদী ধ্যান-ধারণার প্রভাব আমরা দেখতে পাই হেনরি মর্গান থেকে শুরু করে টাইলর, ফ্রেজার, এমনকি, এঙ্গেলসের পরিবার, রাষ্ট্র ও ব্যক্তি মালিকানার উদ্ভব সম্পর্কিত রচনাতেও। সংস্কৃতির উদ্ভবকে বিবর্তনের সূত্র দিয়ে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে নৃবিজ্ঞান দেখতে পায় যে, সংস্কৃতির উৎস আর

বিকাশ সংক্রান্ত আলোচনা আর ভাষার উৎস ও বিকাশ সংক্রান্ত আলোচনা আসলে অভিন্ন ও অবিচ্ছেদ্য। এমনকি মানুষের জৈবিক উৎস ও বিকাশের আলোচনারও একটা বড় অংশ ভাষার বিবর্তনের সাথে জড়িত। ফলে বিবর্তনবাদী নৃবিজ্ঞান মানুষের ভাষার উৎস ও বিকাশের প্রশ্নটি নিজ অনুসন্ধানের অন্তর্ভুক্ত করে নেয়।

মানুষের ভাষার উৎসমূল কোথায়? কী কারণে আমাদের পূর্ব-পুরুষেরা প্রথম কথা বলতে শুরু করেছিলো? এগুলো ভাষা-নৃবিজ্ঞানের গোড়ার দিকের আলোচনা। কিন্ত এই প্রশ্নগুলোর কোনো সন্তোষজনক সুরাহা আজ পর্যন্ত হয়নি। জৈবিক নৃবিজ্ঞান নানাভাবে মানুষের বাকযন্ত্র আর মস্তিষ্কের বিবর্তনের সাথে সম্পর্কিত করে ভাষার উৎসমূলকে ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা করেছে। কিন্তু বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারেনি। প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানুষ কী কারণে ভাষার মতন প্রতীকী ব্যবস্থার উদ্ভব ঘটাতে সক্ষম হলো, তার পেছনের মনস্তাত্ত্বিক শর্তগুলো কী ছিলো, কীভাবে মানুষ সৃষ্টি জগতের সবকিছুরই নামকরণ করে নিজের ভাষার অংশ করে ফেললো, আদিম মানুষের সমাজ ও সাংস্কৃতিক জীবন পরিগঠনে ভাষার ভূমিকা কী, ইত্যাকার প্রশ্নের স্থান-কাল ও বিকাশের প্রকৃতিভিত্তিক উত্তরগুলো এখনো নৃবিজ্ঞান নিষ্পন্ন করতে পারেনি।

মানুষের চিন্তায় ভাষার উৎস ও বিকাশ সংক্রান্ত প্রশ্নগুলো আসলে শুধু নৃবিজ্ঞান কেনো, খোদ বিজ্ঞানেরও বহু আগে থেকে বিচরণশীল। ধর্মতত্ত্বেও এই প্রশ্নগুলোর উত্তর দেওয়ার চেষ্টা আমরা নানাভাবে দেখতে পাই। সেখানে বরং উত্তরগুলো সমাধানমূলক কারণ সেগুলো কার্যকারণের চেয়ে বেশি নির্ভর করে অলৌকিক কর্তাসত্তা বা ঈশ্বরের ধারণার ওপর। কিন্তু বিজ্ঞানকে কথা বলতে হয় প্রমাণ আর কার্যকারণ সূত্র মেনে। মানুষের জৈবিক উৎস নিয়ে জীবাশ্মবিদ্যা যতটুকু কাজে লাগে ভাষার উৎস নিয়ে সেটা সেরকম কোনো সাহায্য আমাদের করে না। কারণ ভাষার জৈবিক ভিত্তি হিসেবে ধরা হয় বাকযন্ত্র আর মানুষের মগজের বৈশিষ্ট্যগুলোকে। আর জীবাশ্ম হিসেবে মানুষের এই দুইটা প্রত্যঙ্গ টিকে থাকে না। ফলে মানুষের কথ্য ভাষার আবির্ভাবের কোনো বস্তুগত প্রমাণ

বিজ্ঞানের হাতে নেই। লিখিত ভাষা বা লেখনির যে আদিরূপ প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানে পাওয়া যায় তার অনুমিত বয়স হচ্ছে পাঁচ থেকে ছয় হাজার বছর। সেই বিচারে মানুষের মুখের ভাষার বয়স তার চেয়ে অন্তত একশগুণ বেশি বলে অনুমান করা হয়।

ভাষার উৎস, বিকাশ বা বৈচিত্র্যের প্রশ্ন প্রাচীন গ্রিসের দার্শনিকদেরও একটা প্রিয় বিষয়বস্তু ছিলো। দার্শনিক প্লেটোর জবানিতে আমরা দেখতে পাই ভাষার উৎস নিয়ে ভাবিত ছিলেন সক্রেটিসও। প্রশ্নগুলো নিয়ে আধুনিক চিন্তনপদ্ধতির আদি স্মারক হিসেবে সক্রেটিসের সাথে সমসাময়িক আরেকজন দার্শনিক সোফিস্ট ক্রেটাইলাসের তর্ক গ্রন্থিত হয়েছে প্লেটোর 'ক্রেটাইলাস' বইতে[৪]। ক্রেটাইলাস মনে করতেন পৃথিবীর তাবৎ কিছুর নাম রেখেছেন একজন নমোথেট বা আদি নামকর্তা যিনি কোনো ক্ষেত্রে ঈশ্বর নিজে, কোনো পৌরাণিক দেবদেবী বা কোনো ক্ষেত্রে কোনো পৌরাণিক বীর। এই নামগুলো মূলত নামীর অন্তর্নিহিত প্রকৃতিকেই নির্দেশ করে। কাজেই শব্দার্থবিদ্যা তথা কোনো জিনিসের নামকরণ কীভাবে হলো এবং নামের সাথে নামধারীর সম্পর্ক কি সেই আলোচনা দর্শন শাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত। ক্রেটাইলাসের প্রস্তাবনাকে সক্রেটিস খারিজ করে বলেন, সেই আদি নামকর্তা কীভাবে জানলেন যে কোনো জিনিসের অন্তর্নিহিত প্রকৃতি কী যদি আগে সেই জিনিসগুলোর কোনো নাম না থেকে থাকে? নাম নেই মানে তো ভাষা নেই। কারণ ভাষার শব্দমাত্রই কোনো না কোনো বিচারে শেষ পর্যন্ত নামেরই সমষ্টি। যেমন আমরা যাকে ক্রিয়া পদ বলি সেও একটি ক্রিয়ার নাম। আমরা যাকে বিশেষ্য বলি সেও কোনো গুণের নাম। আমরা যাকে অন্বয় বলি সেও এক পদের সাথে আরেক পদের সম্পর্কের নাম। কাজেই নাম ছাড়া ভাষা যেমন সম্ভব না, তেমনি ভাষা ছাড়া জ্ঞানও সম্ভব না। কারণ চিন্তা বা জ্ঞানের অদ্বিতীয় আধার হচ্ছে ভাষা।

---

৪ Sedley, David 2003, *Plato's Cratylus*, Cambridge Universiy Press, Cambridge.

সক্রেটিসের এই চিন্তারই প্রতিফলন আমরা দেখতে পাই ভাষাতত্ত্বের আধুনিক দিকপালদের একজন ফার্দিনান্দ দ্য সস্যুরের কাঠামোবাদী সূত্রাবলীতে। সস্যুর মনে করতেন ভাষার কোনো শব্দ দিয়ে প্রকৃতি জগতের কোনো জিনিসের নাম কি সেটা ঠিক করা আসলে একটা স্বেচ্ছাচারী বা আরবিট্রারি প্রক্রিয়া। মানুষের ভাষা তৈরি করবার মূলে আছে এই স্বেচ্ছাচারী কায়দায় প্রতীকের মধ্যে অর্থ আরোপের প্রক্রিয়া। এখানে কার্যকারণ সূত্রের চেয়ে বরং স্বেচ্ছাচারিতা আর প্রথাবদ্ধতাই বেশি প্রকট। কারণ প্রকৃতি জগতের প্রতিটি জিনিসকে মানুষ ভাষায় আত্মসাৎ করে স্বেচ্ছাচারী নামকরণের মধ্য দিয়েই। একারণেই বাস্তব প্রয়োজনে একটি শব্দের অর্থ বদলে যেতে পারে। আজকের দিনে এটা ভাষাতত্ত্বের একটি প্রতিষ্ঠিত অনুমান হলেও সক্রেটিস বা ক্রেটাইলাসের যুগে এটা কষ্টকল্প ছিলো, যখন তাদের ভাষা সংক্রান্ত ধ্যান-ধারণা ছিলো শুধু গ্রিসেই সীমাবদ্ধ।

সন্দীপন যুগ, মানে সপ্তদশ শতকের মাঝামাঝি থেকে অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে এই আলোচনা আবার ইউরোপীয় দর্শনে জায়গা করে নেয়। দেকার্তে, রুশো, জন লকরা ছিলেন এই আলোচনার পুরোধা। দেকার্তের কার্তেসীয় পদ্ধতি সে সময় মানুষের অস্তিত্বকেই ভাষার সাথে জড়িয়ে ব্যাখ্যা করে। তাঁর সেই বিখ্যাত উক্তি, 'আমি চিন্তা করি বলেই আমি অস্তিত্বশীল', মানবিক অস্তিত্বকেই ভাষা সাপেক্ষ করে তোলে কারণ চিন্তামাত্রেরই অস্তিত্ব আবার ভাষার অস্তিত্ব সাপেক্ষ। ফলে মানুষের অস্তিত্ব মানেই তা ভাষার অস্তিত্বের সাপেক্ষিক। এটাই আদতে মানবসত্তার দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিক আলোচনায় ভাষার প্রশ্নটিকে কেন্দ্রীয় করে তোলে। আজকের আধুনিক বিজ্ঞানের অগ্রগতিও তাই ভাষাতত্ত্বের বিকাশের মুখাপেক্ষী। যেমন উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ইনফরমেটিক্সের বিকাশে যে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা তৈরীর স্বপ্ন বিজ্ঞানীরা গত এক শতক ধরে করছেন তার ভবিষ্যতও নির্ভর করছে ভাষা বিজ্ঞানের বিকাশের ওপর। কারণ যদি বোঝা যায় যে, মানব মগজে ভাষা ঠিক কীভাবে তৈরী হয়, কীভাবে মানুষ হাজারে হাজারে শব্দ আর তাঁদের অর্থ মনে

রাখে, কীভাবে অসীম সংখ্যক অনন্য বাক্য তৈরী করতে পারে, তাহলেই আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স তৈরী সম্ভব হয়ে উঠবে।

ক্রেটাইলাস আর সক্রেটিসের তর্কের কোনো শেষ আমরা এখনো দেখতে পাইনি। ভাষা কি মানুষের প্রকৃত প্রদত্ত কোনো রহস্যময় বা অলৌকিক উপহার নাকি তা জৈবিক বা সাংস্কৃতিক বিকাশ থেকে উৎসারিত কোনো উদ্ভাবনী প্রতিভা, এই প্রশ্নে তর্ক চলেছে বিংশ শতকেও। উদ্ভাবনপন্থীরা মনে করতেন ভাষার উদ্ভব মানুষ ঘটিয়েছে প্রকৃতি জগতের অন্য ধ্বনিগুলোর অনুকরণে। যেমন অন্য প্রাণী বা প্রাকৃতিক শব্দগুলো মানুষের ভাষায় এসেছে অনুকরণের মাধ্যমে যার খানিকটা প্রমাণ আমরা দেখতে পাই 'ঝর ঝর ঝরে বরিষ ধারা' জাতীয় বাক্যবন্ধে যেখানে বৃষ্টির শব্দই 'ঝর ঝর' হয়ে মানুষের ভাষায় আশ্রয় পেয়েছে। ফলে ক্রেটাইলাসের যুক্তি এক্ষেত্রে ভিত্তি পেয়ে যায়। কিন্তু বিপরীতে সক্রেটিসের তর্কও টিকে থাকে কারণ এই 'ঝর ঝর' বলতে যে আমরা সবাই বৃষ্টির ঝরে পড়া বুঝব এই ঐক্যমত বাংলা ভাষায় কীভাবে তৈরি হলো? সেই ঐক্যমত তখনি সম্ভব, যখন ভাব বিনিময়ের জন্য একটি ভাষা আমাদের আগে থেকেই হাতে থাকে। তাহলে অন্তর্নিহিত গুণাবলির বিচার করে নামকরণের মাধ্যমে কীভাবে ভাষার উৎপত্তি হয়? সক্রেটিসের তোলা প্রশ্নের কোনো যুৎসই জবাব এখনো উদ্ভাবনপন্থীরা দিতে পারেননি।

উত্তর দিতে না পারলেও উনবিংশ শতকে ভাষার দর্শনের এই আলোচনা, বিশেষত জার্মান মনস্তাত্ত্বিক উইলেম উন্দ আর ব্রিটিশ নৃবিজ্ঞানী জন লুবকের বিশ্লেষণ, ভাষাতত্ত্বকে বিবর্তনের আলোচনার সাথে যুক্ত হতে সহায়তা করেছে[৫]। ভাষার উৎস নিয়ে দার্শনিক আলোচনাকে তাঁরা চারটি প্রস্তাবনায় সংকলিত করেন : উদ্ভাবন, অনুকরণ, প্রাকৃতিক ধ্বনি, আর অলৌকিকতা। সাংস্কৃতিক বিবর্তন পরবর্তীতে এই ধারণাগুলোকে কেন্দ্র করেই ভাষার উৎস

[৫] Hickerson, Nancy Parrot 2000, *Linguistic Anthropology*, Harcourt College Publishers, New York.

নিয়ে চিন্তা-ভাবনা শুরু করে। ডারউইনের বিবর্তনের ধারণা ভাষার উৎস সংক্রান্ত আলোচনাকে ঠেলে দেয় বিবর্তন চক্রে মানুষের সহোদর প্রজাতিগুলো, মানে সেই সুবিখ্যাত বানর বর্গভুক্ত প্রাণীদের যোগাযোগ পদ্ধতি গবেষণার দিকে, যাদের নৃবিজ্ঞানের ভাষায় বলা হয় প্রাইমেট বর্গ। বলা হয়ে থাকে যে হোমিনিড প্রাইমেট বর্গেরই একটি অংশ বিবর্তনের ধারায় এক সময় হোমোস্যাপিয়েন্স বা জৈবিক মানুষ হয়ে উঠেছে। ফলে হোমোস্যাপিয়েন্সের আগের স্তরগুলোতে মানুষের ভাষার সলুক সন্ধান করা যেতে পারে এই বর্গের যে অংশগুলো মানুষ হয়নি, অর্থাৎ হনুমান, শিম্পাঞ্জি, বেবুনসহ অন্য বানর গোত্রীয় প্রাণীদের যোগাযোগ পদ্ধতির মধ্যে। বিশেষত এই প্রাণীরা কীভাবে আবেগ-অনুভূতি প্রকাশ করে তার প্রতি গভীর মনোযোগ দেওয়া উচিত। অনুমান হিসেবে এই প্রস্তাবনার অনেক দুর্বলতা থাকলেও বিবর্তনবাদী নৃবিজ্ঞানের একটা বড় অংশ এক সময় নিবেদিত থেকেছে এই পদ্ধতিতে মানুষের ভাষার উৎস সম্পর্কে জানতে।

মানব বিবর্তনের আলোচনায় হোমিনিডদের একটি অংশের হোমোস্যাপিয়েন্স হয়ে উঠবার পেছনে নৃবিজ্ঞানীরা চারটি বৈশিষ্ট্য অর্জনকে যুগান্তকারী ধাপ হিসেবে বিবেচনা করেন। তার প্রথমটি হচ্ছে ঋজুতা, মানে চার পায়ের পরিবর্তে সোজা হয়ে দুই পায়ে হাঁটবার সামর্থ্য অর্জন যেটি ঘটেছিলো হোমো-ইরেকটাস, মানে ঋজুমানব যুগে। এই সামর্থ্যই পরে মানুষের হাতের ব্যবহারকে অনেক কৌশলী হতে সহায়তা করে মানুষকে হাতিয়ার বানাতে সমর্থ করেছিলো। তৃতীয় ধাপের বৈশিষ্ট্য হিসেবে চিহ্নিত করা হয় মানুষের বুদ্ধিমত্তার বিকাশ, যা পরের স্তরের মানুষদের করোটির আকার ও আকৃতিতে আরো বড় মগজের উপস্থিতির ভিত্তিতে প্রমাণিত হয়। হোমোস্যাপিয়েন্স হয়ে ওঠার চূড়ান্ত ধাপ হিসেবে চিহ্নিত হয় মানুষের ভাষা অর্জনের ধাপটি। কিন্তু মনে রাখা ভালো যে, বিবর্তনের ধারায় এই ধাপগুলো প্রায় ক্ষেত্রেই পরস্পরের সাথে সম্পর্কিত। এই চার ধাপের বিবর্তনে ভাষা-নৃবিজ্ঞানীরা মূলত বাকযন্ত্র আর মগজের বিকাশ নিয়েই বেশি মনোযোগী। বাকযন্ত্রের

ক্ষেত্রে কোনো জীবাশ্ম প্রমাণ না থাকায়, তাদের আরো বেশি নির্ভর করতে হয় মগজের বিকাশের ওপর যা জীবাশ্মের করোটির আকার ও আকৃতি দেখে বিচার করা যায়। সেই বিচারে দেখা যায় অস্ট্রালোপিথেকাস স্তরে আদিমানবের মগজের আয়তন ছিলো ৪০০-৫০০ ঘন সেন্টিমিটার, হোমোহ্যাবিলিস স্তরে ৭০০ ঘন সেন্টিমিটার, হোমো হোমোইরেকটাস স্তরে ১০০০ ঘন সেন্টিমিটার, এবং মানুষ তথা হোমোস্যাপিয়েন্স স্তরে মগজের পরিধি দাঁড়ায় প্রায় ১৪০০ ঘন সেন্টিমিটার[৬]। মগজের এই বিকাশের কারণেই মানুষের করোটির সামনের দিকে স্ফীত হয়ে উঠেছে। মানুষের বানরসদৃশ্য বিবর্তন সহোদরদের সাথে এটা একটা দৃশ্যমান শারীরিক পার্থক্য। কিন্তু মানুষের বুদ্ধিমত্তার বিকাশ তথা ভাষার বিকাশ ও ব্যবহার তার মগজের আকৃতি বাড়িয়েছিলো, নাকি মগজের প্রবৃদ্ধিই তাকে ভাষা উদ্ভাবনে সমর্থ্য করে তুলেছিলো সে প্রশ্নের সুরাহা বিবর্তনবাদী ব্যাখ্যায় পাওয়া যায় না।

হোমিনিড বিবর্তনের ধারায় মানুষের ভাষার উৎস খুঁজবার পদ্ধতি পরে নৃবিজ্ঞানীদের অন্য অনেক প্রজাতির মধ্যেই যোগাযোগ ব্যবস্থার অধ্যয়নে আগ্রহী করে তুলেছে। ফলে আরো অনেক মানবিক ক্রিয়াকলাপের মতোই, ভাষার ক্ষেত্রেও একটা তুলনামূলক আলোচনা শুরু হয় যে অন্য প্রাণীর যোগাযোগ ব্যবস্থার সাথে মানুষের ভাষার পার্থক্য কী? এই আলোচনা আবারো মানবীয়তা সম্পর্কিত দার্শনিক আলোচনার সাথে যুক্ত হয়ে পড়ে, কারণ অন্য প্রজাতির সাথে মানুষের পার্থক্য আর অনন্যতাই তো প্রাথমিক বিচারে মানবীয়তা। এই অন্য প্রজাতিগুলোর মধ্যে বিশেষ গুরুত্ব পায় সমাজবদ্ধ ঝাঁক জীবেরা, যেমন মৌমাছি, পিঁপড়া, নেকড়ে। পাশাপাশি হোমিনিড বর্গের প্রাণীদের নিয়েও গবেষণা চলতেই থাকে। কিন্তু ভাষার উৎসের প্রশ্নটি ক্রমশ সমাধানের অযোগ্য হিসেবে দেখা দিতে থাকে। এমনকি ফ্রান্সের লিংগুইস্টিক

---

৬ Hickerson, Nancy Parrot 2000, *Linguistic Anthropology*, Harcourt College Publishers, New York.

সোসাইটির বিজ্ঞানীরা ১৮৬৫ সালে ঘোষণাই দিয়ে দেন যে, তারা আর এবিষয়ে মাথা ঘামাবেন না। কারণ ভাষার উৎস আসলে একটি বৈজ্ঞানিক সমাধানের অযোগ্য বিষয়। তখনও পর্যন্ত বিজ্ঞান শুধু সেই প্রশ্নই তোলে যার উত্তর সে দিতে পারে। ইউরোপের ভাষাবিজ্ঞানীদের মধ্যে ভাষার উৎস নিয়ে গবেষণা প্রায় ট্যাবু হয়ে পড়েছিলো সেসময়।

ভাষাবিজ্ঞানীদের এই ছেড়ে দেওয়া হাল ধরতেই এগিয়ে আসেন পরের নৃবিজ্ঞানীরা যারা ভাষা বিজ্ঞানের আদিকল্পটা খানিকটা বদলে নেন। বিবর্তনবাদী ভাষাবিজ্ঞানীদের অনুমান ছিলো যে, অন্য প্রাণী বা প্রাইমেটদের সাথে মানুষের ভাষার পার্থক্য হচ্ছে পরিমাণগত। মানে মানুষ অন্য যে কোনো প্রাণীর চেয়ে বেশি ধরনের ধ্বনি তৈরি করতে পারে বলেই মানুষের পক্ষে ভাষা অর্জন করা সম্ভব হয়ে উঠেছে। নৃবিজ্ঞানীরা বলবার চেষ্টা করলেন যে, আসলে এই পার্থক্য যত না পরিমাণগত তার চেয়ে বেশি গুণগত চরিত্রের। কারণ মানুষের ভাষার সাথে অন্য প্রাণীর ডাকাডাকির মূল পার্থক্য হচ্ছে মানুষের ভাষা একটা প্রতীকী ব্যবস্থা যা আসলে একটা সাংস্কৃতিক নির্মাণ, মানুষের সৃজনশীলতার আদিমতম ভিত্তি। এই আলোচনা মানবসত্তার প্রকৃতি আলোচনাতেও সৃজনশীলতাকে আরো অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ করে তোলে। ফলে ভাষার উৎস সংক্রান্ত আলোচনা একটা নতুন পদ্ধতিগত পথ খুঁজে পেল। সেই পথ ধরে আজকে তিনটি অনুকল্প তৈরি হয়েছে ভাষার উৎস নিয়ে।

প্রথম অনুকল্পটি প্রস্তাব করেন চার্লস হকেট। এটা নৃবিজ্ঞানের আলোচনায় নকশাবিন্যাস বা ডিজাইন ফিচারস হিসেবে খ্যাত। হকেট বলেন, মোট ১৩টি জৈবিক ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য মানুষের ভাষাকে সম্ভব করে তোলে। তার মধ্যে রয়েছে (১) কণ্ঠ ও শ্রবণ শক্তি, (২) শব্দ সম্প্রচার ও শ্রবণ ক্ষমতা, (৩) প্রলম্বিত ধ্বনি করবার সামর্থ্য, (৪) এক ধ্বনি শুনে অন্য ধ্বনিতে উত্তর দেওয়ার সামর্থ্য, (৫) অনুকরণ বা প্রতিধ্বনি করবার ক্ষমতা, (৬) বিশেষায়িত ধ্বনি তৈরির ক্ষমতা, (৭) ধ্বনির অর্থদ্যোতকতা, (৮) স্বেচ্ছাচারী অর্থ নির্মাণ বা প্রতীক ব্যবহারের ক্ষমতা, (৯) উচ্চারণের সামান্যভেদের

মাধ্যমে অর্থগত বৈচিত্র্য তৈরির ক্ষমতা, (১০) অনুপস্থিত বাস্তবতাকে ভাষার মধ্য দিয়ে তুলে ধরবার ক্ষমতা, (১১) বাক্যের মধ্য দিয়ে সৃজনশীল চিন্তার প্রকাশ ঘটানো, (১২) বংশ পরম্পরায় ভাষিক জ্ঞানকে প্রবাহিত রাখবার ক্ষমতা, এবং সর্বশেষ (১৩) ধ্বনি কাঠামোর দ্বৈত-বিপরীত বিন্যাস করবার ক্ষমতা। হকেট বলেন, এই ১৩টি বৈশিষ্ট্য বা ক্ষমতার প্রথম নয়টি কোনো না কোনো মাত্রায় মানুষ ভিন্ন অন্য প্রাণীর মধ্যেও দেখা যায়। কিন্তু শেষ চারটি সামর্থ্য শুধু মানুষেরই রয়েছে[৭]। একারণেই এই চারটি বৈশিষ্ট্য শুধু মানুষের ভাষাকেই সম্ভব করে তুলেছে তাই নয়, বরং মানুষের মানবীয়তার ভিত্তিও এই বৈশিষ্ট্যগুলোই যা তাকে সংস্কৃতি সৃজনশীল প্রাণী করে তুলেছে। অন্য সব প্রাণীর থেকে অনন্য করে তুলেছে। যেমন ভাষার মাধ্যমে স্থান-কালের প্রতিসরণ ঘটিয়ে মানুষ অতীত বা ভবিষ্যৎ বাস্তবতাকে আরেক জায়গায় বিমূর্তভাবে হলেও তৈরী করতে পারে যে সামর্থ্য অন্য কোনো প্রজাতির নেই। মিথ্যা বা কল্পনাকে ভাষিক বাস্তবতায় নির্মাণ করতে পারাটাও একান্তই মানবীয় সামর্থ্য। এগুলোই মানুষকে সর্বোচ্চ স্মৃতি ও কল্পনাশক্তি সম্পন্ন প্রাণী করে তুলেছে। কাজেই এই শেষ চারটি বৈশিষ্ট্য মানুষের এমন প্রতিভা যা তার মানবিকসত্তাকেই সম্ভব করে তুলেছে।

ভাষার উৎস সংক্রান্ত নৃবৈজ্ঞানিক আলোচনায় দ্বিতীয় তাত্ত্বিক অনুকল্পটি গর্ডন হিউজের প্রাইমেট বর্গের যোগাযোগ পদ্ধতির গবেষণা থেকে উদ্ভূত[৮]। এটাকে বলা যেতে পারে দেহভঙ্গি তত্ত্ব। গর্ডন দেখতে পান যে, অন্য প্রাণীর মধ্যে ডাকাডাকির মাধ্যমে যে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হয় সেটা আদতে ভাষা নয়। কারণ তার ওপর ঐ প্রাণীর কোনো বুদ্ধিগত নিয়ন্ত্রণ নেই। এগুলো আসলে শারীরিক রিফ্লেক্স যা কোনো আবেগ বা পরিবেশগত প্রণোদনায় প্রাণীদের ইচ্ছা নিরপেক্ষভাবে ঘটে। এগুলোকে ভাষা বলা যায় না, কারণ

---

৭ Hocket, Charles 1960, 'The Origin of Speech', *Scientific American*, Vol.203.

৮ Hewes, Gordon 1973, 'Primate Communication and the Gestural Origin of Language', *Current Anthropology*, Vol.14, Pp. 5-24.

এগুলো ভাব আদান-প্রদান বা যোগাযোগ না, এগুলো আসলে একমুখীন সম্প্রচার। বরং উচ্চতর স্তরের প্রাইমেট, যেমন শিম্পাঞ্জিদের মধ্যে অঙ্গাভঙ্গির মাধ্যমে যে অর্থ বিনিময় দেখা যায় সেটাই ভাষার আদলের সাথে বেশি মেলে। ফলে ভাষার উৎসমূল খুঁজতে হলে আমাদের নজর দিতে হবে হোমিনিড বিবর্তনে দেহভঙ্গিমা থেকে শুরু করে ধ্বনি নির্ভর প্রতীকী ব্যবস্থার বিবর্তনের দিকে। আদিম শিকারী সমাজে শিকার কালে নিঃশব্দ অঙ্গাভঙ্গির মধ্য দিয়ে যে ইশারা বিনিময় হতো সেটাকেই ভাষার উদ্ভবের ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করেন গর্ডন। এই দেহ-ভাষার পাশাপাশি এক সময় ধ্বনি প্রতীকের আবির্ভাব ঘটে যা ক্রমশ জটিল একটা প্রতীকী ব্যবস্থা হিসেবে ভাষায় রূপান্তরিত হয়। দেহ-ভাষা সেক্ষেত্রে গৌণ হয়ে গেলেও একেবারে বিলুপ্ত হয়ে যায়নি। এখনো মানুষের প্রাত্যহিক বাচনিকতায় দেহভঙ্গিমার একটা গুরুতর ভূমিকা আছে। গর্ডন হিউজের এই তত্ত্ব ভাষার আলোচনায় প্রতীক ও তার অর্থ নির্মাণ প্রক্রিয়াকে আরো বেশি গুরুত্ব এনে দেয়।

মরিস স্বদেশ ভাষার বিকাশের ক্ষেত্রে জোর দেন ভাষার ইন্দ্রিয়পরায়ণতার ওপর[১]। তিনি মনে করেন, ভাষা একটি ইন্দ্রিয় নির্ভর ব্যবস্থা হিসেবে গড়ে উঠেছে মানুষের অতীন্দ্রিয় অনুভবকে অর্থ দিয়ে ইন্দ্রীয় অভিজ্ঞতার অংশ করতে গিয়ে। যেমন 'ঐ' কথাটার মাঝে যে দিক নির্দেশনা আছে সেটার প্রতিক্রিয়ায় সেদিকে মনোযোগ দেওয়াটা আমাদের ইন্দ্রিয়গত গঠনের সাথে জড়িত। একারণেই 'ঐ' দিকে না তাকানোটা কঠিন। 'ঐ' বলে সাথে হাতের আঙ্গুল যে দিকে নির্দেশ করবে, শ্রোতা বা দর্শক মাত্রই ইন্দ্রিয়গতভাবেই সেদিকে ধাবিত হবেন। ফলে তিনি ধ্বনিভঙ্গি আর দেহভঙ্গি দুইটারই বিকাশকে ভাষার আবির্ভাবের কারণ হিসেবে ব্যাখ্যা করতে চান। আধুনিক ভাষাবিদ্যার একটা বড় অনুমান হচ্ছে ভাষার লিখিত বা ধ্বনিগত প্রতীকের সাথে সংশ্লিষ্ট

---

১ Swadesh, Morris 1971, *The Origin and Diversification of Languages*, Aldine, Chicago.

অর্থের কোনো কার্যকারণ সম্পর্ক নেই। মরিস তার বিপরীতে দাঁড়িয়ে বলেন যে, আধুনিক ভাষাতে এই সম্পর্ক স্পষ্ট না থাকলেও ভাষার উদ্ভবের ক্ষেত্রে ইন্দ্রিয়ানুভূতির সাথে ভাষার ধ্বনি কাঠামোর সম্পর্ক আছে। এমনকি তিনি আধুনিক ভাষার ধ্বনি বিন্যাসের মাঝেও ইন্দ্রিয়গত অনুভূতির একটা সম্পর্ক দেখান। যেমন স্বরধ্বনির ব্যবহারকে তিনি অর্থগত ভাব বা বস্তুর আকৃতির সাথে সম্পর্কিত মনে করেন। বাংলায় উদাহরণ হতে পারে 'গোল' শব্দটির ও-কার যার উচ্চারণও শব্দটির অর্থের সাথে সাঞ্জস্যপূর্ণ। স্বদেশের আলোচনা হকেট বা গর্ডনের ধারাবাহিকতাতেই প্রতীকের ব্যবহারকে নৃবিজ্ঞানের আলোচনায় আরো গুরুত্বপূর্ণ করেছে।

ভাষার উৎস বা বিকাশ নিয়ে বিবর্তনবাদী নৃবিজ্ঞান আরো বহুদূর অগ্রসর হয়েছে। আদিযুগের ভাষাগুলোর সাথে আধুনিক ভাষার তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে ভাষার বিবর্তনের পরের ধাপগুলোকেও ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা জারি আছে এখনো। আধুনিক ভাষার বিকাশের ক্ষেত্রে প্রতীক, ধ্বনি বা অঙ্গভঙ্গিও চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে বাক্য। কিন্তু বাক্যের প্রশ্নটি আসলে শব্দার্থ বা প্রতীকের আলোচনার চেয়েও অনেক বেশি জটিল আর বিস্তৃত। কারণ যে কোনো ভাষায় খুব সুনির্দিষ্ট সংখ্যক বর্ণ বা ধ্বনিগত প্রতীক থাকে। সংখ্যায় অনেক বেশি হলেও সেই ভাষায় ঠিক কতগুলো অর্থবহ শব্দ আছে সেটাও গুনে ফেলা সম্ভব। কিন্তু একটা ভাষায় ঠিক কতগুলো বাক্য গঠিত হতে পারে সেটা নিরুপণ তো দূরের ব্যাপার, কোনো অনুমান পর্যন্ত করা সম্ভব না। একারণেই বাক্য আজকের ভাষাবিদ্যা তো বটেই, ভাষা-নৃবিজ্ঞানের আলোচনাতেও কেন্দ্রীয় আগ্রহের জায়গা হয়ে আছে। বলা হচ্ছে, এই বাক্য তৈরী করবার সৃজনশীল ক্ষমতার মাঝেই নিহিত আছে মানবীয়তা আসল রহস্য, তাঁর প্রকৃত প্রকৃতি।

ভাষার বিবর্তনের এই সুদীর্ঘ আলোচনার শেষে আমরা ভাষার উৎস ও বিকাশ একটু সরলীকৃত কিছু অনুমান দিয়ে বুঝবার চেষ্টা করতেই পারি, প্রস্তাবিত অনুকল্প বা তত্ত্বগুলোর সাথে খুব মৌলিক কোনো বিরোধে না গিয়েই। বলা যেতে পারে, মানুষের

ভাষার বিকাশ ঘটেছে তিনটি ধাপে। প্রথমত; ধ্বনিগত ও দেহভাষার স্তর, যে স্তরে মানুষ কিছু সীমিত ধ্বনি আর অঙ্গভঙ্গি দিয়ে অর্থ বিনিময় করেছে। দ্বিতীয়ত; শব্দমূলগত স্তর, যে স্তরে মানুষ যৌগিক ধ্বনির বিন্যাস দিয়ে অনেক শব্দ তৈরি করে, সেগুলোর অর্থ নিষ্পত্তি করে ব্যবহার করা শুরু করেছে বার্তা আদান-প্রদানের জন্য। তৃতীয়ত; বাক্য স্তর যেখানে মানুষ শব্দগুলো জটিল ব্যাকরণিক সূত্র দিয়ে গাঁথবার মধ্য দিয়ে আরো জটিল ভাব আদান-প্রদানের সামর্থ্য অর্জন করেছে। বিবর্তনবাদী আলোচনায় বাক্যের চেয়ে শব্দের প্রতি বেশি মনোযোগ দেওয়া হয়। পরবর্তী সময়ে কাঠামোবাদী ভাষাবিজ্ঞান সেই ঘাটতি পুষিয়ে দিয়েছে। বিবর্তনবাদীদের অনুমান, এই সবকিছুই ঘটতে সময় লেগেছে প্রায় ১০ লক্ষ বছর। বিবর্তনের সূত্রে সময়কালের যে ধারণা তাতে এটা মনে হয় খুব বেশি সময় নয়। ভাষা বৈচিত্র্যকে ব্যাখ্যা করবার ক্ষেত্রেও বিবর্তনবাদী ধারায় বহু আলোচনা রয়েছে। এই প্রশ্নে মানুষের উৎসমূল আর ভাষার উৎসমূলের আলোচনা প্রায় একই রকম। এখানে মৌলিক দুটি ধারণার একটি হচ্ছে পৃথিবীর ভাষাগুলো বিভিন্ন জায়গায় স্বতন্ত্রভাবে বিকশিত হয়েছে। অন্যটি হচ্ছে একটি অভিন্ন ভাষা থেকে পৃথিবীর সমস্ত ভাষার উদ্ভব ঘটেছে। এই দুই অনুমানেই ভাষার জায়গায় মানবজাতি বসিয়ে নিলেও আলোচনার ছকের খুব একটা হেরফের হয় না।

ভাষার বিকাশের আলোচনায় আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ গবেষণার ক্ষেত্র হচ্ছে মানব শিশুর ভাষা আয়ত্ত করবার প্রক্রিয়া। একটি শিশু ঠিক কী কারণে ভাষা শেখে সেই প্রশ্নের উত্তর কাঠামোগতভাবে খানিকটা হলেও ভাষার বিকাশের প্রশ্নের সাথে জড়িত। আবার এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়েই ভাষার সাথে সংস্কৃতির প্রশ্নটি আরো ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে যায়। কারণ শিশুর বেড়ে উঠবার সাথে সাথে তাঁর সামাজিকীকরণ বা সাংস্কৃতিক জ্ঞান অর্জন থেকে শুরু করে শিক্ষাদীক্ষা পর্যন্ত সব কিছুরই অদ্বিতীয় মাধ্যম হচ্ছে ভাষা। ভাষার মাধ্যমেই একটি মানব শিশু সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মানুষ হয়ে ওঠে। এই প্রশ্নটিও আসলে ভাষা নিয়ে অন্য অনেক প্রশ্নের

মতন বহু শতাব্দী প্রাচীন একটি প্রশ্ন। হেরোডোটাসের বয়ানে জানা যায়, প্রাচীন মিশরের ফারাও সম্রাট সামেথিকাস গ্রিক আর মিশরীয় ভাষার মধ্যে কোনটি মৌলিক ও শ্রেষ্ঠ ভাষা এটা জানবার কৌতূহলে দুটি শিশুকে এক মেষপালকের কাছে রেখে আদেশ দেন যে, এই দুই শিশুর সামনে কেউ যেন কোনো ভাষায় কথা না বলে। সম্রাটের অনুমান ছিলো কোনো ভাষা না শোনা এই শিশুরা যে ভাষায় কথা বলবে সেটাই আদিভাষা। দীর্ঘদিন এই শিশুদের বিচ্ছিন্ন রাখবার পরে সেই শিশু দুইটি যখন প্রথম কারো সাক্ষাৎ পেল, তারা নাকি গ্রিক ভাষায় চিৎকার করে বলেছিলো 'বেকোজ' যার অর্থ রুটি। সম্রাট সামেথিকাস তারপর গ্রিক ভাষার শ্রেষ্ঠত্ব মেনে নেন। সপ্তদশ শতকের ইতালীয় ঐতিহাসিক সালিমেম্বেনের বর্ণনায় এর চেয়েও নির্মম পরীক্ষার কথা জানা যায়। প্রুশিয়ান সম্রাট দ্বিতীয় ফ্রেডরিখ নাকি একই কৌতূহল নিয়ে বন্দী ও বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিলেন তারা আদৌ কোনো ভাষা শেখে কিনা বা শিখলে কোন ভাষা শেখে সেটা বুঝবার জন্য। ফ্রেডরিখের নিরীক্ষার কোনো ফলাফলই জানা যায়নি, কারণ বন্দী সব শিশুই মারা পড়েছিলো[১০]।

পশ্চিমের দার্শনিক ঐতিহ্যেও আমরা এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজবার বহু প্রয়াস দেখতে পাই। সপ্তদশ শতকের দার্শনিক জন লক যেমন বলেছিলেন, একটি শিশুর মন আসলে শুন্য প্রকোষ্ঠ। তিনি মনে করতেন, ভাষা অর্জনের মধ্য দিয়েই সেই শুন্য প্রকোষ্ঠ ক্রমশ নানা জ্ঞান ও চিন্তায় পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। মনোবিদ বি এফ স্কিনার মনে করতেন, মানুষ আসলে আচরণগত প্রতিফলনের কারণেই ভাষা শেখে যা আসলে সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ারই ফলাফল। তার বিপরীতে রেনে দেকার্তের আলোচনায় আমরা দেখতে পাই তিনি ভাষার বিন্যাসকে মানুষের অন্তর্গত প্রতিভা হিসেবে বিবেচনা। যা পরে নোম চমস্কির ভাষা চিন্তাকে প্রভাবিত করেছে। আধুনিক ভাষাবিদ্যার অন্যতম পুরোধা নোম চমস্কির মতে, মানবশিশু ভাষা

---

১০ Eco, Umberto 1995, *The Search for the Perfect Language,* Fontana Press, London.

শেখে তার মাথার ভেতরের কিছু জৈবিক বৈশিষ্ট্যের কারণে। ভাষার জন্য একটা জৈব ছক আগেই সাজানো থাকে মানুষের মগজে। যাকে তিনি বলেন, ভাষা আয়ত্তকরণের যন্ত্র। এটা আসলে একটা ব্যাকরণিক ছক যা মানুষের মৌলিক সৃজনশীলতার উৎস। এই কারণেই মানুষের পক্ষে সম্ভব হয় সৃজনশীল ব্যাকরণিক বিন্যাস ব্যবহার করে অসীম সংখ্যক বাক্য তৈরী করা। চমস্কি তার এই কাঠামোবাদী ব্যাকরণকে বলেন, রূপান্তরশীল সঞ্জননী ব্যাকরণ।

নৃবিজ্ঞানের ভাষাকাণ্ড। সংস্কৃতির জোড়া সেতু

নৃবিজ্ঞানের আদিকাণ্ডে ভাষা ও মানবসত্তার সম্পর্ক নিয়ে যে আলাপচারিতার জন্ম, তারই ফলাফল হিসেবে নৃবিজ্ঞানের পরিধিতে ভাষার আলোচনা একটা স্বতন্ত্র শাখা বা উপশাখা হিসেবে দাঁড়িয়ে যায়। কেউ একে বলেন ভাষা-নৃবিজ্ঞান, কেউ বা বলেন নৃবৈজ্ঞানিক ভাষাতত্ত্ব। আগেই বলেছি, ভাষা নৃবিজ্ঞানের প্রাথমিক বিকাশটা ঘটে আমেরিকার নৃবিজ্ঞানীদের হাতে, আর খানিকটা অস্ট্রেলিয়ার ভাষাবিজ্ঞানীদের কাজের মধ্য দিয়ে। কিন্তু ভাষা-নৃবিজ্ঞানের সীমা-পরিসীমা নিয়ে ১৯৬০-এর দশক পর্যন্ত পরিষ্কার কোনো ধ্যান-ধারণা ছিলো না। ১৯৬০-এর দশকে ডেল হাইমস নামের একজন নৃবিজ্ঞানী প্রথম ভাষা নিয়ে নৃবিজ্ঞানীদের রচনার একটা বিস্তৃত সংকলন তৈরী করেন, যার মধ্য দিয়ে নৃবিজ্ঞানের এই শাখাটার একটা রূপরেখা আমরা পাই[১১]। ভাষা-নৃবিজ্ঞান শব্দবন্ধটাও প্রথম ব্যবহার করা শুরু করেন তিনিই। ভাষা আর মানবসত্তার সম্পর্কের অধ্যয়নের সাথে এবার যুক্ত হয় এই দুইয়ের সাথে সমাজ আর সংস্কৃতির সম্পর্কেরও পাঠ। মোটাদাগে ভাষা-নৃবিজ্ঞানের বিচরণের ক্ষেত্র ছিলো সমাজ আর সংস্কৃতি পাঠে ভাষার গুরুত্ব আর ভাষার পাঠে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রপঞ্চগুলোর প্রাসঙ্গিকতার জায়গা। কিন্তু সমাজবিদ্যার পরিসরে সমাজ-ভাষাবিদ্যা বলে আরেকটা ধারা গড়ে ওঠায় ভাষা

[১১] Hymes, Dell (ed.) 1960, *Language in Culture and Society: A Reader in Linguistics and Anthropology*, Allied Publishers Pvt. Ltd., New Delhi.

নৃবিজ্ঞানের অগ্রাধিকারে চলে আসে সংস্কৃতি আর ভাষার সম্পর্ক। ফলে ভাষা নৃবিজ্ঞানের কাছে মানুষের মুখের ভাষা হয়ে ওঠে একটি গুরুতর সাংস্কৃতিক ক্রিয়া, আর লেখার ভাষা হয়ে ওঠে একটা গুরুতর সাংস্কৃতিক উপাদান যা সেই সংস্কৃতির অন্তর্লীন অলিন্দগুলোও নৃবিজ্ঞানীর জন্য খুলে দিতে পারে। কাজেই ভাষা, মানবসত্তা আর সংস্কৃতি নিয়ে সংকীর্তনের ক্ষেত্র হয়ে দাঁড়ায় ভাষা-নৃবিজ্ঞান।

মার্কিন মুলুকে সর্বপ্রথম ভাষার নিবিষ্ট পাঠ প্রাতিষ্ঠানিক নৃবিজ্ঞানের মূলধারার অংশ হিসেবে স্বীকৃতি পায়। খেয়াল রাখতে হবে, এই প্রাতিষ্ঠানিকতার সাথে উপনিবেশিক প্রশাসনিকতার সম্পর্ক তখনও অটুট। কারণ আমেরিকার আদিবাসী ইন্ডিয়ানদের সমাজ ও সংস্কৃতি বোঝার প্রশাসনিক প্রয়োজন থেকেই তাঁদের ভাষার বোঝাপড়া জরুরি হয়ে পড়ে। উনবিংশ শতকের শেষভাগে জন ওয়েসলি পাওয়েল নামের প্রকৃতিবিদ, আমেরিকার প্রথম পেশাদার নৃতাত্ত্বিক সংস্থা 'ব্যুরো অব আমেরিকান এথনোলজি'র প্রতিষ্ঠাতা, প্রথম অনুধাবন করেন সংস্কৃতির শ্রেণী বিন্যাসের জন্য ভাষা একটা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। ফলে তিনিই প্রথম আমেরিকান ইন্ডিয়ানদের ভাষা অধ্যয়নের জন্য এক সারি ভাষা ও নৃবিজ্ঞানী নিয়োগ করেন, যারা মিলে এই ভাষাগুলোর একটা বিশাল উপাত্ত-সম্ভার গড়ে তোলেন। এটাই পরবর্তী সময়ে ভাষা-নৃবিজ্ঞানের উদ্ভবকে সম্ভব করে তোলে। আর এই নতুন উপশাখাটি পরে সুসংহত হয়ে একটা তাত্ত্বিক প্রকল্পের রূপ নেয় আমেরিকান নৃবিজ্ঞানের অন্যতম পুরোধা ফ্রান্জ বোয়াজের হাতে।

বোয়াজ পাওয়েলের প্রকল্পের গুরুত্বটুকু মানলেও যেই উদ্দেশ্যে পাওয়েল ভাষাগুলোকে জানতে চান, সেই উদ্দেশ্যটিকে খারিজ করেন। তাঁর যুক্তি ছিলো ভাষার ভিত্তিতে সংস্কৃতির প্রকরণ তৈরি করা পদ্ধতিগতভাবে ত্রুটিপূর্ণ, কারণ ভাষার সাথে সংস্কৃতি বা জাতিসত্তার কোনো অনিবার্য আন্তঃসম্পর্ক নেই; এগুলো পরস্পর অবিভাজ্য অস্তিত্ব। এখানে মনে রাখা দরকার, বোয়াজের সময়ে সংস্কৃতির ধারণাটাই নৃবিজ্ঞানে প্রধানত মানুষের সমাজের বস্তুগত

উপাদান আর আচরণগত প্রথা-প্রতিষ্ঠান কেন্দ্রিক ছিলো। কিন্তু একই সাথে বোয়াজ মানতেন যে, সংস্কৃতির পরিগঠনে ভাষার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে এবং একারণেই নৃবিজ্ঞানকে ভাষা অধ্যয়ন করতে হবে। কিন্তু এই অধ্যয়ন সংস্কৃতির শ্রেণী বিন্যাসের কাজে ব্যবহার করা যাবে না। কারণ কোনো ভাষা বা সংস্কৃতিকে ব্যাখ্যা করতে হবে তার নিজ পরিপ্রেক্ষিতে, অন্য ভাষা বা সংস্কৃতির সাথে তুলনামূলক বিচার করে নয়। বরং ভাষা সাংস্কৃতিক মনোজগৎ বোঝার কাজে লাগতে পারে। বোয়াজের বিচারে নৃবিজ্ঞানের জন্য ভাষা হচ্ছে মানুষের মনে উঁকি দেওয়ার জানালা। এই মনোজগতের আদলটা বেশি বোঝা যায় ভাষার ব্যাকরণিক গঠনে। ফলে বোয়াজের নিজের গবেষণাতেও প্রাধান্য পেয়েছে আমেরিকান ইন্ডিয়ানদের ভাষার ব্যাকরণিক বর্গগুলো। কিন্তু ভাষার বৈজ্ঞানিক পঠন-পাঠনে বোয়াজের মৌলিক অবদান হচ্ছে তার আপেক্ষিকতাবাদের ধারণা। বোয়াজের সময় পর্যন্ত ভাষার বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে ভাষাবিজ্ঞান আর নৃবিজ্ঞান দুটোতেই একটা প্রবণতা ছিলো অ-ইউরোপীয়ান ভাষাগুলোকে লাতিন বা হিব্রুর মতন প্রাচীন ইউরোপীয় ভাষার পদ্ধতি প্রয়োগ করে বিশ্লেষণ করবার। বোয়াজ বলেন যে, প্রতিটি ভাষার ধ্বনিগত, অর্থগত, এবং বাক্যগত কাঠামোকে বিশ্লেষণ করতে হবে সেই ভাষার সাথে সংগতিপূর্ণ বিশ্লেষণ পদ্ধতি দিয়ে। কোনো ভাষার মানদণ্ড দিয়ে আরেক ভাষাকে অধ্যয়ন করা যায় না। বোয়াজের এই তর্ক আসলে ছিলো বিবর্তনবাদী দৃষ্টিভঙ্গিরও একটা সমালোচনা যা ইউরোপীয় ভাষার মানদণ্ড দিয়ে অন্য ভাষার বিচার করে ভাষাগুলোকেও আদিম, প্রাচীন, ও আধুনিক ইত্যাদি স্তরে সাজানোর চেষ্টা করত। বোয়াজ মনে করতেন, এই বিবর্তনবাদী দৃষ্টিভঙ্গি সমস্যাজনক, কারণ সব ভাষাই নিজের প্রেক্ষাপটে একটা স্বয়ংসম্পূর্ণ ব্যবস্থা। কোনো ভাষাই কোনো ভাষার চেয়ে কম বা বেশি বিকশিত নয়। ভাষিক আপেক্ষিকতাবাদের এই ধ্যান-ধারণাকেই বোয়াজ পরে সংস্কৃতির ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেন। নৃবিজ্ঞানের তাত্ত্বিক পরিসরে তর্ক তোলেন যে এক সংস্কৃতির মানদণ্ড দিয়ে অন্য সংস্কৃতি পাঠ করবার

চেষ্টা বৈজ্ঞানিক তো নয়ই, প্রকৃত প্রস্তাবে সেটা বর্ণবাদী জ্ঞান ব্যবস্থার জন্ম দেয়। বোয়াজের সাংস্কৃতিক আপেক্ষিকতার তত্ত্ব পরের যুগের নৃবিজ্ঞানের চিন্তার পাটাতনকে অনেকটুকু বদলে দিয়েছিলো। 'আদিম সমাজ' বা 'আদিম ভাষা' জাতীয় শব্দবন্ধই তখন নৃবিজ্ঞানের পরিসরে প্রশ্নবিদ্ধ হতে থাকে।

ভাষার মধ্যে প্রতিভাত মানুষের মননশীলতার সন্ধানে বোয়াজ অনুসন্ধান চালিয়েছেন আমেরিকার আদিবাসী ভাষার ব্যাকরণিক গঠন, শব্দ সম্ভার, এমনকি কবিতার মাঝেও। বোয়াজের এই পদ্ধতিই আসলে প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণের পাশাপাশি একটি সমাজ বা সংস্কৃতির ভাষিক উপাদানের সুশৃংখল বিশ্লেষণকে নৃবিজ্ঞানে গুরুতর করে তোলে। এই পদ্ধতিটা আরো বেশি বিকশিত হয় বোয়াজের সুযোগ্য শিষ্য অ্যাডোয়ার্ড সাপিরের হাতে। সাপির মনে করতেন, মানুষের সংস্কৃতি বা সমাজ পূর্ণতা পেয়েছে ভাষার মধ্য দিয়েই। কারণ সংস্কৃতিমাত্রই যৌথ জীবনের জিনিস। মানুষের যৌথ জীবন, সেটা সমাজ হোক কী সংস্কৃতি, সম্ভব করে তোলে ভাষাই। কাজেই পৃথিবীর সব সমাজের ভাষাই হচ্ছে আদি সাংস্কৃতিক ব্যবস্থা। সংস্কৃতির অধ্যয়ন কখনই ভাষাকে এড়িয়ে গিয়ে হতে পারে না। সাপিরের এই ধারণাকে আরো সমৃদ্ধ করেছেন তার ছাত্র বেঞ্জামিন লী হোর্ফ। পেশায় প্রকৌশলী হলেও হোর্ফেরও গভীর বুদ্ধিবৃত্তিক আগ্রহের জায়গাগুলোর একটা ছিলো ভাষা। সাপিরের সান্নিধ্যে একপর্যায়ে তিনি মনোনিবেশ করেন, হোপি ইন্ডিয়ানদের ভাষার পাঠে। বোয়াজের ধারার পরিপূরক হিসেবে তিনি হোপি ভাষার আলোচনায় উন্মোচন করতে চেয়েছেন ভাষার সাথে চিন্তার আন্তঃসম্পর্ককে। ভাষা আর চিন্তার সম্পর্ক নিয়ে নৃবিজ্ঞানে সাপির-হোর্ফের অনুকল্পটি ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে।

সাপির-হোর্ফ অনুকল্প ভাষা-নৃবিজ্ঞানই শুধু নয়, আধুনিক ভাষাতত্ত্বেও স্বীকৃত দুই দিকপালের নামে নাম রাখা হলেও উনাদের যৌথ কোনো লেখা নেই। আদতে এই অনুকল্প বোয়াজের ভাষিক বা সাংস্কৃতিক আপেক্ষিকতাবাদেরই সবচেয়ে পরিশীলিত রূপ। এই অনুকল্প ভাষিক আপেক্ষিকতা তত্ত্ব বা নিরূপণবাদ হিসেবেও

পরিচিত। এই তত্ত্বের মূল পাটাতন হচ্ছে, ভাষা ও চিন্তার সম্পর্ক নিয়ে গোড়ার কিছু অনুমান, যার ওপর দাঁড়িয়ে আধুনিক ভাষাতত্ত্ব এই সম্পর্ক নিয়ে ভাবে। এই অনুকল্পের প্রাথমিক অনুমান হচ্ছে মানুষের চিন্তা আসলে স্বাধীন নয়, ভাষার দ্বারা শাসিত। কারণ ভাষার মাধ্যমে চিন্তার যে সংগঠন ও বিন্যাস নির্ধারিত হয়, সেটা আসলে মানুষের যূথচৈতন্য বা জনমানসের তৈরি, ব্যক্তি মানুষের নয়। ভাষা দিয়ে চিন্তা করি মানে আমি আমার সমাজ বা ভাষাগোষ্ঠীর সাথে একটা প্রতীকী চিন্তন-ব্যবস্থা ভাগাভাগি করে ব্যবহার করি। ভাষা মাত্রই যূথচৈতন্যের জিনিস। একটি শব্দের অর্থ একটি ভাষার জনগোষ্ঠী যদি একরকম বা কাছাকাছি না বোঝে তাহলে ভাষা সম্ভব হয়ে উঠে না। ফলে ব্যক্তির চিন্তা আসলে ভাষিক ব্যবস্থার অধীন। ভাষার কারণেই ব্যক্তির চিন্তা আসলে সমষ্টির চিন্তার অধীন। অন্ততপক্ষে যেসব ঐতিহাসিক শর্তাবলী সমষ্টির চিন্তা বা ভাষাকে নিয়ন্ত্রণ করে, ব্যক্তির চিন্তা তার অধীন। আজকের সময়ে এই অনুমানটিকে অনেক ক্ষেত্রেই আপোস করতে হলেও ভাষিক বর্গগুলো যে মানুষের চিন্তাকে প্রভাবিত করে সেটা অস্বীকার করা যায় না। সাপির-হোর্ফ অনুকল্পের প্রভাব ভাষা-নৃবিজ্ঞানের সীমানা ছাড়িয়ে আরো বহু বিজ্ঞানকে প্রভাবিত করেছে। খেয়াল করলেই পরবর্তী সময়ে নোম চমস্কি, জাক দেরিদা, লেভি-স্ত্রাউসের ভাষা বা সংস্কৃতি চিন্তা, এমনকি গ্রামসি বা ফুকোর রাজনৈতিক ক্ষমতার তত্ত্বায়নেও ভাষা ও চিন্তার সম্পর্ক নিয়ে এই অনুমানকে ক্রিয়াশীল দেখতে পাই। আধুনিক সংস্কৃতি বা যোগাযোগবিদ্যা, রাজনৈতিক উপস্থাপনের ধ্যান-ধারণা, ক্ষমতাতন্ত্রের বিশ্লেষণ, জনসম্মতি উৎপাদন, আধিপত্য, হেগেমনি, সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া, শিক্ষাতত্ত্ব থেকে শুরু করে আধুনিক সমাজ ও মানববিদ্যাগুলোর আরো অনেক ধ্যান-ধারণার আলোচনাতেই ভাষা ও চিন্তা সম্পর্কিত এসব পূর্বানুমান প্রাসঙ্গিক ও গুরুত্বপূর্ণ।

আজকের সময়ে এসে ভাষা-নৃবিজ্ঞান মানুষের ভাষিক চর্চা আর অভ্যাসকে জানবার বিদ্যা। এই বিদ্যা ধরে নেয় যে ভাষা কোনো নিষ্ক্রিয় অস্তিত্ব না। বাস্তব জগতের প্রতীকী উপস্থাপনের মধ্য

দিয়ে সে প্রকৃতি আর মানুষের সম্পর্কসূত্র হিসেবে কাজ করে। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ভাষা সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য আর আন্তঃসম্পর্কের মৌলিক সূত্র। প্রতীকী ব্যবস্থা হিসেবে ভাষার ক্রিয়াশীলতা সংস্কৃতির আর সব উপাদানের সাথে জড়িত, আর সব সাংস্কৃতিক আচরণের সাথে সম্পর্কিত। একারণেই মানুষ যখন কথা বলে না, বা লেখে না, তখনও ভাষা ক্রিয়াশীল থাকে। কারণ চিন্তন ক্রিয়াও ভাষার অন্তর্গত একটি ক্রিয়া। মানুষের আচরণ বা যেকোনো কাজও ভাষার সাথে সম্পর্কিত, কারণ সেই কাজেরও নাম থাকে, অর্থ থাকে। ভাষা নৃবিজ্ঞান একারণেই মানুষের ভাষাতেই শুধু অর্থময়তা খোঁজে না, মানুষের নীরবতাকেও সে অর্থ সম্ভাবনার আওতায় রাখে। ভাষা-নৃবিজ্ঞানের শেষ বিচারে তাই খোদ সাংস্কৃতিক কাঠামোই একটা ভাষিক ব্যবস্থা হয়ে ওঠে।

ভাষা-নৃবিজ্ঞানের পরিসরে ভাষার আলোচনা আবর্তিত হয় সংস্কৃতিকে কেন্দ্র করে। শুধু ভাষা নৃবিজ্ঞানেই নয়, খোদ নৃবিজ্ঞানেই সংস্কৃতি একটা কেন্দ্রীয় প্রত্যয়। কিন্তু মানুষের সংস্কৃতির তুলনামূলক ও সামগ্রিক পাঠের যে প্রত্যয় ধ্রুপদী আর উপনিবেশিক নৃবিজ্ঞানে ছিলো, ভাষা-নৃবিজ্ঞান সেই সংস্কৃতি চিন্তাকে ভিন্ন জায়গায় টেনে নিয়ে গেছে। মানুষের অভিজ্ঞান, আচরণ আর বস্তুগত উপাদানের ব্যবহার কেন্দ্রীক সংস্কৃতির ধারণা থেকে আজকের নৃবিজ্ঞান অনেকটুকু সরে এসেছে। নৃবিজ্ঞানে সংস্কৃতি কথাটা এখন আরো অনেক সূক্ষ্ম বিচার-বিশ্লেষণ ও নৈতিক বিবেচনা সাপেক্ষে প্রয়োগ করা হয়। সংস্কৃতির সরলীকৃত ধারণা যে মানুষ ও মানুষের সম্পর্ক সূত্রের জটিল রূপকে রাজনৈতিকভাবে বিনির্মাণ করে ফেলতে পারে, এই সতর্কতা সমসাময়িক নৃবিজ্ঞানের রয়েছে। কারণ উপনিবেশিক যুগে সংস্কৃতির বিবর্তন ও ক্রিয়াবাদী ব্যাখ্যা ব্যবহৃত হয়েছে রাজনৈতিক অপরায়নের মাধ্যমে অসভ্য, আদিম, বর্বর, অনুন্নত, অপশ্চিমা ইত্যাদি তকমা দিয়ে পৃথিবীর সমস্ত সমাজকে বিবর্তনের সরলরেখায় দাঁড় করিয়ে দেওয়ার কাজে। পশ্চিমা সভ্যতা নিজেকে এই রৈখিক ইতিহাসের অগ্রদূত হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। এইটা পশ্চিমের বুদ্ধিবৃত্তিক তো বটেই, রাজনৈতিক ও সামরিক আধিপত্য জারি রাখবার মতাদর্শিক হাতিয়ার হয়ে উঠেছে।

আজকের নৃবিজ্ঞানে সংস্কৃতি চিন্তা তাই সংস্কৃতির রাজনৈতিক বিন্যাস নিয়েই বেশি মগ্ন। অধিপতি সংস্কৃতি যে বহুমাত্রিক কায়দায় অধঃস্তন সংস্কৃতিকে পরিবেশন করে, বিচার করে, এবং সর্বোপরি শাসন করে, সেই জটিল প্রক্রিয়াই সমসাময়িক নৃবিজ্ঞানীদের কাজের জায়গা হয়ে উঠছে ক্রমশ। ফলে নৃবিজ্ঞানের গবেষণা পদ্ধতি এখন আরো ক্রিটিকাল হয়ে উঠেছে খোদ নিজের প্রতিই। নৃবিজ্ঞানের ভাষাও আজ ভাষা-নৃবিজ্ঞানের বিচারের বিষয় কারণ এইসব বৈজ্ঞানিক কথকতা বা আলাপচারিতা আখেরে ক্ষমতাসীন সংস্কৃতির হাতে ক্ষমতাহীন সংস্কৃতির ঐতিহাসিক পরাজয়কে যৌক্তিকতা এনে দেয়, আধিপত্যের পক্ষে জনসম্মতি তৈরী করে। ফলে সংস্কৃতি চিন্তায় ক্ষমতাসম্পর্কের সাথে পদ্ধতিগতভাবে ভাষিক পরিসর খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে নৃবিজ্ঞানীদের কাছে। নৃবিজ্ঞানে চর্চিত সংস্কৃতি তত্ত্বগুলো আরো বেশি করে ভাষার সাপেক্ষে পুনর্বিন্যস্ত হতে থাকে। উদীয়মান এই সব সংস্কৃতি চিন্তা আর তার সাথে ভাষার সম্পর্কের একটা সারাংশ দিয়ে আলাপচারিতা আপাতত শেষ করতে চাই।

নৃবিজ্ঞানে সংস্কৃতি ধারণাটি দাঁড়িয়ে আছে মূলত প্রকৃতির ধারণার বিপরীতে। বস্তু আর শক্তি দিয়ে গড়া এই বিশ্ব নিখিলে মানুষই একমাত্র জীব যে স্বাধীন চিন্তা দিয়ে নিজের ইচ্ছা ও প্রয়োজন মাফিক প্রকৃতি জগতের রূপান্তর ঘটায়। যেমন মানুষই একমাত্র প্রাণী যে খাবার শুধু চয়নই করে না, উদ্ভিদ ও পশুজগতে উপনিবেশ বানিয়ে নিজেদের ইচ্ছামাফিক তাদের উৎপাদন ও পুনরুৎপাদন ঘটায়। একারণেই কৃষি বা পশুপালনই মানুষের সংস্কৃতির সূচনাবিন্দু। একটু খেয়াল করলেই আমাদের 'এগ্রিকালচার' শব্দটার মধ্যে 'কালচার' শব্দটার উপস্থিতি চোখে পড়ে। এই কারণেই আদিগন্ত বিস্তীর্ণ ধানখেতের দৃশ্য আসলে প্রাকৃতিক দৃশ্য নয়। সাংস্কৃতিক দৃশ্য। এই 'কালচার' শব্দটির ভাষা-প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ রয়ে গেছে বাংলা ভাষাতেও। বাংলা আর ইংরেজি একই ঐতিহাসিক গোত্রভুক্ত ভাষা ইন্দো-ইউরোপীয় হওয়ার কারণে। বাংলা ভাষায় আমরা পাই 'কুলাচার' শব্দটি, যার

ইংরেজি উত্তরাধিকারে স্বরচিহ্নের ব্যবহারটা আরো কৌতূহল উদ্দীপক। যা হোক, 'কূলাচার' মানে 'কোনো একটি নির্দিষ্ট মানব কূলের আচার'। এখানে আচার অর্থে পাঠক 'আচরণ'ও বুঝতে পারেন, আবার আমরা ঘরে যে আচার বানিয়ে খাই সেটা বুঝলেও খুব একটা ভুল হয় না। কারণ সংস্কৃতির একটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তা ঐতিহ্যগতভাবে সংরক্ষিত হয়, পরিবাহিত হয়ে এক প্রজন্মের কাছ থেকে আরেক প্রজন্মের কাছে যায়। ঘরের আচার যেভাবে খাদ্য সংরক্ষণেরই একটা কায়দা, যেভাবে এই আচার বানানোর জ্ঞান এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে পরিবাহিত হয় অনেকটা সেই রকম।

তো, এই 'কূলাচার' বা সংস্কৃতিকে বুঝবার সহজতম পদ্ধতি হচ্ছে একে প্রকৃতির বিপরীতে ব্যাখ্যা করা। সংস্কৃতি মানে যা কিছু প্রকৃতির কাজ-কারবার না, মানে যা কিছু মানুষের কাজ কারবার, সেটা। এই সংস্কৃতি সৃজনের ক্ষেত্রে প্রথম অনুঘটক হচ্ছে মানুষের কল্পনাশক্তি। যে কল্পনাশক্তি দিয়ে প্রথম কোনো মানুষ একটা গাছের মধ্যে যেভাবে টেবিল নামের একটা বস্তুর সম্ভাবনা দেখতে পেল সেই ধরনের কল্পনা শক্তি। তার পর মানুষের শ্রম প্রযুক্ত হয়ে সেই গাছটির রূপান্তর ঘটে। মানুষ সেটাকে কেটেকুটে একটা টেবিল বানিয়ে ফেলে। গাছটা ছিলো প্রকৃতি, কিন্তু টেবিল সংস্কৃতি। কিন্তু সংস্কৃতি সৃষ্টিকারী একমাত্র জীব হয়েও মানুষ নিজেও কিন্তু সেই প্রকৃতিরই অংশ। একারণেই সাংস্কৃতিক রূপান্তর সে শুধু প্রকৃতি জগতেই ঘটায় না, নিজের ওপরেও ঘটায়। যেমন যৌনতা মানুষের প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য। প্রকৃতির রাজ্যে মানুষের যৌনাচরণের আদিরূপ হিসেবে সাংস্কৃতিক বিবর্তনবাদ আমাদের সামনে অজাচারকে হাজির করে। প্রাকৃতিক অজাচারকে মানুষ এক সময় নিষিদ্ধ বা ট্যাবু ঘোষণা করেছিলো সংস্কৃতি সৃজনের তাগিদেই। যৌনাচারের সেই নিয়ম-কানুন মানুষের এই জৈবিক তাড়নাটিরও সাংস্কৃতিক রূপান্তর ঘটায়। বিয়ে ব্যবস্থা হচ্ছে সেই রূপান্তরের সবচেয়ে পরিশীলিত রূপ। কাজেই যৌনতা মানুষের প্রকৃতি হয়ে থাকলে বিয়ে ব্যবস্থা তার সংস্কৃতি। বিয়ে ব্যবস্থা যৌনতাকে নিয়মতান্ত্রিকতার ছকে ফেলে জটিল ও বিচিত্র সব সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্কেরও জন্ম দেয়।

ভাষা আর সংস্কৃতির সম্পর্কসূত্রের নৃবৈজ্ঞানিক আলোচনায় যৌনতা, অজাচার নিষেধাজ্ঞা, বিয়ে, আত্মীয়তার একটা বিশেষ ভূমিকা আছে। লেভি-স্ত্রাউস নামের একজন নৃবিজ্ঞানী বনে যাওয়া ভাষাবিদ, কাঠামোবাদী চিন্তার আদি সূত্রকার হিসেবে যিনি উভয় শাস্ত্রেই স্বীকৃত, তিনি প্রথম বলেন যে অজাচারের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে বিয়ে ব্যবস্থার আবির্ভাব এবং বিয়ে ব্যবস্থার ওপর ভর করে আত্মীয় সম্পর্কের যে জৈব জালের ওপর মানুষের আজকের সমাজ সৃষ্টি হয়েছিলো সেটা আসলে ভাষাকাঠামোর উদ্ভবের সাথে সম্পর্কিত[১২]। আত্মীয়তা সম্পর্কের অন্তর্লীন কাঠামো আসলে একটি বাক্যের এক পদের সাথে অন্য পদের যেই সম্পর্ক বা অন্বয়, সেই অন্তর্লীন ব্যাকরণিক কাঠামোর মতোই, একইভাবে ক্রিয়াশীল। অজাচার বা নিয়মহীন যৌনতার ওপর নিষেধাজ্ঞা বা নিয়ম-কানুন আসলে ভাষায় এক পদের সাথে আরেক পদের সম্পর্কের কাঠামোর মতোই। 'তুই যদি আসেন' জাতীয় বাক্যবন্ধ প্রথম পদের সাথে শেষ পদের সম্পর্ক বিভ্রাটের কারণেই বাংলা ভাষায় গ্রহণযোগ্য নয়। আবার সম্বোধন পদের ব্যবহারও এখানে বক্তার সাথে শ্রোতার সামাজিক সম্পর্কের সাথে নিয়মতান্ত্রিকতার সূত্রে আবদ্ধ। ফলে দেখা যাচ্ছে যে, মানুষের ভাষিক সত্তায় এই ধরনের কিছু নিয়ম-কানুন আছে যার ব্যত্যয় ঘটলে আমরা টের পাই। এইসব নিয়ম-কানুনই মানুষের অসীম সংখ্যক বাক্য তৈরী করবার সূত্র যাকে আমরা ব্যাকরণ বলি। সমাজের ক্ষেত্রেও প্রাকৃতিক যৌনতার ওপর বিয়ে ব্যবস্থার নিয়ম-কানুন আত্মস্থ করে সমাজের জৈব ভিত্তিকে অসীম বৈচিত্র্যে ভরে দিয়েছে। মানুষের সম্পর্কসূত্রকে জটিল থেকে জটিলতর করে তুলেছে। সমাজের জৈব ভিত্তির এই সাংস্কৃতিক পুনর্বিন্যাস অর্থনীতি, রাজনীতি, বা বুদ্ধিবৃত্তির মতন আর সব ব্যবস্থাকেও পুনর্বিন্যস্ত করেছে। ফলে ভাষার বিকাশের বিচার প্রকৃতির বিপরীতে মানুষের সমাজ বা সংস্কৃতির উদ্ভবকে এড়িয়ে গিয়ে করা সম্ভব নয়। লেভি-স্ত্রাউসের কাঠামোসূত্র আবির্ভূত হওয়ার পরে নৃবিজ্ঞান আর সে চেষ্টা করেও না।

---

[১২] Levi-Strauss, Claude 1963, *Structural Anthropology, Vol-1*, Penguin Books, London.

প্রকৃতি বনাম সংস্কৃতির জোড়-বিপরীত ধারণা দিয়ে মানবসত্তাকে বুঝবার দার্শনিক ঐতিহ্য আসলে আরো অনেক পুরনো এবং পৃথিবীর প্রায় সব দার্শনিক ঐতিহ্যেই এর স্বাক্ষর রয়েছে। বাংলার ভাবান্দোলনে এই সম্পর্কসূত্রকেই আমরা আলোচিত হতে দেখি পুরুষ-প্রকৃতি তত্ত্ব আকারে। পুরুষই এখানে রূপক অর্থে সংস্কৃতি হয়ে ওঠে। নারীবাদী নৃবিজ্ঞানে এই পুরুষ-প্রকৃতি বিভাজনের প্রতিফলন আমরা দেখি শেরী অর্টনারের রচনায়। মার্কিন নৃবিজ্ঞানে এই দ্বৈততার ধারণা নিয়ে এসেছিলেন ফ্রাঞ্জ বোয়াজই, আগেই বলেছি তিনি ভাষিক নৃবিজ্ঞানের আদি প্রবর্তকদের একজন। বোয়াজ অনুপ্রাণিত ছিলেন ধ্রুপদী জার্মান দর্শনে, জন্মসূত্রে যিনি নিজেও একজন জার্মানও বটে। জার্মান দার্শনিকদের ঐতিহ্যে প্রকৃতি বনাম সংস্কৃতির ধারণা মানবসত্তার স্বরূপ চিন্তার একটা মৌলিক পদ্ধতি ছিলো। ইমানুয়েল কান্টের নৃতাত্ত্বিক চিন্তায় আমরা এই নিদর্শন পাই। কান্ট মনেই করতেন, নৃতত্ত্ব হচ্ছে মানুষ নিজের স্বাধীন (প্রকৃতি নিয়ন্ত্রিত নয়) সত্তার তাগিদে যা কিছু করে তার অধ্যয়ন।[১৩] প্রাকৃতিক নিয়ম মানুষের জৈবসত্তাকে নিয়ন্ত্রণ করে কিন্তু তার মানসসত্তা স্বাধীন। সংস্কৃতির বীজ তার এই স্বাধীনসত্তাতেই। এই স্বাধীনতাই মানবীয়তা।

একটু খেয়াল করলেই আমরা দেখতে পাই মানুষের স্বাধীনসত্তার আদি উপস্থিতি আমাদের ভাষাতেই। ভাষাতেই গাঁথা আছে মানুষের স্বেচ্ছাচারী স্বাধীনতার সূত্র। যেভাবে মানুষ প্রতীকে স্বেচ্ছাচারী অর্থ আরোপ করে ভাষা তৈরি করে, তেমনি প্রকৃতির বিপরীতে অজস্র স্বেচ্ছাচারী প্রতিরূপান্তর ঘটিয়ে সংস্কৃতি সৃজন করে। হেগেল মনে করতেন, সংস্কৃতি মানুষের জৈবিক বা প্রাকৃতিক সত্তা থেকে ক্রমাগত নিষ্ক্রমণ বা বেরিয়ে যাওয়ার প্রক্রিয়ার নাম।[১৪] মানুষ প্রাণী জগতের মাঝে অনন্য, কারণ শুধু একারণেই নয় যে সে

---

১৩ Kant, Immanuel 1798, *Anthropology from a Pragmatic Point of View*, Cambridge University Press, Cambridge.

১৪ Hegel, George W F 1967, *The Phenomenology of Mind*, Harper & Row, New York.

নিজের প্রাকৃতিক তাড়নাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। এই কারণেও যে নিজ প্রাকৃতিক সত্তার ব্যক্তিক সীমা ছাড়িয়ে সে সমাজবদ্ধ যৌথ জীবনের অংশীদার হতে পারে, আরো সুসংঠিত সত্তা হয়ে উঠতে পারে। সেই অর্থে সংস্কৃতি মানুষে মানুষে সম্পর্কেরও আদিসূত্র, সেই অর্থে ভাষাও। সেই অর্থে সংস্কৃতি মানে আত্মজ্ঞান, সংস্কৃতি মানে অপরজ্ঞান। আর এই সমস্ত জ্ঞানেরই আদিভিত্তি হচ্ছে ভাষা।

ভাষা শুধু প্রকৃতির রূপান্তর ঘটিয়ে সংস্কৃতি সৃজনের আদিসূত্রই না, প্রকৃতিকে প্রতীকী বিন্যাসে ঢেলে সাজিয়ে, নামকরণ করে, মানুষের অসীম চিন্তাশক্তির আওতায়ও নিয়ে আসে। মেঘে যে বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকে, বৃষ্টি যে আমাদের জল দেয় এই পুরো জ্ঞানটাই মানুষ 'জলদ' শব্দটাতে পুরে রাখতে পারে। পালিত পশুর শক্তিকে যে কৃষি বা অন্য কাজে ব্যবহার করা যায়, পশু থেকে যে বল পাওয়া যায়, এই পুরো সাংস্কৃতিক জ্ঞানটা মানুষ পুরে রাখতে পারে 'বলদ' শব্দটাতে। ভাষার মাধ্যমে প্রকৃতির প্রতীকী বিন্যাস মানুষের জ্ঞানকে কুঞ্চিত করে তার চিন্তাশক্তিকে অসীম করে তুলেছে। ভাষা এই অর্থে শুধু সংস্কৃতি সৃজনকেই সম্ভব করে তোলেনি, সাংস্কৃতিক জ্ঞানের আশ্রয়ও হয়ে উঠেছে। ভাষার মধ্য দিয়েই সাংস্কৃতিক জ্ঞান এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে পরিবাহিত হয়, টিকে থাকে, 'কূল-আচার' হয়ে থাকে। সংস্কৃতির কারবারে ভাষা তাই নৃবিজ্ঞানীদের জন্য এক অমূল্য সূত্র।

ভাষার মধ্য দিয়ে সংস্কৃতি যেহেতু পরিবাহিত হয় এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে, সংস্কৃতি একটা জ্ঞান ব্যবস্থাও বটে। একটা নবজাতক শিশু আসলে প্রকৃতি। ক্রমাগত সাংস্কৃতিক জ্ঞান অর্জনের মধ্য দিয়েই সে ক্রমাগত সাংস্কৃতিক মানুষ হয়ে উঠতে থাকে। এই সাংস্কৃতিক জ্ঞান মানে সব জিনিসের বৈশিষ্ট্য বা গুণাবলি সম্পর্কিত জ্ঞান বা প্রস্তাবনা আত্মস্থ করাই নয়, একই সাথে সমাজের অন্য মানুষদের সাথে একটা চিন্তা করবার ছক মিলিয়ে নেওয়াও বটে। আগেই বলেছি সংস্কৃতির একটা বড় অংশ প্রকৃতির বস্তুগত রূপান্তরে প্রতিভাত হলেও সংস্কৃতির গোড়া আসলে সেই রূপান্তরের পেছনে যে চিন্তা সেইটা। ফলে ভাষার মতোই, সংস্কৃতি

আসলে বস্তুগত বাস্তবতা নয়, মনোজাগতিক বাস্তবতা। এই মনোজাগতিক বাস্তবতা আবার শুধু ব্যক্তি মানুষের মনোজগতের ওপর নির্ভর করে না। নির্ভর করে সমষ্টিগত জ্ঞানের ওপর। ভাষা নৃবিজ্ঞানে এই জ্ঞান ব্যবস্থার দুইটা অংশ চিহ্নিত করা হয়। একটা হচ্ছে প্রস্তাবনাজনিত জ্ঞান, আরেকটা হচ্ছে প্রক্রিয়াজনিত জ্ঞান। প্রস্তাবনাজনিত জ্ঞান আসলে নামকেন্দ্রিক। 'পলাশ একটি ভালো ছেলে' এই বাক্যটিতে অনেকগুলো প্রস্তাবনা আছে। তিনি জন্মানোর পরে কেউ একজন 'প্রস্তাব' করেছিলেন যে, তার নাম পলাশ রাখা হোক। তারও আগে কোনো এক ঐতিহাসিককালে বাংলাভাষী মানুষেরা একটি বিশেষ ফুলকে যে পলাশ নামে ডাকা হবে সেই প্রস্তাবে সম্মত হয়েছিলেন। পলাশের মতন শারীরিক বৈশিষ্ট্য ও বয়সের মানুষদের যে 'ছেলে' বলা হবে সেই প্রস্তাবে সম্মত হয়েছিলেন। এবং সর্বোপরি পুরো বাক্যটি দিয়ে এর বক্তা পলাশের গুণাবলি সম্পর্কে একটা প্রস্তাবনা পেশ করছেন শ্রোতার কাছে 'ভালো' শব্দটি ব্যবহার করে। দ্বিতীয় অংশটি, প্রক্রিয়াজনিত জ্ঞান আসলে মানুষের কাজ বা তৎপরতা সংক্রান্ত, অ্যাকশন সংক্রান্ত জ্ঞান। 'আমি গাড়ি চালাতে পারি' মানে আমার একটা চলমান গাড়িকে কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হয় সেই জ্ঞান তো আছেই, সাথে গাড়ির কোন যন্ত্রাংশটি কোন কাজ করে থেকে শুরু করে রাস্তার ট্রাফিক আইন পর্যন্ত আমি জানি। জ্ঞানের এই অংশটি বাক্যে পদের সাথে পদের সম্পর্কের ওপর নির্ভর করে। যেমন গাড়ি চালানো ব্যাপারটা ব্রেক, গিয়ার আর স্টিয়ারিং এর সম্পর্কের ওপর নির্ভর করে। বাক্যের ক্ষেত্রে সম্পর্কের বিপত্তি ঘটলে অর্থ বিপত্তি ঘটে, আর গাড়ির ক্ষেত্রে অ্যাকসিডেন্ট।

দেখা যাচ্ছে সংস্কৃতি আর ভাষা, দুইটাই একটা অভিন্ন জ্ঞান-ব্যবস্থার অবিচ্ছেদ্য অংশ। কোনো সংস্কৃতিকে আদ্যপান্ত জানা, তার অন্তর্লীন কাঠামো দিয়ে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ যেহেতু নৃবিজ্ঞানীর কাজ, নৃবিজ্ঞানীর কাছে একটি সংস্কৃতিকে জানা মানে তার ভাষাকে জানা। সংস্কৃতিকে বর্ণনা করা মানে তার ভাষাকেও বর্ণনা করা। কাজেই নৃবৈজ্ঞানিক রচনা মানে সাংস্কৃতিক ব্যাকরণের বর্ণনা।

ব্যাকরণ মানে ভাষায় যেমন পদের সাথে পদের সম্পর্কসূত্র, সংস্কৃতির ব্যাকরণ মানে মানুষের সাথে মানুষের, চিন্তার সাথে চিন্তার সম্পর্কসূত্র। কাজেই জ্ঞান-ব্যবস্থা হিসেবে সংস্কৃতি সামাজিকভাবে বিন্যস্ত। মানে একটা অভিন্ন জ্ঞান-ব্যবস্থায় ভাষার মধ্য দিয়ে যুক্ত থাকাটাই মানুষের সামাজিক যুথবন্ধতা। প্রাত্যহিক জীবনে মানুষে মানুষে মিথষ্ক্রিয়া মানেই এই জ্ঞান-ব্যবস্থারই একটা যোগাযোগ ব্যবস্থা হয়ে ওঠা। সেকারণেই বলা যায়, সংস্কৃতি মানে একটা যোগাযোগ ব্যবস্থাও বটে। বিষয়টার আরেকটু বিস্তার দরকার।

সংস্কৃতিকে একটা যোগাযোগ ব্যবস্থা বলা মানে একে ভাষার মতোই একটা চিহ্ন বা প্রতীকী ব্যবস্থা হিসেবে দেখা। সংস্কৃতিতত্ত্বে এই পদ্ধতির নাম সেমিওটিক পদ্ধতি বা চিহ্নবিদ্যা। এই পদ্ধতিতে সংস্কৃতি বলতে বাস্তব জগতের একধরনের উপস্থাপন বা রেপ্রিজেন্টেশন বোঝায়। মানে বাস্তব জগতকে মানুষ লিখিত বা কথ্য সাহিত্য, মিথ, সংবাদ, চিত্রকলা, এমনকি হালে চলচ্চিত্রেও যেভাবে চিহ্ন, রূপক বা প্রতীক দিয়ে হাজির করে, সেই পরাবাস্তবিক জগতটাই আসলে সংস্কৃতির জগৎ। আগেই বলেছি, এই পরাবাস্তবতা দিয়েই মানুষ প্রকৃতি জগতকে সংস্কৃতি জগতে আত্মস্থ করে নেয়। প্রতীক বা চিহ্ন যে মানুষের সমাজ সংগঠনের কতটা মৌলিক জিনিস সেটা আমরা ধর্ম থেকে শুরু করে জাতীয়তাবাদ পর্যন্ত প্রতীক, চিহ্ন বা নিশানের ব্যবহার দেখলেই টের পাই। নামকরণের মধ্য দিয়ে ব্যক্তি মানুষ যেমন একটা প্রতীকে প্রতিনিধিত্বশীল হয়ে ওঠে, মানুষে মানুষে সম্পর্কেরও নানা নাম রেখে মানুষ সামাজিক যৌথতার প্রতীকী উদযাপন করে। কিন্তু প্রতীক বা চিহ্নমাত্রই তো যোগাযোগের ফসল। প্রতীক তখনই প্রতীক হয়ে উঠে, যখন তার অর্থ নিয়ে একটা সামাজিক ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত হয়। যোগাযোগ ছাড়া তো সেই চিহ্নতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। তার মানে সংস্কৃতি যদি একটা চিহ্ন ব্যবস্থা হয়ে থাকে তো সেটা একটা যোগাযোগ ব্যবস্থাও বটে।

সংস্কৃতির এই যোগবলে বলিয়ান হওয়ার নেপথ্যেও আছে ভাষার প্রদত্ত বর। লেভি-স্ত্রাউস যেমন মানুষে মানুষে সম্পর্কের

আদলের মধ্যে ভাষার ব্যাকরণিক আদল দেখতে পেয়েছিলেন, তেমনি সংস্কৃতির এই যোগবলও প্রথম নজরে পড়ে তারই। ভাষা যেমন আমাদের সামনে অনুপস্থিত বাস্তবতাকে একটি পরাবাস্তবিক মাধ্যমে হাজির করতে পারে, তেমনি সংস্কৃতিও একটা চিহ্নব্যবস্থার মধ্য দিয়ে পরাবাস্তবতা তৈরি করে পরিবাহিত হয়। পৌরাণিক কথকতা, যেমন রামায়ণ বা মহাভারতে দেখতে পাই যে দেবতারা 'যোগবলে' নিমিষেই এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় হাজির হতে পারেন। পুরানের এইসব কথকতাকে কিন্তু স্রেফ কল্পনা বলে উড়িয়ে দেয়ার উপায় নাই। কারণ আজকে যোগাযোগ প্রযুক্তির উৎকর্ষ মানুষকে নিমিষেই এক মহাদেশ থেকে আরেক মহাদেশে 'যোগবলে' হাজির হওয়ার ক্ষমতা এনে দিয়েছে, হোক না সেটা স্কাইপি বা টেলিভিশনের ভার্চুয়াল বাস্তবতা। সংস্কৃতি বা ভাষারও আসল বল বা শক্তি অন্তর্নিহিত আছে এই ধরনের পরাবাস্তবতা নির্মাণের ক্ষমতার ওপর, যোগবলের ওপর।

সংস্কৃতিকে একটা যোগাযোগ ব্যবস্থা হিসেবে দেখবার বুদ্ধিটা আসলে লেভি-স্ত্রাউস পেয়েছিলেন রাশান ভাষাচিন্তক রোমান জ্যাকবসনের কাছ থেকে। নৃবিজ্ঞানে লেভি-স্ত্রাউস খ্যাত হচ্ছে মানুষের চিন্তার একটা শাশ্বত কাঠামো হিসেবে দ্বৈত-বৈপরীত্য বা বাইনারি অপজিশনের ধারণার জন্য। এর আগে বলেছিলাম যে, একটা জ্ঞান ব্যবস্থা হিসেবে ভাষা শব্দের মধ্যে বিস্তৃত জ্ঞান কুঞ্চিত করে রাখে নানা প্রকরণ আকারে আর ব্যাকরণের কাঠামো দিয়ে সেই জ্ঞানকে প্রয়োগ করবার ক্ষমতা দেয় মানুষকে। আমরা যে কারণে অন্যের কথা বুঝতে পারি সেটা আমাদের প্রাকরণিক সামর্থ্য আর যে কারণে কথা বলতে পারি, সেটা আমাদের ভাষিক জ্ঞানের প্রায়োগিক সামর্থ্য। এই দুই সামর্থ্য মিলিয়েই আমাদের চিন্তাশক্তি। লেভি-স্ত্রাউসের প্রস্তাব হচ্ছে মানুষের চিন্তাশক্তি আসলে দুনিয়ার সব জায়গাতেই সমান। সব জায়গার মানুষের চিন্তাতেই একটা দ্বৈত-বিপরীত যুক্তিকাঠামো বুনিয়াদ হিসেবে কাজ করে। 'ভালো' কথাটার মধ্যে জোড় হিসেবে 'খারাপ' কথাটা লুকিয়ে আছে, কারণ সেটাই 'ভালো' এর দ্বৈত-বিপরীত জোড়। একারণেই ভাষার প্রায় সব শব্দকেই বিপরীতার্থক ছকে সাজিয়ে ফেলা যায়। একারণেই

আমরা একসাথে অনেক শব্দ তাদের অন্তর্নিহিত গুণ ও জ্ঞানসহ মনে রাখতে পারি, প্রয়োজনে ব্যবহার করতে পারি। লেভি স্ত্রাউসের এই তত্ত্বের রাজনৈতিক গুরুত্ব অপরিসীম। কারণ এই যুক্তিতেই পৃথিবীর কোন জনগোষ্ঠীর মানুষকে কোনটির চেয়ে উচ্চতর বা নিম্নতর মনে করবার যুক্তিগুলো খারিজ হয়ে যায়। বলা যায় যে বাইনারি কোড দিয়ে যে আধুনিক মানুষটি নিউ ইয়র্ক শহরে বসে গাণিতিক পদ্ধতিতে কম্পিউটার সফটওয়্যার তৈরি করে আর আমাজনের জঙ্গলে বসে যে মানুষটি দিনের শিকার শেষে চাঁদ আর সূর্যের আত্মীয়তা নিয়ে গল্প শোনে বা শোনায়, তাদের কারো চিন্তাশক্তিই কারো চেয়ে কম নয়। তফাৎটা হচ্ছে বাস্তব প্রয়োজনে প্রযুক্তিগত উৎকর্ষের। বিবর্তনবাদী নৃবিজ্ঞান মানবজাতির একরৈখিক বিকাশের ধারণা দিয়ে বর্ণবাদী বিভাজনকে বৈজ্ঞানিক যুক্তি যুগিয়েছিলো। বিপরীতে লেভি-স্ত্রাউসের কাঠামোবাদ মানুষে মানুষে সাম্যের ধারণাকে বৈজ্ঞানিক যুক্তি যুগিয়েছে। মানবসত্তার বৈজ্ঞানিক আলোচনায় সাম্যের প্রশ্নটিকে নিয়ে এসেছে।

দ্বৈত-বিপরীতের ধারণা মানুষের চিন্তা কাঠামোর কতটা বুনিয়াদি বিষয় সেটা আমরা ইতিমধ্যে এই রচনাতেই টের পেয়েছি। ভাষা আর সংস্কৃতির আলোচনা আমরা শুরুই করেছি প্রকৃতির বিপরীত একটা ধারণা হিসেবে। রোমান জ্যাকবসন প্রথম এই বাইনারিটি দেখতে পেয়েছিলেন ভাষার ধ্বনি-কাঠামোর ক্ষেত্রে।[১৫] জ্যাকবসন দেখছেন যে শিশুরা ভাষা আয়ত্ব করে প্রথমত স্বরধ্বনি আর ব্যঞ্জনধ্বনির বৈপরীত্য আবিষ্কার করে। আবার এই দুই ধরনের ধ্বনির মধ্যে পরস্পর বিপরীত জোড় তৈরি করে। যেমন খেয়াল করলে দেখা যায়, বাংলা ব্যঞ্জনধ্বনিগুলো বৃহদাংশে ঘোষ ও অঘোষ জোড়ে সাজানো (ক/খ, গ/ঘ, চ/ছ)। স্বরধ্বনিগুলোও উচ্চারণের নৈকট্য বিচারে জোড়ায় জোড়ায় সাজানো (অ/আ, ই/ঈ, এ/ঐ)। এই ধরনের জোড়গুলো আবার সবচেয়ে বিপরীত বৈশিষ্ট্যের তিনটি ধ্বনি নিয়ে একটা ত্রিবেণীসঙ্গমে লিপ্ত যা আরো অনেক মধ্যবর্তী ধ্বনি তৈরি করে। যেমন বাংলা স্বরধ্বনি 'আ' 'উ' 'ই' এর

১৫ Duranti, Alessandro 1997, *Linguistic Anthropology*, Cambridge University Press, Cambridge.

ত্রিবেণীসঙ্গমেই আমরা 'ৗ' বা 'ে' ধ্বনিকে পাই। জ্যাকবসন এই ত্রিবেণীসঙ্গমকে বলতেন স্বর-ত্রিভুজ।

জ্যাকবসনের এই পদ্ধতি লেভি-স্ট্রাউস ব্যবহার করেন প্রকৃতির সাংস্কৃতিক রূপান্তর প্রক্রিয়ার ব্যাখ্যায়। জ্যাকবসনের স্বর-ত্রিভুজকে তিনি ব্যাখ্যা করেন খাবারের প্রকৃতি থেকে সংস্কৃতি হয়ে উঠবার প্রক্রিয়াকে উপমা করে। নাম দেন রন্ধন-ত্রিভুজ। খাবারকে কেন্দ্র করে মানুষের জীবনে খাবারের রূপান্তর প্রক্রিয়ায় তিনটা দ্বৈত-বিপরীত জোড় মিলে একটা ত্রিবেণীসঙ্গম প্রক্রিয়া কাজ করে। খাবার কাঁচা থেকে সেদ্ধ হতে পারে, কাঁচা থেকে পচেও যেতে পারে, আবার সেদ্ধ থেকেও পচে যেতে পারে। এখানে কাঁচা আবার প্রকৃতি ও সংস্কৃতির মাঝামাঝি কারণ কাঁচা জিনিসও মানুষের খাবার হতে পারে। খাবার কাঁচা থেকে পচে যাওয়া একটা প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া, কিন্তু কাঁচা থেকে রান্না হওয়াটা একটা সাংস্কৃতিক প্রক্রিয়া কারণ তা মানুষের হাতে ঘটে। আবার সেদ্ধ খাবার পচে যাওয়া মানে সংস্কৃতির আবার প্রকৃতিতে রূপান্তরিত হওয়া। কাজেই এই ত্রিভুজে আমরা আরো দুইটা বাইনারি ক্রিয়াশীল দেখতে পাই। একটা হচ্ছে প্রকৃতি বনাম সংস্কৃতির লীলা, কাঁচা খাবারের সেদ্ধ হয়ে যাওয়ার মতন। আরেকটা হচ্ছে মানুষের ক্রিয়াকলাপের হেরফেরের কারণে কাঁচা অবস্থাতেই খাবার হয়ে ওঠা। দেখা যায় যে, এই ধরনের দ্বৈত-বিপরীত কাঠামোর ত্রিবেণী দেখা যায় পৃথিবীর সব সংস্কৃতির গড়নেই। এমনকি ঐতিহাসিকভাবে সম্পর্কহীন সমাজগুলোর মধ্যেও এই সাদৃশ্য রয়েছে। একারণেই দ্বৈত-বিপরীত পদ্ধতিকে লেভি-স্ট্রাউস মানুষের চিন্তার শাশ্বত গড়ন হিসেবে দাবি করেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, ভাষা বা চিন্তা আসলে স্বয়ম্ভূসত্তা। মানে মানুষ চিন্তাভাবনা করে না, চিন্তা মানুষের মধ্য দিয়ে ভাবিত হয়। আদি সমাজের মানুষেরা মিথ বানাতেন না, মিথ মানুষের মধ্য দিয়ে যোগশক্তি লাভ করত। সেই বিচারে কবিরা কবিতা লেখেন না, কবিতা লিখিত হওয়ার জন্য কবি খুঁজে নেয়। গল্পকার গল্প লেখেন না, গল্প কথিত হওয়ার জন্য গল্পকার খুঁজে নেয়। কারণ

চিন্তা মাত্রই যোগবলে যৌথ হয়ে উঠতে চায়। দুনিয়ার কবি-সাহিত্যিকদের কাছ থেকে এবিষয়ে বহু সাক্ষ্য আর স্বীকারোক্তি আমরা পাই। লেভি-স্ত্রাউস উপনিবেশিক নৃবিজ্ঞানের আদিকল্প সংকট থেকে নৃবিজ্ঞানকে অনেকখানি উদ্ধার করেন। এই ভাষিক কাঠামোবাদ নৃবিজ্ঞানের সেতু বন্ধন ঘটায় সাহিত্য ও সংস্কৃতিবিদ্যার সাথে।

উপসংহার

বস্তু আর শক্তি দিয়ে গড়া এই বিশ্ব-নিখিল। এই দুই আদ্য জিনিস মিলিয়েই প্রকৃতি জগৎ। আর সবকিছুই হচ্ছে রূপ। আমরা প্রকৃতিতে যত জীব আর জড় দেখতে পাই, আধুনিক বিজ্ঞান বলে, এই সবকিছুই বস্তু আর শক্তির বৈচিত্র্যময় সব বিন্যাসের ফলাফল। এই বিন্যাস প্রকৃতির লীলা। প্রকৃতির লীলাময় খেয়ালে বন্দী বক্ষাণ্ডে একমাত্র স্বাধীন সত্তা হচ্ছে মানুষ। কারণ সে নিজে প্রকৃতির জীব হলেও নিজের স্বাধীন চিন্তা দিয়ে, শ্রম দিয়ে, প্রকৃতির বিন্যাসকে বদলে দেয়। এটাই মানুষের মৌলিক প্রজাতিগত প্রতিভা। মানুষের এই প্রতিভা, তার চিন্তাশক্তি আসলে ভাষার শক্তি। মানুষের এই ভাষিকসত্তা বস্তু বা শক্তি দিয়ে তৈরি নয়। এটার বীজ রয়েছে তার স্বাধীন সৃজনশীলতায়। তার কল্পনা শক্তিতে, প্রতীকের মধ্যে অর্থ স্থাপনের কল্পনা প্রতিভায়, প্রতীকের সাথে প্রতীকের মালা গেঁথে নিজের চিন্তাকে সমাজবদ্ধ যৌথতার মধ্যে উদযাপনের সামর্থ্যের মধ্যে। এই সেই প্রতিভা যার কারণে মানুষ নিজের চেনা জগতের সবকিছুকেই একটা প্রতীকী অর্থে বন্দী করে একটা অভিধানে ভরে রেখে দিতে পারে। ভাষা দিয়েই মানুষ সৃষ্টিজগতকে নিজের চিন্তার ছকে সাজিয়ে নিতে পারে, জীব ও জড়ের বৈচিত্র্যকে বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে শ্রেণিকরণ করে নিজের চিন্তা ক্ষমতাকে বহুগুণ বাড়িয়ে নিতে পারে। ভাষা দিয়েই মানুষ নিজের জ্ঞান আর অভিজ্ঞতাকে অমর করে রাখতে পারে। সুতরাং, ভাষাই যে মানবসত্তার আদি উপাদান, এই প্রস্তাবনা মেনে নিয়েই নৃবিজ্ঞান সংস্কৃতি নিয়ে ভাবে, মানুষ নিয়ে ভাবে।

০৭ নভেম্বর ২০১৪
সিরাজী ভবন, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

গুম-খুন-আতঙ্ক
শাসনপ্রণালী ও হত্যার কথকতা

একটু গোড়ার আলোচনা দিয়ে শুরু করি। আমি নিজে অন্য অনেক কিছুর সঙ্গে একজন অ্যানথ্রোপলজিস্টও। অ্যানথ্রোপলজি পড়াই, পড়ি এবং বয়সের অর্ধেক সময় ধরে ভাবনা-চিন্তার অংশ হয়ে আছে অ্যানথ্রোপলজি। ফলে, যখন চিন্তা-ভাবনা করি তখন অ্যানথ্রোপলজিকে এড়িয়ে যাওয়া খুব মুশকিল হয়। আজকে যে বিষয় নিয়ে আমি বলতে চাই, তা নিয়ে কথা বলা, ভাবনা-চিন্তা অনেক কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে, এমনকি একরকম বিপদজনকও। আজকে যারা এসব নিয়ে কার্যকর ভাবনা-চিন্তা করবেন, প্রকাশ্যে বলবেন, দেশ উদ্ধারের কথা ভাববেন, তাদেরও লাশ হিসেবে উদ্ধার হয়ে যাবার একটা আশঙ্কা আছে—পরিস্থিতিটা কাছাকাছি এরকমই।

এরকম পরিস্থিতিতে যখন চিন্তা করতে হয়, সেটা তখন একটা সাধারণ ক্রিয়ার চেয়েও বেশি কিছু হয়ে ওঠে। সিনসিয়ারলি চিন্তা করা, অনেস্টলি চিন্তা করা আসলে একটা অ্যাকশন, সামটাইমস একটা পিওরলি পলিটিক্যাল অ্যাকশন। তো সেই অ্যাকশনের শুরুতেই এতো কিছুর মধ্যে থেকে আমরা শুধু হত্যাকে বেছে নিই। নৃবিজ্ঞানের অনেক সংজ্ঞার মধ্যে একটি হচ্ছে, মানুষের প্রজাতি ও প্রকৃতিজনিত কলাক্রিয়ার অংশ হিসেবে মানবীয়তার সংজ্ঞা

বিনির্মাণের বিজ্ঞান এইটি। মার্ডার বা কিলিং, বা হত্যা, এটা নিয়ে একজন অ্যানথ্রোপলজিস্ট সবচে আগে যে প্রশ্নটা তুলবেন সেটা হচ্ছে, হত্যা মানবীয় বিষয় কি না বা মানবীয়তার অংশ কি না? হত্যা কী মানুষের অবশ্যম্ভাবী কার্যকলাপ? এটা কি প্রাকৃতিক নাকি একটা অর্জিত সামাজিক বা সাংস্কৃতিক ব্যাপার? হত্যা কী প্রাকৃতিক একটা বিষয়? মানুষ মাত্রই কি সমাজে সব সময় শাশ্বতভাবে একই প্রজাতির এক সদস্য আরেক সদস্যকে খুন করে, মেরে ফেলে? আপাতদৃষ্টিতে খুব সহজ এবং শিশুসুলভ প্রশ্ন মনে হচ্ছে। কিন্তু এর উত্তর খুঁজবার জন্য নৃবিজ্ঞানী হয়তো প্রথমেই জানতে চাইবেন, মানুষ যে মানুষকে খুন করে এটা অন্য কোনো প্রজাতির মধ্যে দেখা যায় কিনা? অন্য কোনো প্রজাতি কি একই প্রজাতির আরেক সদস্যকে হত্যা করে? এই অনুমানটার ওপর নির্ভর করে আছে আজকে হত্যা সম্পর্কে প্রচলিত সব ধ্যান-ধারণার বিচার। হত্যার বৈধতা এবং অবৈধতা এই অনুমানটার ওপর নির্ভর করে টিকে আছে যে মানুষের প্রকৃতিটা কী? এটা কি মানব প্রকৃতির অংশ? আমরা যে হত্যা করে ফেলি আমাদের প্রজাতিরই অন্য সদস্যকে, এটা কি মানবিক? এটা কি প্রাকৃতিক কোনো সত্য?

কী মনে হয় আপনাদের? মানে আমাদের হাতে কী আছে? ইতিহাস ঘেটে এটা দেখবার উপায় আমাদের হাতে খুব বেশি নেই। এটা ইতিহাসের এমন একটা স্তরের ব্যাপার যে স্তরের সংস্কৃতির বৈজ্ঞানিক নিদর্শন বা প্রমাণ খুব একটা পাওয়া যায় না। আমরা যদি ধরে নিই, প্রাকৃতিকভাবে ইতিহাসে সবসময় হত্যা জিনিসটা ছিলো না, তাহলে কবে থেকে এটা শুরু হলো সেটা জানতে আমাদের ইতিহাসে এতদূর ট্রাভেল করতে হবে, যেখানে আসলে ঐতিহাসিক প্রমাণ-টমান বলে স্বীকৃত কিছু নেই। তাহলে উপায় কী? ইতিহাস নিয়ে যেসব কথাবার্তা চালু আছে, তাতে এটুকু স্বীকৃত যে ইতিহাসের আগেও মানুষের ইতিহাস ছিল। অর্থাৎ ইতিহাসের আগেও ইতিহাস ছিল পৌরাণিকতায় আবদ্ধ হয়ে। সেই পৌরাণিক যুগে আমরা কীভাবে দেখছি হত্যার বিষয়টিকে? পূরাণ আমাদের কী জানায় এ নিয়ে?

আমরা যারা ইসলামিক মিথলোজি বা ইসলামিক পুরাণ অথবা কোরআনের সাথে, বা সেমেটিক ধর্মের ঐতিহ্যের সাথে পরিচিত, তারা জানি যে সেখানেও মানুষের উৎস আর ইতিহাস সম্পর্কে একটা বয়ান আছে। সেখানে কোনো প্রশ্নই সমাধানের বাইরে না। সেখানে হত্যা কীভাবে শুরু হলো তার একটা ব্যাখ্যাও আছে। আদি মানব আদম, আদি অপরাধ অর্থাৎ অরিজিনাল সিন, জ্ঞানবৃক্ষের ফল গন্ধম খাওয়ার ফলে স্বর্গচ্যুত হলেন, হয়ে পৃথিবীতে আসলেন। পৃথিবীতে মানবজাতির শুরু হলো। আদম আর হাওয়ার প্রথম দুই পুত্রসন্তানের নাম ছিল—কাবিল আর হাবিল, বাইবেলে যাদের পাওয়া যায় কেইন এন্ড আবেল নামে। কাবিল ছিলেন মর্ত্যে মানুষের গর্ভে জন্ম নেয়া প্রথম মানুষ, আর হাবিল ছিলেন মর্ত্যে মানুষের হাতে খুন হওয়া প্রথম মানুষ। হিব্রু বাইবেলের সৃষ্টিতত্ত্বে কাবিল ছিলেন কৃষক আর হাবিল ছিলেন মেষপালক। দুজনেই এক সময় আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য কোরবানি করলেন। কিন্তু হাবিলের ন্যায়নিষ্ঠার কারণে আল্লাহ শুধু তার কোরবানিই কবুল করলেন, কাবিলেরটা না। এতে কাবিল ক্ষিপ্ত হয়ে প্রতিহিংসার বশে খুন করে বসলেন হাবিলকে। এই হত্যাই মর্ত্যে সংগঠিত প্রথম পাপ, আদি পার্থিব অপরাধ। এই হত্যার পরেই আল্লাহ এক কাক পাঠিয়ে দেন, যে মাটি খুড়ে হাবিলের 'মৃতদেহ' কবর দেওয়া দেখিয়ে দেয় কাবিলকে। অনুশোচনায় কাঁদতে থাকা কাবিল ছোটভাইকে কবর দেন। হত্যা মানুষের ইতিহাসের অংশ হয়ে ওঠে।

'মৃতদেহ' কথাটার ওপরে আমি জোর দিচ্ছি কারণ আমরা যে আলোচনায় এগোবো, সেখানে দেহ খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে। মানুষ মৃত হয়ে যাবার পরে তার দেহটিকে কী করে আমরা কী করব, এটা নিয়ে প্রত্যেকটা সংস্কৃতিতে, দুনিয়ার সব সমাজেই খুব গভীর কিছু আচার-অনুষ্ঠান আছে। এই আচারগুলোর মধ্য দিয়েই বোঝা যায়, আমরা কীভাবে দার্শনিকভাবে মৃত্যু ঘটনাটার মুখোমুখি হই। আধুনিক সমাজে হত্যাকে কেন্দ্র করে নিহতের মৃতদেহ নিয়ে রাষ্ট্রীয় তথা আইনী তথা সেকুলার আচার-অনুষ্ঠান আছে। এই আচার-অনুষ্ঠানগুলোর নিবিষ্ট পাঠ আমরা হত্যা কীভাবে ম্যানেজ

করি, হত্যার মোরাল, লিগাল এবং পলিটিক্যাল ম্যানেজমেন্ট তৈরী করি—সেটা বোঝা যায়। সাহিত্য-শিল্পকলায় এজন্য শোনা যায় কাউকে লাশকাটা ঘরে নেয়ার গভীর সংবাদ কিম্বা 'হাজার চুরাশির মা'য়ের নির্লিপ্ত বিষাদ বাঙময় হয়ে ওঠে উপন্যাস বা সিনেমায়।

তাহলে হত্যা কী মানুষের সমাজে এতো প্রাচীন কোনো বিষয়? এতো আদিম কোনো প্রবৃত্তি? ভাবার মতোই বিষয়। আমার কাছে সব সময় কাবিলের কৃষক হওয়াটা তাৎপর্যপূর্ণ মনে হয়। আজকে আমরা বিজ্ঞানের বরাতে জানি যে, কৃষির আবির্ভাব ১০ থেকে ১২ হাজার বছর আগে। কাজেই মানুষের সমাজের অন্য অনেক আপাত শাশ্বত প্রপঞ্চের মতো হত্যার সাথেও যদি কৃষির আবির্ভাবের কোনো সম্পর্ক থাকে তো আমি অন্তত অবাক হব না। আজকে বিজ্ঞানের পথ ধরে আমরা যদি হত্যার উৎসমূল খুঁজতে রওনা দিই তো আমাদের হেঁটে আসতে হবে কৃষির আবির্ভাব থেকে শুরু করে ধাতুর ব্যবহার পর্যন্ত অনেক কিছুতেই। এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে খুঁজতে আমাদের যেতে হবে ত্রাস-রাষ্ট্র-আইন-কানুন ইত্যাদির আর্কিওলজিতে। তারপরেও সুনিশ্চিত কোনো উত্তর বোধহয় পাওয়া যাবে না।

কাজেই, আমরা আজকে যখন নারায়ণগঞ্জের সেভেন মার্ডার নিয়ে সোশিওলজিক্যালি বা অ্যানথ্রোপলজিক্যালি ভাবি, যখন সিস্টেমেটিক চিন্তা-ভাবনার চেষ্টা করি, তখন মানুষের ইতিহাসের এতো সুদূর পর্যন্ত আমাদেরকে দেখতে হয়। কারণ সমস্যাটার গোড়া এতো গভীরেই প্রোথিত। ফলে আমাদের মাথায় রাখতে হয় অনেকগুলো প্রশ্ন। হত্যা নামে যে একটা ঘটনা ঘটে মানুষে মানুষে, এটাকে সমাজগুলি কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করে; ঐতিহাসিকভাবে কীভাবে এটাকে মীমাংসা করে; দার্শনিকভাবে এটাকে কীভাবে ব্যাখ্যা করে? এবং ধীরে ধীরে কী করে হত্যা, খোদ হত্যারই একটা নির্দিষ্ট সংস্কৃতি দাঁড়িয়ে যায়? হত্যার চর্চা কীভাবে মানুষের জীবনযাপনেরই অংশ হয়ে ওঠে? এতো গুরুতর একটা ব্যাপার নিয়ে আমরা যখন কথাবার্তা বলতে চাই, তখন আলোচনার চাবিশব্দগুলোর অর্থ নিষ্পত্তি না করে আসলে আর আগানো ঠিক হবে না।

অর্থ নিষ্পত্তি বলছি এই অর্থে যে, আলোচনায় আমি যে চাবিশব্দগুলি ব্যবহার করব, সেগুলোর অর্থ আমরা সবাই কাছাকাছি বুঝি কিনা। একই জিনিস বোঝা খুব জরুরি না, কিন্তু আলোচনার জন্য কিছু একদম প্রাথমিক বোঝাপড়ার জায়গা মিলিয়ে নেয়া দরকার, যাতে কমিউনিকেট করতে পারা যায়। কারণ একই শব্দ দিয়ে এতো বেশি ধরনের জ্ঞান প্রচলিত থাকে যে, ফারাকগুলো আমরা সচরাচর খেয়াল করি না। ফলে ওই জায়গাটাতে আমাদের একটু বোঝাপড়া করে নিতে হবে। মূল আলোচনায় যাওয়ার আগে কিছু শব্দকে আমরা পরীক্ষা করে নিই। এই শব্দগুলি বলতে আমরা কে কী বুঝি। চাবিশব্দ মানে যে শব্দ আসলে চিন্তার তালা খুলবে।

প্রথমেই হাতে নেয়া যাক 'রাষ্ট্র' শব্দটি। রাষ্ট্র বলতে আমরা কে কী বুঝি? রাষ্ট্র বলতে আমাদের কমনসেন্স কী বোঝে? আমাদের আপামর সাধারণ মানুষ কী বোঝে? আমরা নিজেরা কী বুঝি? এই জায়গাটায় রাষ্ট্রের খুবই অনড়, খুবই অনিবার্য কিছু অর্থ আছে। মানে রাষ্ট্র এতোটাই স্বাভাবিক জিনিস যে, আমরা এটা নিয়ে দ্বিতীয়বার খুব একটা ভাবি না। আজকে রাষ্ট্রের আমরা যা কিছু নিয়ে ভাবি, এমনকী আমরা ক্রসফায়ার নিয়েও যখন বলি, আমরা বলি রাষ্ট্রীয় হত্যাকাণ্ড, অথবা রাষ্ট্রেরই আরেকটা রূপ হলো আইন, সেই আইন বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড। 'কথকতা' আরেকটা চাবিশব্দ। কথকতা বলতে আমি কী বুঝছি, আপনারা কী বুঝছেন? আমার মনে হয়, রাষ্ট্রে যাওয়ার আগে 'কথকতা' নিয়ে কথা বললেই ভালো হয়। ইংরেজি ভাষায় যেটাকে বলে ডিসকোর্স, তার একটা মোটামুটি চলনসই বাংলা হিসেবে এই লেখায় আমি প্রস্তাব করছি 'কথকতা'।

ডিসকোর্স বলতে নানা কিছু বোঝায়। মানে সমাজবিজ্ঞানের আলোচনায়, ভাষাতত্ত্বের আলোচনায়, একেক সায়েন্সের আলোচনায় এর একেক অর্থ আছে। আমাদের আজকের আলোচনার জন্য আমি প্রস্তাব করব, কথকতা হচ্ছে, খুব সহজ করে নিলে, আমরা ভাষার মধ্য দিয়ে যে চিন্তার প্রকাশ ঘটাই তার রাজনৈতিক বিন্যাস। অর্থাৎ চিন্তার রাজনৈতিক সংগঠনের একটা

উপায় হচ্ছে কথকতা। দেখা যায়, আমরা ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে শুধু ব্যাকরণের নিয়ম মানি না, তারও বাইরে আমরা কিছু নিয়ম মানি যেগুলি মোটাদাগে রাজনৈতিক বা পলিটিক্যাল। কাজেই কথকতা বলতে আমি বলব, টপিক অনুযায়ী, অর্থাৎ বিষয়বস্তু অনুযায়ী, প্রত্যেকটা বিষয়ে কথা বলবার জন্য গ্রামাটিক্যাল রুলসের বাইরেও কিছু রুলস আছে সেগুলোকে। এই নিয়মগুলো আমাদের কথাকে শাসন করে এবং অনেকেই মনে করেন, শুধু আমাদের কথাকেই শাসন করে না, ভাষাকেই শাসন করে না, আমাদের চিন্তাকেও শাসন করে। কারণ ভাষা আর চিন্তা খুব আলাদা কিছু না। ডিসকোর্স কোন বিষয়ে কি ভাবতে হবে, কী বলতে হবে, এবং কী বুঝতে হবে সেটা রাজনৈতিকভাবে নির্ধারণ করে দেয়। তো, প্রতিটা বিষয়েরই এরকম একটা ডিসকোর্স থাকে, একটা কথকতা থাকে। আজকে আমরা এই গুম-খুন-আতঙ্ক এবং এগুলি বিষয়ে যে কথকতা, সেই কথকতা নিয়ে আলোচনা করব।

আমাদের আরেকটা চাবিশব্দ 'রাষ্ট্র'। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ভাষায় রাষ্ট্রের যে সংজ্ঞা সেটা আমি খুব বেশি জানি না। সংবিধান-সরকার, সার্বভৌমত্ব এবং জনগণ নিয়ে একটা রাষ্ট্র হয়, এটা আমাদের ছোট ক্লাসের বইতে লেখা থাকে। এতে করে, আমি আজকে এসে যেটা বুঝি, রাষ্ট্রের আসল উপাদানটাকে বাদ দিয়ে যাওয়া হয়। রাষ্ট্রের সবচে মৌলিক উপাদান হচ্ছে ত্রাস, সন্ত্রাস। এটা আমার কথা না। আপনারা ম্যাক্স বেবারের কথা জানেন, ফ্রেডরিখ নীৎশের কথা জানেন, তারা বহু আগেই বলেছিলেন যে, রাষ্ট্র জিনিসটা হচ্ছে ত্রাস, সন্ত্রাস ছাড়া রাষ্ট্র সম্ভব না। রাষ্ট্রের ভিত্তি হচ্ছে সন্ত্রাস, ম্যাক্স বেবারের ভাষায় বৈধ সন্ত্রাসের একচেটিয়া অধিকার হচ্ছে রাষ্ট্রের ভিত্তি। কথাটা খেয়াল করেন। বৈধ সন্ত্রাসের মনোপলি অর্থাৎ একচেটিয়া অধিকার হচ্ছে রাষ্ট্রের ভিত্তি। এটা ছাড়া রাষ্ট্র সম্ভব না। ম্যাক্স বেবারেরও বহু আগে, আমাদের ভারতবর্ষের মনু সংহিতাতেও বলা আছে 'রাষ্ট্রং বাহুবলাশ্রিতম', মানে রাষ্ট্র হচ্ছে বাহুবলে আশ্রিত একটা কিছু। সেটা সাধারণত পুরুষ বা ক্লীববাচক কর্তৃবাচ্য পদ, যার মানে হিসেবে অভিধানে একাধারে পাওয়া যায় রাজ্য, দেশ, বিষয়,

জনপদ, তস্কর, উপদ্রব, মকরাদি, দুর্ভিক্ষ প্রজাপীড়ন ইত্যাদি খেয়াল করলেই দেখা যায় এর অর্থগুলো অনেক ক্ষেত্রেই পরস্পরবিরোধী।

ইতিহাসেরও আগের ইতিহাসে যাওয়ার আরেকটা সম্ভাব্য পথ হচ্ছে ভাষার পথ। শব্দেরা ভাষায় কেনো কী কারণে অর্থ বদলেছে, সেটা বিশ্লেষণ আসলে আমাদের ইতিহাস কল্পনার একটা দারুণ কার্যকরী পথ হতে পারে। 'রাষ্ট্র' শব্দটির অর্থও আসলে ইতিহাসজুড়ে একরকম ছিল না। যেমন ছিল না ইংরেজি 'স্টেইট' শব্দটির অর্থও। এমনকি আজকেও একরকম নেই। এসব বিষয়ে আমরা আবার ফিরব। আমাদের ফিরতেই হবে। কারণ এই সব ভাষাগত দ্ব্যর্থকতা আসলে চিন্তাগত দ্ব্যর্থকতা। কারণ ভাষাই চিন্তা, চিন্তার ইতিহাস আমাদের ভাষাতেই খুঁজতে হয়।

কীভাবে রাষ্ট্র মানে সন্ত্রাস? আমি বলি রাষ্ট্র হচ্ছে ত্রাসের কানাগলি, রাষ্ট্র মানে সন্ত্রাসের মনোপলি। কীভাবে? গল্পটা বলা হয় এভাবে: সপ্তদশ শতকে একজন ইংরেজ দার্শনিক ছিলেন, থমাস হবস। তিনি বলেছিলেন, ঠিক আমরা যে চিন্তা নিয়ে আজকে শুরু করেছি, আদিতে মানব প্রকৃতি কেমন ছিল? মানুষের চরিত্র, মানে একদম প্রাকৃতিক স্বভাব-বৈশিষ্ট্য কী? মানুষ কি নিজেদের প্রজাতির ভেতরে মারামারি করে নাকি মিল্-মহব্বত করে? কোনটা মানুষের মনুষ্যত্ব? একে অন্যের প্রতি মমত্ব-সহযোগিতা এগুলো মানুষের প্রকৃতি নাকি একে অন্যের সাথে মারামারি আর প্রতিযোগিতাই মানব প্রকৃতি? মানুষ স্বার্থের দ্বারা তাড়িত নাকি মমত্বের দ্বারা তাড়িত? কোনটা মনুষ্যত্ব? এবং হবস মনে করতেন, মানুষ আসলে খুব খারাপ প্রাণী। মানুষে মানুষে দেখা হলেই দ্বন্দ্ব-সংহার-মারামারি শুরু হয়ে যেত এবং সেই আদিম সমাজ সম্পর্কে ভাবতে গিয়ে হবস কিছু 'বিখ্যাত' বিশ্লেষণ ব্যবহার করেছিলেন। তাঁর ভাষায় প্রকৃতির রাজ্যে মানুষের জীবন ছিল 'পুওর', 'সলিটারি', 'ন্যাস্টি', 'ব্রুটিশ' এবং 'শর্ট'। হবসের বিশেষণগুলো বিখ্যাত হয়ে গেছে। তখন ছিল সবার সাথে সবার যুদ্ধ, ওয়ার অল অ্যাগেইনস্ট অল, আর হবস মনে করতেন এটাই ছিল মানুষের প্রাকৃতিক দশা। এটাই হচ্ছে অর্ডার। অর্ডার মানে এটাই হচ্ছে আদর্শ স্থিত অবস্থা বা প্রাকৃতিক

অবস্থা। এবং যেহেতু সবার সাথে সবার যুদ্ধ, তখন সব মানুষ মিলে ঠিক করলো যে ব্যক্তিমানুষের স্বাধীনতাই সব নষ্টের গোড়া। সবাই স্বাধীন বলেই এতো হাঙ্গামা হচ্ছে সমাজে। স্বাধীন মানে কী? স্বাধীনতা কথাটাকে হবসের অর্থে নিলে দাঁড়ায়, যেহেতু সবাই স্বাধীন, একজনের স্বাধীনতার সাথে আরেকজনের স্বাধীনতার সংঘাত অনিবার্য। এই সংঘাতের কারণেই সবার সাথে সবার প্রতিযোগিতা, সবার সাথে সবার মারামারি। ফলে মানুষ একটা সময় এসে, সবাই নিজের যে স্বাধীনতা, সেই স্বাধীনতার একটা অংশ স্যারেন্ডার করলো। স্যারেন্ডার করলো মানে এক জায়গায় কোথাও রাখলো। সে জিনিসটার নাম হচ্ছে সার্বভৌমত্ব; রাষ্ট্রের আরেকটা উপাদান। রাষ্ট্র তখন একটা অর্ডার, নতুন একটা অর্ডার এস্টাবলিশড হচ্ছে যেখানে মারামারি-ধরাধরি-খুন এগুলি যা করা দরকার সেগুলো রাষ্ট্র একাই করবে। যেটা বললাম আমি, সন্ত্রাস করবার একচেটিয়া অধিকার কেবল রাষ্ট্রের। একচেটিয়া অধিকার মানে মারামারি-গোলাগুলি যা করার সরকার করবে, রাষ্ট্র করবে, আর কেউ করবে না। যদি আর কারও করার দরকার হয়, সে রাষ্ট্রের মাধ্যমে করবে। অর্থাৎ বিচারব্যবস্থা, আইন, আদালত এগুলির মধ্য দিয়ে সেই ঘটনাটা ঘটবে। মানে একদম আমরা যেমন ওয়েস্টার্ন ছবিতে দেখি, যেভাবে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা হচ্ছে, হয়। গোলাগুলি যা করা দরকার আইন বা পুলিশ নিজে করবে আর কেউ করবে না, এরকম একটা জায়গায় এসে, রাষ্ট্র যৌক্তিকতা পায়। সুতরাং এটাই আধুনিক কাণ্ডজ্ঞান। আমাদের যে কাণ্ডজ্ঞান, কমনসেন্স, এর ভেতরে আছে যে যদি আইন-রাষ্ট্র এগুলি না থাকে, তাহলে কালকেই আমার সাথে আপনার মারামারি শুরু হয়ে যাবে। এবং কালকেই রাস্তায় দেখা হলেই আমরা আগে মারামারি করতে শুরু করব। এরকম একটা অনুমান কিন্তু জন-মানসে কাজ করে বলে রাষ্ট্র জিনিসটা আমাদের কমনসেন্সে বৈধতা পেতে থাকে। বৈধতা পায়। এবং এই বৈধতাকে আমরা স্বীকার করে নিই। কাজেই, রাষ্ট্র আমাদের আলোচনার চাবিশব্দ হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ।

আরেকটা চাবিশব্দ হওয়া উচিত 'আইন'। আইন বলতেও আমরা সবাই আসলে একই জিনিস বুঝি কিনা। আইন কথাটার অর্থ আসলে রাষ্ট্রের এই ইতিহাসের সাথে ঘোট পাকিয়ে অনেকখানি বদলে গেছে, মিলেমিশে গেছে। মানুষের সমাজ, সমাজ পরিচালনা, সমাজের গতিশীলতা, সমাজ সংগঠন, এগুলির সূত্র হিসেবেই আইনকে আমরা দেখি। কিন্তু একটু ভালোমতো খেয়াল করলে দেখা যায়, আজকে মানুষের সমাজ সংগঠনের সাথে আইনের সম্পর্ক খুবই ক্ষীণ। এটা বরং আরো বেশি প্রোথিত হচ্ছে যে বহুমাত্রিক প্রক্রিয়ায় রাষ্ট্র ধীরে ধীরে সমাজের নিয়ন্ত্রণ নিজের হাতে নিতে থাকে সেখানে। সমাজের নিয়ন্ত্রণ নিজের হাতে নেয়ার যে উপায়, সেই উপায়টাই হচ্ছে আইন এবং আধুনিক আইনের ভিত্তি রাষ্ট্রের মতোই। আইনের ভিত্তিও হচ্ছে সন্ত্রাস। যেকোনো রাষ্ট্রের প্রথম সন্ত্রাসী জিনিসটার নাম হলো 'আইন'। আইন হয়ে উঠেছে সেই সন্ত্রাসী ব্যবস্থা যা ন্যায়বিচারের নামে, শান্তি-শৃঙ্খলার নামে বলপ্রয়োগ করতে পারে। কিন্তু আইন জিনিসটাকে আমরা এতোটাই মান্যতার নৈতিক দৃষ্টি দিয়ে দেখি যে, এটাকে রাষ্ট্রের মতোই অমোঘ, অনিবার্য এবং অবিকল্প দেখায়। কিন্তু আদতেই আজকের আধুনিক অর্থে আইন মানেই সন্ত্রাসের অনুমোদিত রূপ। আইনের উপস্থিতিই রাষ্ট্রকে এর রক্ষাকর্তা হিসেবে আরেকটু ভূমিকা তৈরি করে দেয় যার জোরে রাষ্ট্র স্বাভাবিকতা পায়। এর বলপ্রয়োগের দিকটি আমাদের নৈতিকতায় বৈধতা পায়। বৈধতা পেলেও আইন নিজে একটি সন্ত্রাস নির্ভর ব্যবস্থা সেটা অস্বীকার করা যায় না। কারণ হিসেবে অন্য অনেক যুক্তি দেয়া যায়। কিন্তু একটা সহজ যুক্তি হচ্ছে আইন প্রয়োগ করতে সবসময় বন্দুক লাগে। আইন হচ্ছে এমন একটা জিনিস, যেটা বন্দুক দিয়ে প্রয়োগ করতে হয়। আপনারা খবরের কাগজে দেখেন, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা। আইন প্রয়োগকারী সংস্থা কারা? আমাদের দেশে বা দুনিয়ার সব জায়গাতেই আইন প্রয়োগকারী সংস্থা মানে হচ্ছে বন্দুকধারী বাহিনী। তাই না? তার মানে আইনেরও ভিত্তি হচ্ছে সন্ত্রাস। আরো সহজ করে বলি ত্রাস। সেটা কীভাবে?

আইন মোটাদাগে যেভাবে কাজ করে, সেটা হচ্ছে সে ভয় দেখিয়ে কাজ সারতে চায়; ত্রাস সৃষ্টি করে কাজ সারতে চায়। ভয় দেখিয়ে কাজ সারার অর্থ কী? ভয় দেখিয়ে কাজ সারার অর্থ হচ্ছে, এই অপরাধ করলে আমি ফাঁসিতে ঝুলায় দেব বলে আমি একজনকে ফাঁসিতে ঝুলায় দিলাম। তাতে সে যে অপরাধ করেছে তার শাস্তি দেওয়া হল, আবার অন্যদের সামনে এই দৃষ্টান্ত ঝুলিয়ে রাখা হল যে, এই কাজ করলে এমন করে ফাঁসি দেয়া হবে। এইটাই ভয় দেখিয়ে কাজ সারা। এই জায়গায় একটু বলে রাখি, আমরা অনেক সময় বলি যে, সৌদিরা বর্বর। কারণ হচ্ছে ওরা রাস্তায় প্রকাশ্যে গলা কাটে। আর আমরা সভ্য। কারণ আমরা গোপনে জেলখানার আড়ালে রাত ১২টা এক মিনিটে ফাঁসি দিই। মানে যদি আইনের যৌক্তিকতার জায়গা থেকে দেখি, দুটোর কাজতো একই। বরং দেখা যায়, এরশাদ শিকদারের যেদিন ফাঁসি হয়, পরদিন কিন্তু কোনো পত্রিকার কপি আর খুঁজে পাওয়া যায় না। কারণ ঐ যে রহস্যময়তার একটা চাদরে ঢাকা হলো ফাঁসিটাকে। এবং গলায় ফাঁস লাগার পরে ডাক্তার এসে ভেইন কেটে দেয় মৃত্যু নিশ্চিত করার জন্য। এবং জল্লাদের দড়ি যে ম্যানিলা থেকে আসে এবং পাকা কলা দিয়ে পাকানো হয় ফাঁসির দড়ি, এসমস্ত জ্ঞান তো নিউজ পেপারের মধ্য দিয়েই আমাদের কাছে আসে। তার মানে হচ্ছে, এই রহস্যময়তা, এই রাতের অন্ধকারের ঘটনাগুলো আমাদের মনের আরো গভীরে দাগ কাটে। ফলে এই ধরনের আলোচনা, সৌদিরা যেহেতু প্রকাশ্যে গলা কাটে, আমরা যেহেতু গোপনে রাত ১২টা এক মিনিটে ফাঁসি দিই, আমরা ওদের চেয়ে বেশি সভ্য, এগুলো হচ্ছে একদমই অসার আলোচনা।

এই ত্রাস সৃষ্টির উপায়টাও যদি খেয়াল করেন তখন বোঝা যায় আইন ত্রাস সৃষ্টি করেই টিকে থাকে। এবং ত্রাস সৃষ্টি করার উপায়টা হচ্ছে নিজেকে এক ধরনের পরাবাস্তবতা দেওয়া। এটা আমাদের দৈনন্দিন আটপৌরে বাস্তবতার অংশ না। আপনারা খেয়াল করেন, শুরু থেকেই র‍্যাবের কালো চশমা, কালো পোশাক, মাথায় পট্টি, যেভাবে মুভ করবে, এসবের মধ্যেই এই মেসেজগুলি

দেয়াই আছে। আমাদের মিডিয়া কী করে? মিডিয়া আমাদের ক্রসফায়ারের খবর দেয় 'বন্দুকযুদ্ধ'কে ইনভার্টেটেড কমার মধ্যে শিরোনাম করে। এতে করে মিডিয়া নিজে আইন নিরপেক্ষ থাকে, অর্থাৎ আইনীভাষ্য বা প্রেস রিলিজের প্রতি তারা সরাসরি আঙুল তোলেন না, আবার ইনভার্টেড কমা দিয়ে এর পক্ষে অবস্থান নেওয়াটাও তারা এড়িয়ে যান। অর্থাৎ ক্রসফায়ারের প্রেস স্টেটমেন্টের মধ্যে সংগুপ্ত যে আইনী ত্রাস পাবলিকের জন্য বরাদ্দ হয়, তার যে অ্যাম্বিগুইটি বা সংশয়ময়তা, সেটা মিডিয়া ঠিক আইনের মতো করেই ক্যারি করে। জনসাধারণ হিসেবে আমরা বুঝতেই পারি যে, র‍্যাব প্রত্যেকটা ক্রসফায়ারের পরে একই গল্প বলছে। এটা আমি বুঝতে পারছি। এটা যে বানানো, মিথ্যা এটা আমি বুঝতে পারছি, কাজেই আমি বুদ্ধিমান বলে একটা আত্মপ্রসাদে ভুগি। আমরা বুদ্ধিমান, আমরা বুঝতে পারছি, র‍্যাব এটা ঠিক বলছে না। কিন্তু আমরা কি আসলেই বুদ্ধিমান? আসলে র‍্যাব তো প্রতিটা গল্প একই ছকে দিচ্ছে, কারণ র‍্যাব চায় মানুষ জানুক যে, দিস ইজ আস, এটা আমরা করছি। কিন্তু এটা যে র‍্যাব করছে এটা বুঝতে পেরেই আমরা নিজেদেরকে বুদ্ধিমান ভাবছি। ওই ভয়টা এবং তার সাথে প্রচারণা মিলিয়ে যে ভয়টা উৎপাদন এবং বিতরণ করা হয় একটা কথকতার মধ্য দিয়ে, ক্রসফায়ার নিয়ে সোশিওলজিক্যালি ভাবতে চাইলে আমাদের সেই কথকতাকেই গবেষণার উপাত্ত করতে হবে।

কী করে ভাবতে হবে? ক্রসফায়ার নিয়ে ভাবতে গেলে আসলে একটু দিশেহারাই লাগে। এই নিয়ে গুছিয়ে চিন্তা করতে গেলে মনে হয় আসলে রাষ্ট্র, আইন, সমাজের সাথে এদের সম্পর্ক, নাগরিকত্ব এবং সবকিছুর সাথে এগুলো এমনভাবে জড়িয়ে পেঁচিয়ে আছে, এগুলো থেকে আলাদা করে শুধু ক্রসফায়ার নিয়ে ভেবে—রাষ্ট্র, আইন এগুলোর যে ভাবমূর্তি, সেই ভাবমূর্তিতে আবদ্ধ থেকে ক্রসফায়ার নিয়ে ভেবে কোনো সুরাহা করা যাবে না। এক ফাঁকে বলে রাখি, গত বছর আমি কথা বলেছি এই হত্যা, ক্রসফায়ার এইগুলি নিয়ে মানবাধিকার সংস্থা আয়োজিত একটা

অনুষ্ঠানে। সেখানে অংশগ্রহণকারীরা ছিলেন মূলত হিউম্যান রাইটস ডিফেন্ডারস, মানবাধিকার কর্মী; ছিলেন এ্যাডভোকেটেরা, মানবাধিকার কর্মী, সাংবাদিক, সুশীল সমাজ এবং বিভিন্ন এনজিও প্রতিনিধি। আমি এখনকার মতোই নানা কথা বলি। তার পর আইন বিভাগ থেকে আরেকজন শিক্ষক ছিলেন। তিনিও তাঁর মতো করে বলেন এবং সবশেষে এক ধরনের মতামত নেওয়া হয় যে, ক্রসফায়ারের দরকার আছে কি নাই। এবং সারাদিন সেশন শেষে হিউম্যান রাইটস ডিফেন্ডারেরা সবাই বললেন, এটার দরকার আছে। এটা ছাড়া সম্ভব না আইন-শৃংখলা পরিস্থিতি সামাল দেওয়া।

আসলে এখানেই আমাদের সমস্যাটা শুরু হয়ে যায়। আমাদের অবাক হয়ে যেতে হয়। দেখা যায় বৈধতা আর অবৈধতা দিয়ে আসলে ক্রসফায়ারকে ব্যাখ্যাই করা যায় না, নিরাময় তো দূরের ব্যাপার। একটু খেয়াল করলেই দেখা যায়, এইসব ঘটনা বা ঘটনা ঘটানো প্রতিষ্ঠানের পেছনে বিশাল একটা, গভীর একটা সামাজিক অনুমোদন আছে। এই অনুমোদনের কারণেই ক্রসফায়ার আপাতত আইনের বাইরের জিনিস মনে হলেও পুরা প্রক্রিয়াটা আইনের আদলেই কাজ করে। ভয় তৈরী করে, আমাদের অনুমোদন তৈরী করে। এইটা আইনেরই প্রতিকল্প। এটাকে 'বিচার' বা 'আইন' বহির্ভূত হিসেবে সংজ্ঞায়িত করে ব্যাখ্যা করা যায় না। ক্রসফায়ার বেআইনী নয়, খোদ আইনেরই কাঠামোগত যমজ। কারণ খোদ আইন জিনিসটা সবসময়ই একটা গোলমেলে জিনিস। আইন নিজেকে নিজে রদ করে দিতে পারে। জরুরী অবস্থা জারি করতে পারে। কাজেই সমাজবিদ্যার জায়গা থেকে আইনে কী আছে সেটা দিয়ে আইন বোঝা যায় না। আইনকে বুঝতে হয় তার কর্তৃত্ব দিয়ে, সন্ত্রাস দিয়ে, অনুমোদন আদায় দিয়ে এবং তার প্রয়োগ দিয়ে। এই অনুমোদনটা কীভাবে সম্ভব হয়ে ওঠে? এটা আমার কথা বলবার পরের জায়গা।

এই যে আমরা সবাই মিলে এই রাষ্ট্র, আইন কিম্বা 'আইন বহির্ভূত হত্যাকাণ্ডে'র মতন বিষয়গুলোকে অনুমোদন করি, এই অনুমোদনের জায়গাটা কীভাবে তৈরি হয়? যেভাবে সরাসরি

'বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড' বা 'আইন বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড' ইত্যাদি বিশেষণ এই ক্রসফায়ার গুম-খুন বিষয়ে প্রচলিত আছে, এগুলিকে সন্দেহ করা, বা আবার পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার কোনো সুযোগ আছে কি না? আমি কি এটুকু পরিষ্কার করতে পারলাম যে, আমি কি নিয়ে জোর দিতে চাচ্ছি? হত্যার কথকতা বলতে আমি কী বলতে চাচ্ছি? এই কথকতার ইতিহাস, আমি এর আগের লেখাটাতে লিখেছিলাম, হত্যার ইতিহাস খুব গুরুত্বপূর্ণ। মিশেল ফুকো বলতেন—আপনারা জানেন একজন দার্শনিক আছেন এই নামে, ৮০'র দশকে মরে গেছেন কিন্তু এখনো পর্যন্ত তাঁর চিন্তার প্রভাব খুব একটা কমেনি। সমাজ বাস্তবতা, রাষ্ট্র, ক্ষমতা এগুলিকে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে খুব গুরুত্বপূর্ণ লোক হয়ে আছেন তিনি। তিনি একটা কথা বলেছিলেন, 'মার্ডার ইজ দ্য পয়েন্ট এ্যাট হুইচ হিস্টরি ইন্টারসেক্টস উইথ ক্রাইম'। ইতিহাস আর অপরাধের সম্পর্ক নিয়ে এই বাক্যটা আমার খুবই প্রিয় একারণে যে, আমি এটা পুরো বুঝিনি এখনো। ফলে এটা আমাকে ভাবায় অনেক। মার্ডার ইজ দ্য পয়েন্ট, যেখানে হিস্ট্রি ইন্টারসেক্টস উইথ ক্রাইম, মানে হত্যার বিন্দু থেকে অপরাধ এবং ইতিহাস অভিন্ন হয়ে যায়। অপরাধ আর ইতিহাসের সহযাত্রার মোহনা হচ্ছে মার্ডার। সে কারণেই আমি শুরুতেই ভাবতে চেয়েছি হত্যা আসলে ইতিহাসের ঠিক কোন জায়গা থেকে শুরু।

ইতিহাস নিয়ে অ্যানথ্রোপলজিস্টদের মধ্যে আরেকটা জনপ্রিয় পদ্ধতি আছে। সেটা হচ্ছে, ইতিহাসে ভ্রমণের জন্য বা ফিল্ডওয়ার্ক করবার জন্য যেহেতু আমাদের টাইম মেশিন নাই, ইতিহাসে ফিরে যাওয়ার উপায় হিসেবে তারা ফিরে যান সো কলড 'আদিম সমাজে'। যে সমাজগুলো এখনো আধুনিক হয়ে ওঠেনি, যাদেরকে আমরা 'আদিবাসী' 'পশ্চাৎপদ' 'বর্বর' ইত্যাদি ইত্যাদি বলি। আরো সহজ করে বললে, যে সমাজগুলি রাষ্ট্র ও আইন ব্যবস্থার ভিতরে আসেনি এখনো। এমন সমাজগুলিতে তারা ফিরে যান। তারা দেখতে পান, এইসব সমাজে হত্যা বা হত্যার ঘটনাকে ম্যানেজ করবার অর্থাৎ হত্যাকে রেগুলেট করবার খুবই ভিন্ন ধরনের নিয়ম-কানুন আছে। এসব দিয়ে বোঝাই যায়, ঐ

সমাজগুলির হত্যা সম্পর্কিত যে দর্শন, সেই দর্শন একদমই ভিন্ন। যেমন, অনেক দূরে যাওয়ার দরকার নেই, পার্বত্য চট্টগ্রামের দু'একটি সমাজ এখনো আছে—অন্তত গত শতক পর্যন্ত ছিলো—যেখানে এমন কোনো বিচার ব্যবস্থা নেই যেই ব্যবস্থা সন্ত্রাসী বা সন্ত্রাস করবার ক্ষমতা রাখে। সন্ত্রাসী বিচার ব্যবস্থা বা রাজনৈতিক বিচার ব্যবস্থা তাদের নেই। তাদের বিচার ব্যবস্থা কাউকে ফাঁসি দেয়ার ক্ষমতা রাখে না, গ্রেফতার করবার ক্ষমতা রাখে না, গুলি বা লাটিপেটা তো নয়ই। আসলে কোনো রকম রাজনৈতিক ক্ষমতাই তারা রাখে না। যাদেরকে আমরা গ্রাম-প্রধান বা কার্বারি বলে জানি, তারা মূলত হচ্ছেন এক ধরনের মেডিয়েটর, যোজক, যৌথ মীমাংসার মাধ্যমে বিরোধ নিরসন ও বাইরের জগতের সাথে কাজ-কারবার ও দেন-দরবার করেন। কাউকে শাস্তি দেয়ার ক্ষমতা তাঁদের নেই, ফাঁসি দেয়ার ক্ষমতা নেই। ঐ সব সমাজে হত্যা এমনভাবেও মীমাংসা হতো, যেখানে যে খুন হয়ে গেল তার পরিবারকে পাঁচটা ছয়টা শুকর দিয়ে বিষয়টা একভাবে মীমাংসা হয়ে যেতো। এবং দুই পক্ষই মনে করতো জাস্টিজ ইজ ডান। কাজেই ন্যায়ের ধারণার শাশ্বত কোনো রূপ নেই। আধুনিক বিচার ব্যবস্থার মধ্যে যে প্রতিশোধমূলক ন্যায়ের ধারণা সেটা পৃথিবীর সর্বকালের সব সমাজের বৈশিষ্ট্য না।

এমনকি আধুনিক সমাজেও ন্যায়ের ধারণা স্থির বা শীলাভূত কিছু না। ন্যায়ের ধারণা সমাজে বদলে যায়। যেমন আজকে অনেক মানুষ, এমনকি মানবাধিকার কর্মীরাও মনে করছেন ক্রসফায়ার হচ্ছে ন্যায় বা জাস্টিস, হোক না সেটা ডার্ক জাস্টিজ। ডার্ক জাস্টিজ তো একটা ফ্যান্টাসি, কিন্তু আমরা সবাই কম-বেশি বসবাস করি সেই ফ্যান্টাসিতে। বিমূর্ত বাস্তবতাকে বুঝতে ফ্যান্টাসি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যেসব সমাজে জাস্টিস নাই, সেসব সমাজে ডার্ক জাস্টিস তো একটা পপুলার ধারণা হবেই। যেখানে ন্যায়বিচার নাই, যেখানে ন্যায়ানুবর্তিতা নাই, সেখানে ডার্ক জাস্টিস অর্থাৎ একটা কিছু শক্তি আসবে, জাস্টিসগুলো করবে, এই আকাঙ্ক্ষা তো থাকবেই। র‍্যাব শুরুতে জনমানসে এক অর্থে সেই ডার্ক জাস্টিসই ছিল, যে কারণে

এটা আমাদের অনুমোদন পায়। এই অনুমোদনই তার কর্মকাণ্ডের আসল ভিত্তি। এই অনুমোদন মনে করে আইনের চোখ ফাঁকি দিয়ে চলে যাচ্ছে যে সন্ত্রাসীরা, সেসব সন্ত্রাসীদের ধরে রাতের অন্ধকারে মেরে ফেলছে র‍্যাব। কারণ এদেরকে কোর্টে তুলে লাভ নেই, আইনের কাছে নিয়ে লাভ নেই। এরা আইনের ফাঁক গলে বেরিয়ে যাবে। কাজেই আইন সবার জন্য নয়। শেষ বাক্যটি, আইন সবার জন্য নয়, এটা আমরা একটু মনে রাখব, ঠিক আছে?

তো আমি খুব বেশি মতভেদ পোষণ করবো না এই মনোভাবের সাথে। কারণ হচ্ছে, আমি যুক্তি দেয়ার চেষ্টা করবো যে ক্রসফায়ার, যাকে অনেকে 'আইন বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড' বলছেন, এগুলো আসলে আইনেরই অনুষঙ্গ। আইনের একদম মৌলিক উপাদান, এগুলি আইন বহির্ভূত না। খোদ আইন জিনিসটাই এরকম। একটা কথা তো অলরেডি আমি হয়তো বলেছি, আপনাদের কতটুকু ধাক্কা লেগেছে জানি না। আমি যেদিন প্রথম ভাবতে পেরেছিলাম এটা, আমার খুব ধাক্কা লেগেছিলো। সেটা হচ্ছে, কোনো রাষ্ট্রের প্রথম 'আইন বহির্ভূত' জিনিস হচ্ছে রাষ্ট্র নিজেই। কেনো? কীভাবে? কারণ হচ্ছে তার যে সার্বভৌমত্ব, তার যে একটা একচেটিয়া অধিকার সন্ত্রাস করবার, সেটার কারণে। এটা এমন একচেটিয়া ক্ষমতা যে চাইলেই সমস্ত আইন বন্ধ করে দিতে পারে। মানে এটা হচ্ছে আইনের বাইরে। আইনের বাইরের একটা কিছু। যে কারণে সে জরুরী অবস্থা জারি করতে পারে। আবার একই সাথে সার্বভৌমত্ব আবার আইনের ভেতরেও, কারণ এই ক্ষমতা বলেই রাষ্ট্র আইন প্রয়োগ করে। এই গোলমেলে ব্যাপারটাই আসলে ক্রসফায়ার বা গুম-খুন নিয়ে গোলযোগটা বোঝার জন্য জরুরী।

তো রাষ্ট্র, আইন, হত্যা, ত্রাস, সার্বভৌমত্ব এই বিষয়গুলি নিয়ে আমি মোটাদাগে বলার চেষ্টা করলাম যে, আসলে কী ঘটছে। সাথে আমি আরো একটা জিনিস যোগ করতে চাই, ক্ষমতাকে কখনোই যেন আমরা আমাদের শরীর বা জৈবিক অস্তিত্বের বাইরের বিষয় হিসেবে না দেখি। মানে আধুনিক

ক্ষমতাতন্ত্রকে ফুকো আমাদের জৈব-ক্ষমতা বা বায়ো-পাওয়ার হিসেবে শিখিয়েছেন। উনি বলেন, জৈব ক্ষমতা বা বায়ো-পাওয়ার হচ্ছে ক্ষমতার কিছু টেকনোলজি যা দিয়ে পাবলিককে একটি গ্রুপ হিসেবে ম্যানেজ করা যায়, নিয়ন্ত্রণ করা যায়। এই জৈব-ক্ষমতাকে ফুকো মনে করেন, আধুনিক জাতিরাষ্ট্রের নিজ কার্য-সাধনের একটা অন্যতম উপায়। বায়ো-পাওয়ার মানে শাসন-ব্যবস্থা আমাদের শরীরের ওপর যে কর্তৃত্ব উপভোগ করে সেটা। মানুষের শরীর তখন রাজনৈতিক কলাকৌশল প্রয়োগের ক্ষেত্র হয়ে ওঠে। এই বায়ো-পাওয়ার প্রয়োগ হয় কিছু ডিসিপ্লিনারি প্রতিষ্ঠান দিয়ে, যেমন পুলিশ, আইন-আদালত, কারাগার, ক্লিনিক থেকে শুরু করে আর সব বলপ্রয়োগকারী প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়ে। আধুনিক ক্ষমতা তার শাসিত মানুষদের শরীরকে নিজের নিয়ন্ত্রণে নেয়। আমাদের শরীরের ওপর আইনের যে ক্ষমতা, যেটা টিকা দেয়া থেকে শুরু করে গ্রেফতার, রিমান্ড, কারাগার, হাজত কি হত্যা, সেটাই আধুনিক ক্ষমতাতন্ত্রের সবচেয়ে গুরুতর বৈশিষ্ট্য মনে করেন ফুকো। আইন মানুষের শরীরের ওপর, মানুষের জৈব জীবনের ওপর যেটা প্রয়োগ করে সেটা আইনী ক্ষমতা নয়, রাজনৈতিক ক্ষমতা। আমি বিষয়টা আরো ব্যাখ্যা করতে চাই।

আমাদের আজকের আলোচ্য বিষয় নিয়ে যেসব কথা-বার্তা আমরা বলি ও শুনি, খেয়াল করলে দেখবেন সেই কথকতায় দেহের একটা ভূমিকা আছে। ক্রসফায়ারের পরে যেটা উদ্ধার হয় সেটা হচ্ছে দেহ, মৃতদেহ। ব্যক্তি মানুষ তখন একটা 'বডি' বা 'লাশ' হিসেবে উদ্ধার হয়। এইটাই ক্রসফায়ার নামক সংস্কৃতির, যদি আমরা এটাকে একটা এথনোগ্রাফিক ইভেন্ট হিসেবে দেখি, তার 'রাইটস অফ প্যাসেজ'। ব্যক্তি বা নাগরিক থেকে কেউ কেউ ডিসকোর্সের মধ্য দিয়ে 'সন্ত্রাসী' আখ্যা লাভ করেন। তারপর একটি 'বন্দুকযুদ্ধে'র মধ্য দিয়ে তারা 'মৃতদেহ' হিসেবে 'উদ্ধার' হয়ে যান। বাকিদের জন্য তখন বরাদ্দ হয় ভয়। এটাই ক্রসফায়ারের জীবনাচার বা রাইটস অফ প্যাসেজ। ঠিক আইনের মতো। আইনে যেভাবে বিচারের মধ্য দিয়ে কেউ দোষী বা নির্দোষ সাব্যস্ত হয়,

তারপর খালাস বা শাস্তি পায়, বাকিদের জন্য বরাদ্দ হয় ভয়। ক্রসফায়ার বা গুম দেখেন ঠিক এই তিন ধাপেই কাজ করে। একারণে বললাম যে, দেহটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ইদানিং আইনপ্রয়োগকারী সংস্থা কাউকে তুলে নিয়ে গেলেই দেখা যাচ্ছে আত্মীয়স্বজন তাড়াহুড়া করে কোনোভাবে ডিসি অফিসের সামনে হোক, সাংবাদিকদের সামনে হোক, সেখানে গিয়ে তারা একটা আপিল করছেন যে, আমার অমুককে 'জীবিত' ফেরত চাই। মানে 'জীবিত' উদ্ধার করা হোক, 'মৃতদেহ' হিসেবে নয়। কথাগুলো পেপারে আপনারা দেখছেন না? আবার একই সাথে আপনারা দেখেন 'অজ্ঞাত', 'মৃতদেহ উদ্ধার' জাতীয় শব্দবন্ধ। পদ্মা-মেঘনা-যমুনা-ধলেশ্বরী ক্রমাগত 'অজ্ঞাত' লাশের 'ঠিকানা' হয়ে উঠছে। তো 'উদ্ধার' মানে কী? মৃতদেহ কী করে 'উদ্ধার' হয়? কেনো হয়? 'ব্যক্তি' উদ্ধার পায় না কিন্তু তার 'দেহ' তাহলে উদ্ধার হয়? তার মানে ব্যক্তিকে দেহ করে তোলাই কি র‍্যাবের কাজ? এটাই কি ক্ষমতাতন্ত্রের চূড়ান্ত ক্ষমতা? এটাই কি আইনের চূড়ান্ত কাজ? এটাই কি বায়ো-পাওয়ার? ভাষার এই ফাঁকগুলো আমাদের খুব পরীক্ষা করে নিতে হবে। কারণ এগুলোর ফাঁকে ফাঁকেই কিন্তু এই সব ঘটনা যৌক্তিকতা পেয়ে যায়, আমাদের চিন্তা-চেতনার অংশ হয়ে ওঠে এবং আমরা ওভাবে ভাবতে বাধ্য হই। ঠিক আছে?

তো, আমি এসব নিয়ে আরেকটু ঘেটেছি। ফুকো যেটা মোটাদাগে বলেন, সেটা হচ্ছে যে আধুনিক ক্ষমতাতন্ত্র আসলে আমাদের শরীরে বসবাস করে। টেকনোলজিস অব পাওয়ার, মানে মেডিসিন, হাসপাতাল, পাগলাগারদ, শাস্তি, আইন-কানুন এ সমস্ত কিছুর লক্ষ হচ্ছে আমাদের ব্যক্তিক শরীর এবং পপুলেশনকে একটা গ্রুপ হিসেবে, ব্যক্তিকে একটা সমষ্টি হিসেবে কন্ট্রোল করবার উপায় বের করা, ব্যক্তির শরীরের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা, মানে তার জৈবিক অস্তিত্বের ওপর দখলদারি করা, মানে জীবন-মরণের বিধাতা হয়ে ওঠা। ফুকো এসবকে গভর্নমেন্ট বলেন না, বলেন গভর্নমেন্টালিটি। গভর্নমেন্টালিটি, এটা প্রতিষ্ঠান অর্থে গভর্নমেন্ট না, গভর্নমেন্টালিটি হচ্ছে জনসাধারণের মধ্যে শাসিত

হওয়ার মেন্টালিটি তৈরী করবার প্রকৌশল, এর মধ্য দিয়েই গভার্নমেন্ট পাবলিককে স্বীয় শাসনের জন্য দীক্ষিত করে তোলে, স্বীয় নীতির যৌক্তিকতা তৈরী করে। ফুকো গভার্নমেন্টালিটির ধারণা দিয়ে ক্ষমতা নিয়ে আমাদের সব পূর্বানুমানই প্রায় বদলে দিয়েছেন। তিনি ক্ষমতাকে শুধু রাষ্ট্রীয় আইন ও আমলাতন্ত্র নয়, ক্ষমতা প্রয়োগ বা শাসনকৌশলকে তিনি বিস্তৃত করেছেন সামাজিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার সব প্রতিষ্ঠানের দিকে, স্কুল, হসপিটাল, পাগলাগারদ ইত্যাকার সবকিছুকেই তিনি এই শাসন প্রকৌশলের অংশ হিসেবেই দেখেন। এমনকি জ্ঞান উৎপাদন প্রক্রিয়াকেও। আমরা এখন তাহলে শাসনপ্রণালী বা গভার্নমেন্টালিটি হিসেবে ক্রসফায়ার বা গুম-খুন ঘাটতে গেলে দেখব ক্রসফায়ার বা গুম বা খুন, এগুলি আসলেই সবসময়ই আইনে ছিলো। দুনিয়ায় যুগে যুগে সমস্ত দেশে ছিলো। খোদ আইন জিনিসটাই দাঁড়িয়ে আছে এগুলির ওপর। এই নিয়ে আমি গত বছর দু'য়েক ধরে একজনের একটু জটিল দুই-তিনটা বই পড়ার চেষ্টা করছি। সেখান থেকে আমার কিছু বোঝা না বোঝা আপনাদেরকে একটু খুলে বলার চেষ্টা করি।

জর্জিও আগামবেন তাঁর নাম। আমি আসলে তাঁর বইগুলোর বিজ্ঞাপনই করতে চাই। কারণ আমরা সবাই মিলে পড়লে যেটা হয় যে, একেক জনের পড়া একেক রকম হবে, তাতে লাভ বই ক্ষতি নেই। আমি চাই যে, সবাই আমরা পড়ি। আগামবেনের দুইটা বই আমাকে গত দুই-তিন বছর ধরে খুব ভাবিয়েছে। আমি মাঝেমধ্যেই নানা দিক থেকে পড়ার চেষ্টা করি। আগামবেন, ইতালির ভাবুক, দার্শনিক, অর হোয়াট এভার। তার দুইটা কাজ বিখ্যাত হয়েছে। একটা হচ্ছে 'হোমো সাকের : সোভরেইন পাওয়ার এন্ড বেয়ার লাইফ' (১৯৯৫)[১]। হোমো সাকের কী সে প্রশ্নে আমি পরে আসছি। পরের বইটি হচ্ছে 'স্টেইট অফ এক্সেপশন' (২০০৫)[২]। আগামবেনের কাজ মোটাদাগে বলা যায়

---

১ Agamben, Giorgio 1995, *Homo Sacer: Sovereign Power and Bare Life*, Stanford University Press, Stanford.

২ Agamben, Giorgio 2005, *State of Exception*, University of Chicago Press, Chicago.

ফুকোর অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করবার চেষ্টা। ক্ষমতা নিয়ে, জৈব ক্ষমতা নিয়ে ফুকো শেষ দিকে এসে যেখানে গভর্নমেন্টালিটি নিয়ে আলোচনা শেষ করে যেতে পারেননি অকালে মরে গিয়ে, আগামবেন সম্ভবত ফুকোর ঐ কাজটাই ক্যারি আউট করছেন। তো ফুকোর বায়ো-পাওয়ারের কথা আমি বললাম, সেই বায়ো-পাওয়ারেরই আরেকটা এক্সটেনশন হচ্ছে আগামবেনের এই দুইটা কাজ।

'স্টেইট অব এক্সসেপশন' বলতে, স্টেইট কথাটা, ইংরেজিতে আপনারা জানেন, একটা অ্যামবিগুইটি আছে এটা নিয়ে, দ্ব্যর্থকতা আছে। স্টেইট বলতে কোনো কিছুর অবস্থা বুঝায়, আবার স্টেইট বলতে রাষ্ট্র বুঝায়। 'স্টেইট অফ দি নেশন' বলতে জাতির অবস্থাও বোঝাতে পারে, আবার জাতির রাষ্ট্রও বোঝাতে পারে। 'স্টেইট অব এক্সসেপশন' এই জায়গাটাতে আপনাদের একটু মনোযোগ চাইব আমি। এই এক্সসেপশন মানে হচ্ছে, আমি যে বললাম যে কোনো রাষ্ট্রের প্রথম বেআইনি জিনিসটা হচ্ছে রাষ্ট্র নিজে, সেটা। রাষ্ট্রই সেই আইনের আদিম ব্যতিক্রম বা এক্সসেপশন। কারণ রাষ্ট্রের আছে সার্বভৌম ক্ষমতা যেটা জনগণের শাশ্বত সম্মতির আধার বলে কল্পিত হয়। কার্ল স্মিথ নামের একজন জার্মান রাষ্ট্রচিন্তক বলেন, সার্বভৌমত্ব আসলে রাষ্ট্রের আইনকে রদ করে দেয়ার ক্ষমতা। আবার এটার জোরেই রাষ্ট্র কিন্তু আইন প্রয়োগ করে। আবার জরুরী অবস্থা জারি করে সে সমস্ত আইন রদ করে দিতে পারে। ২০০৮ সালে আমাদের এখানে এটা ঘটেছিলো, যাকে আমরা নাম দিয়েছি 'ওয়ান-ইলেভেন'। তাই আগামবেন বলছেন, স্টেইট অব এক্সসেপশন হচ্ছে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার সবচেয়ে তীব্রতম রূপ, সার্বভৌমত্বের সর্বোচ্চ প্রয়োগ। এখানে যুক্তি আর প্রায়োগিকতা মিলেমিশে গিয়ে একটা বিশুদ্ধ সন্ত্রাসের জন্ম দেয়। কিন্তু স্টেইট অফ এক্সসেপশন কোনো বিশেষ কালখণ্ড বা সময় হিসেবে ব্যতিক্রম নয়, ব্যতিক্রম হচ্ছে আইনের অবস্থার বিচারে। কারণ সময় হিসেবে জরুরি অবস্থা যেকোনো মাপের হতে পারে। যেমন, আগামবেন হিটলারের থার্ডরাইখের পুরা সময়টাকেই জার্মানির জন্য 'স্টেইট অফ এক্সসেপশন' মনে করেন। যখনই রাষ্ট্র

তার শাসনতন্ত্র নিজেই মানতে পারে না, তার নিজের বানানো আইন নিজেরই ভাঙতে হয়, সেই সময়কেই আগামবেন বলছেন 'স্টেইট অফ এক্সেপশন'। আধুনিক সর্বাত্মক স্বৈরতন্ত্র বা টোটালিটারিয়ানিজমকে এই 'স্টেইট অফ এক্সেপশন' হিসেবেও সংজ্ঞায়িত করা যায়, যার মাধ্যমে ক্ষমতাতন্ত্র তার জনগোষ্ঠীর একটা 'চিহ্নিত' অংশের বিরুদ্ধে বৈধ বা অবৈধ গৃহযুদ্ধ চালায়। এই যুদ্ধ শুধু যে তার রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকেই নিকাশ করে তাই না, অনেক ক্ষেত্রেই একটা নির্দিষ্ট বর্গের মানুষদেরই, যাদের বিদ্যমান রাজনৈতিক বিন্যাসে আর জায়গা দেয়া যাচ্ছে না, তাদের খতম করে দেয়। কীভাবে রাষ্ট্র ক্ষমতা হত্যা করবার জন্য নিজ নাগরিকদের এই বর্গীকরণ করে, সেটার বিশদ ব্যাখ্যা আছে আগামবেনের আগের রচনা 'হোমো সাকের' এ। 'জরুরি অবস্থা'য় না হয় পরে আবার ফিরে আসা যাবে।

'হোমো সাকের' কী? আপনারা জানেন যে হোমোস্যাপিয়েন্স, হোমো ইরেক্টাস, হোমো হ্যাভিলাস, হোমিনিড ইত্যাকারে মানুষের জৈবিক ইতিহাস আলোচনায় 'হোমো' প্রত্যয়টা সব সময় ব্যবহার হয়। বলা হয় যে, হোমিনিড থেকে বিবর্তনের ধাপে ধাপে আমরা হোমোস্যাপিয়েন্স হয়ে উঠেছি। তো হোমো কথাটি গ্রিক এবং লাতিনে নানাভাবে ব্যবহার হয়। 'সাকের' কথাটার আক্ষরিক অর্থ 'পবিত্র', যেখান থেকে ইংরেজিতে 'স্যাকরেড' কথাটার উদ্ভব হয়েছে। কিন্তু শব্দার্থের ইতিহাসে এই কথাটার মানে সবসময় একরকম নয়। হোমো সাকের বলতে লাতিনে দুইটা বিপরীত অর্থ বোঝায় : 'sacred' বা পবিত্র। আবার একই সাথে 'accursed' বা অভিশপ্ত। একটু খেয়াল করলেই বোঝা যাবে, এই দ্ব্যর্থকতাটা আসলে আইন বা সার্বভৌমত্বের মতোই। আগেই আমরা যেমন বলছিলাম, আইন বেআইনী কারণ সে নিজেকে নিজেই রদ করে দিতে পারে, বা সার্বভৌমত্ব একই সাথে আইনের বাইরে এবং ভেতরে অবস্থান করে। তেমনি হত্যার আইনী কথকতা হিসেবে 'হোমো সাকের'ও দ্ব্যর্থক। আমরা দেখব যে কীভাবে আইনী কথকতার ইতিহাসে আইন নিজেই আইন বহির্ভূত হত্যার

আয়োজন করে। এই কথকতার মাধ্যমে কীভাবে যে নিহত হয় আর যে হত্যা করে, দুজনকেই আইনের বাইরের কিছু হিসেবে দাঁড় করায়। একটু বাস্তব উদাহরণ দিয়ে রাখি। একটু খেয়াল করলেই দেখবেন যে ক্রসফায়ার যারা হন এবং ক্রসফায়ার যারা করেন তারা উভয়েই আমাদের জন-মানসে 'আইনের উর্ধ্বে' হিসেবে বিবেচিত। এই সব খুন হওয়া 'সন্ত্রাসী'রা বিচারের যোগ্য নয়, এরকম একটা ধারণা আমাদের মধ্যে কাজ করে। আবার যারা তাঁদের ক্রসফায়ার করেন তারাও 'আইনের উর্ধ্বে'। আগামবেন আমাদের বলেন, আসলে তারা কেউই ঠিক 'আইনের উর্ধ্বে' নন, তারা আইনেরই প্রতিকল্প। সার্বভৌমত্বের কারণেই আইনের ভিত্তি আসলে আইন ভঙ্গের মধ্যেই নিহিত আছে। কাজেই আইনকে সব সময়ই ঠিক করে নিতে হয় সে কার জন্য প্রযোজ্য আর কার জন্য নয়। কার জন্য সে 'প্রয়োগ' হতে পারে, আর কার জন্য 'ভঙ্গ'।

একটা ঐতিহাসিক বর্গ বা চরিত্র হিসেবে 'হোমো সাকের' এর সাক্ষাৎ আমরা পাই প্রাচীন রোমান আইনে। সেই আইনের সংজ্ঞায় হোমো সাকের হচ্ছেন নিষিদ্ধ মানুষ। তাকে মেরে ফেলা যায় কিন্তু ধর্মীয় আচার হিসেবে বলি দেওয়া যায় না। কারণ সে পবিত্র না। প্রাচীন রোমান ধর্মে হোমো সাকের শব্দটি যে অর্থে ব্যবহার হতো, খ্রীস্টধর্মের আবির্ভাব সেই অর্থটিকে বদলে দেয়। ইংরেজিতে এটা 'পবিত্র' অর্থ ধারণ করে। কিন্তু প্রাচীন রোম ধর্মাচারে হোমো সাকের মানে ছিল সমাজ থেকে 'বিচ্যুত', যা একই সাথে 'পবিত্রায়িত' এবং 'অভিশপ্ত' অর্থ ধারণ করে। হিব্রু ভাষায় একই সত্তাটিকে পাওয়া যায় 'কাদোস' নামে। বাস্তব চর্চায় হোমো সাকের বলতে বোঝাতো সমাজ থেকে 'বহিষ্কৃত'/'পরিত্যক্ত' ব্যক্তি, যে সমাজধর্মের সব অধিকার এবং আচার থেকে বঞ্চিত। এবং যাকে হত্যা করলেও হত্যাকারী খুনী হিসেবে পরিগণিত হবে না (আইনের বা নীতির দৃষ্টিতে)। কিন্তু তাকে ধর্মীয় আচারে উৎসর্গ করা যায় না। ঠিক যেভাবে আজকের ক্রসফায়ারে নিহতদের বিচার পাওয়ার যোগ্য বলে বিবেচনা করা হয় না।

আবার 'পবিত্র' অর্থে হোমো সাকের বলতে বোঝায় এমন একটা কিছু যা আইনের বাইরে, আইনের অতীত। ফলে পশ্চিমের রাজতান্ত্রিক ঐতিহ্যে অনেক ক্ষেত্রে হোমো সাকের কথাটি 'সার্বভৌম ক্ষমতা' বা রাজক্ষমতার সাথে গুলিয়ে ব্যবহৃত হয়েছে। শপথ ভঙ্গের কারণও কেউ হোমো সাকের হিসেবে আখ্যায়িত হতে পারে। শপথ প্রাচীন সমাজে একটা শর্ত সাপেক্ষিক আত্মাভিশাপ হিসেবে ছিল। যেমন অনেক সময় আমরাও বলি 'আমি যদি এটা করে থাকি তো আমার মাথায় গজব পড়ুক'। ফলে শপথ ভঙ্গের কারণে কেউ যখন খুন হতেন, তখন ধরে নেয়া হতো এটা ঈশ্বরের প্রতিশোধ। খ্রীস্টপূর্ব পঞ্চম শতকের রোমান আইনে এর নিদর্শন পাওয়া যায় যেখানে বলা হয় কোনো মহাজন যদি তার মক্কেলের সাথে প্রতারণা করেন তো তিনি 'সাকের' হিসেবে পরিগণিত হবেন।

একইভাবে 'হোমো সাকের' এর নির্মাণ আমরা দেখতে পাই প্রাচীন যুগে 'বর্বর' হিসেবে। গোটা মধ্যযুগ ধরে কিছু মানুষ 'ডাইনি' বা 'নেকড়ে-মানুষ' হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে যাদের 'দায়মুক্ত'ভাবে হত্যা করা যায়। আধুনিক যুগের সূচনায় আমরা দেখেছি 'আউটল' নির্মাণ। এই 'বধযোগ্য' মানুষ নির্মাণ প্রথম যে আধুনিক আইন দিয়ে রোধ করবার চেষ্টা করা হয় সেটা হচ্ছে ১৬৭৯ সালের হেবিয়াস কর্পাস আইন দিয়ে ব্রিটেনে। সেটা আমাদের ভিন্ন প্রসঙ্গ, পরে আসব। হত্যার ক্যাটাগরি হিসেবে 'গণপিটুনি' বা 'গণহত্যা'র মধ্যেও এই হোমো সেকেরীয় উপাদান, অর্থাৎ কোন কোন বৈশিষ্ট্যের মানুষদেরকে বিধিবন্ধ বা বিধির-অতীত হিসেবে চিহ্নিত করে 'বধযোগ্য' হিসেবে সংজ্ঞায়িত করবার ব্যাপার ঘটে। যেমন আমরা 'গণহত্যা' বলি কাকে? প্রচলিত অর্থে গণহত্যা বলতে পরিকল্পিতভাবে অনেক বেশি সংখ্যক মানুষকে হত্যা করা বোঝায়। কিন্তু খেয়াল করলে দেখা যায়, গণহত্যার সংজ্ঞা আসলে নিহতের সংখ্যা দিয়ে ঠিক করা যায় না। বরং নিহত মানুষদের নির্মিত পরিচয় এবং তাদের হত্যা করবার পেছনে যে কারণ সেটাই গণহত্যার প্রকৃতিকে তুলে ধরতে পারে অনেক মোক্ষমভাবে। 'গণহত্যা'য় 'গণ' মানে সেই সব মানুষেরা

যারা 'ব্যক্তি' নন। তাদেরকে হত্যা করা হয় ব্যক্তি পরিচয়ের কারণে না, সামষ্টিক কোন পরিচয়ের কারণে, কোন সাধারণ বৈশিষ্ট্যের কারণে। ফলে দেখা যায়, ব্যক্তি নয়, হোমো সাকের আসলে একটা রাজনৈতিক বর্গ যেটা আইনের প্রকৃতিকে নির্ধারণ করে দেয়। 'গণপিটুনি'র ক্ষেত্রেও দেখবেন গণপিটুনির শিকারেরা যত না ব্যক্তি তার চেয়ে বেশি বর্গ—ছিনতাইকারী, পকেটমার, ডাকাত বা অন্যকিছু। ফলে হত্যার আইনী কথকতা বুঝতে গেলে এই বর্গ নির্মাণের প্রক্রিয়াটা বোঝা জরুরি।

আগামবেন প্রাচীন রোমান আইনের রহস্যময় বর্গ এই হোমো সাকের'কেই ব্যবহার করে আইন ও ক্ষমতার সম্পর্কের বিষয়ে কিছু মৌলিক প্রশ্ন তোলেন। তার ১৯৯৫ সালের বই, 'হোমো সাকের : সোভরেইন পাওয়ার এন্ড বেয়ার লাইফ'-এ তিনি দেখান কীভাবে যুগে যুগে রাষ্ট্র কিছু নির্দিষ্ট অপরাধের কারণে কিছু মানুষকে হোমো সাকের ঘোষণা করে, তাদের জন্য নাগরিক অধিকার রদ করে দেয়। এই অধিকারগুলোর প্রথমটি হচ্ছে বিচার পাওয়ার অধিকার। ফলে তারা 'বধযোগ্য' হয়ে যায় এবং তাদের হত্যাকারীরা 'খুনি' হিসেবে চিহ্নিত হয় না। আইন সব সময় নির্ভর করে এই আলোচনার ওপরে যে কে আইনের আওতায়, অর্থাৎ আইন কার জন্য প্রযোজ্য এবং কার জন্য প্রযোজ্য নয়। এবং রোমান-গ্রিক সভ্যতা থেকে একদম প্যালেস্টাইন সভ্যতা পর্যন্ত বা এমনকি সর্বশেষ নাজি জার্মানিতে হিটলারের শাসন, এ সমস্ত কিছুতেই তিনি দেখাচ্ছেন যে আইন কাকে এক্সক্লুড করে আর কাকে ইনক্লুড করে। এটা আইনের প্রকৃতি বোঝার জন্য জরুরি। কারণ আইন জিনিসটা সম্ভব হয়ে ওঠে এর আওতাধীন জনগোষ্ঠীর এই ধরনের বিভাজনের ওপর। ইতিহাস জুড়েই এই বিভাজন আইনের অনুষঙ্গ। আগামবেন বলছেন, হোমো সাকের হচ্ছে সেই মানব জীবন যা আইনী ব্যবস্থার সাথে পুরাপুরি যুক্ত হয় 'আইন-বহির্ভূত' একটা কিছু হিসেবে। ফলে হোমো সাকের আইন থেকে বিচ্যুত, আবার একই সাথে আইনের ভেতরেও বটে। এটা অনেকটা সার্বভৌমত্বের মতোই যেটা একই সাথে আইনের ভিত্তি আবার

একই সাথে আইনকেও রদ করতে পারে। আগামবেন সার্বভৌমত্বকে দেখেন জরুরি অবস্থার নির্ধারক হিসেবে। সার্বভৌমত্ব প্রসঙ্গে হবস্ আমাদের যে ধারণা দেন, আগামবেন তার বিপরীতে সার্বভৌমত্বকে তার কার্যকলাপ দিয়ে বুঝতে চান। তিনি মনে করেন, সার্বভৌমত্ব আইনের অতীত কারণ সেটা আইনকে রদ করবার ক্ষমতা রাখে। এখানে বিষয়টা একটু দুর্বোধ্য ঠেকতে পারে, এজন্যই আমি ক্রসফায়ারের উদাহরণ টানলাম শুরুতে এই বলে যে, যারা ক্রসফায়ার হন বা যারা করেন, উভয়েই আসলে আইনের উর্ধ্বে। আবার একই সাথে ক্রসফায়ার আইনেরই একটা প্রতিকল্প হিসেবে কাজ করছে। কাজেই এটা আইনেরই অনুষঙ্গ।

হোমো সাকের এর বাংলা আমি করেছি নমানুষ, মানে যে ঠিক মানুষ না, নমানুষ। রাজনৈতিক মানুষ তথা নাগরিকের আবির্ভাব সম্ভব হয়েছে এই নমানুষ নির্মাণের মধ্য দিয়ে। যেভাবে সভ্য সমাজ সভ্য হতে পারে অসভ্যদের সামনে রেখে। অসভ্যরা না থাকলে সভ্যতার ধারণাও টিকে থাকে না। এমনি হাজারো উপমা দেয়া যেতে পারে। কিন্তু আমাদের আপাতত বোঝার বিষয় হচ্ছে ঠিক কীভাবে আমরা আগামবেনের এই 'নমানুষ' বা জরুরি অবস্থার ব্যাখ্যাকে আমাদের সমাজ পরিস্থিতি বিশ্লেষণের কাজে লাগাতে পারি? হোমো সাকের বা নমানুষ আসলে শুধু পৌরাণিক চরিত্র নয়, রোমান মিথোলজির বিষয় নয়। আগামবেন বলছেন, এটা আরো স্পষ্টত দেখা যায় আধুনিক জাতিরাষ্ট্রের ক্ষেত্রে। জাতিরাষ্ট্র মাত্রই তার ইতিহাস-ঐতিহ্যের নামে আইনকে একটা সিভিল রিলিজিওন হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে। কিন্তু নমানুষরা এই রাষ্ট্রধর্মের বাইরের লোক। এই কারণে সে বধযোগ্য, তাকে মেরে ফেলা যায়। এবং তাকে মেরে ফেললে আইনের কোনো ব্যত্যয় ঘটে না এবং যে মেরে ফেলবে সে আসলে 'হোমিসাইড' করে না। 'হোমিসাইড' হচ্ছে হত্যাকাণ্ডের আইনি নাম। এই নমানুষদের স্থান ও কালভেদে এত জায়গায় এতরূপে এত অর্থে পাওয়া যাচ্ছে যে, আগামবেন মনে করেন এটা আসলে আলাদা ধরনের মানব জীবন। হোমো সাকের এর জায়গায় গ্রিকরা ব্যবহার করতো দুইটা শব্দ, জো আর

বায়োস। বায়োস অর্থাৎ হচ্ছে বায়োলজিকাল মানুষ। আর জো'রা হচ্ছে ওই নমানুষ।

এই বিভাজনের প্রথম শিকার হন যারা ঠিক সিটিজেন না। সিটিজেন না বলতে, গ্রিক নগর রাষ্ট্রগুলিতে যেটা দেখা যেতো, একদম প্রাচীর ঘেরা নগর রাষ্ট্রের ভেতরের মানুষেরাই, শুধু নাগরিকরাই, নাগরিক অধিকারের অংশ। তার বাইরে যে বিশাল সমাজ, মানুষ, তারা সবাই বর্বর হিসেবে বিবেচিত। যেমন আজকের দিনের 'ভিলেইন' শব্দটিও পুরানা লাতিনে ব্যবহৃত হতো সাধারণত নগরের বাইরে বসবাসরত ভূমিদাস কৃষকদের ক্ষেত্রে যাদের নগরে প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। 'ভিলেজ' বা 'ভিলা' শব্দটিও এসেছে একই শব্দমূল থেকে। নগরের আইন, সেটা অধিকার হোক কী শাস্তি বিষয়ক, সেটা তাঁদের জন্য প্রযোজ্য নয়। ফলে ভিলেইন শব্দটি শব্দার্থের ইতিহাসে ঠিক কীভাবে আমাদের সিনেমার অর্থে ভিলেইন হয়ে গেল, কেনো হলভর্তি সিনেমার দর্শকেরা সবাই মিলে সিনেমার শেষে নায়কের হাতে বা অদৃষ্টের হাতে তাঁদের হত্যা কামনা করেন সেটা ভেবে দেখবার মতোই বিষয়। একইভাবে দেখবেন ইতিহাসে রাজা আর সম্রাটদের বীরত্বগাঁথা রচিত হয় তারা কত বেশি 'বর্বর' হত্যা করলেন তাঁর ওপর নির্ভর করে। আমাদের রাম-লক্ষণরা যেমন একেকটি ব্রহ্মাস্ত্র দিয়ে হাজারে হাজারে রাক্ষস মারতেন। মধুসূদন তার 'মেঘনাদ বধ' কাব্যে আমাদের প্রথম ইশারা দেন, আসলে রাক্ষস বলতে কাদেরকে বোঝানো হতো। আর্য সভ্যতা কাদের রাক্ষস হিসেবে চিহ্নিত করে নিজেদের সভ্যতাকে সম্ভব করে তুলেছিল, সেটা আর আমাদের অজানা নয়। সেই রামায়ণের যুদ্ধ কিন্তু এখনো থামেনি। নিওলিবারেল যুগে সেই যুদ্ধের একটি অংশের নাম অপারেশন গ্রীন হান্ট, আর এখানে রাক্ষস বা নমানুষ হচ্ছে মধ্য ভারতের আদিবাসীরা, যাদের হোমো সাকেরীয় নাম আজকে 'মাওবাদী'। ইউরোপের মধ্যযুগে এদেরই আরেক অংশকে আমরা দেখেছি বা ডাইনি বা নেকড়ে মানব হিসেবে খুন হতে। আজকের দিনেও উদাহরণের কোনো কমতি নেই। বৈশ্বিক পরিসরে আজকে আমরা

তাঁদের বলি টেরোরিস্ট, আরো ভালভাবে বললে আজকের পৃথিবীর গ্লোবাল হোমো সাকের হচ্ছে 'মুসলমান টেরোরিস্ট'। আইনের তাদের জন্য প্রযোজ্য না। ওসামা বিন লাদেন থেকে শুরু করে গুয়ানতামো বে'র বন্দীরা, এরা সবাই নমানুষ।

হোমো সাকের নির্মাণের আরেকটা ইন্টারেস্টিং উদাহরণ হতে পারে বাংলাদেশের বিদ্যমান 'উপজাতি' ডিসকোর্সটা। আপনারা জানেন বাংলাদেশ ভূখণ্ডের বাঙালি ছাড়া অন্য জাতিসত্তাগুলোকে কী নামে ডাকা হবে সেটা নিয়ে অনেকদিন ধরে একটা তর্ক চলছে। তারা বলছেন, তারা উপজাতি নন, আদিবাসী; আর সরকার বলছেন তারা উপজাতি। এই তর্কের সূত্রে আমি উপজাতি কথাটার এটিমোলজি বা শব্দার্থের ইতিহাস খুঁজতে গেলাম। খোঁজ করতে গেলাম প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে 'উপজাতি' কোন অর্থে ব্যবহার হতো। দেখা গেল ধর্মমঙ্গল কাব্যে এক বীর বলছেন, 'কেমনে বধিব তারে নয় উপজাত'। মানে বীর এক সংশয়ে পড়েছেন এমন একজনকে বধ করতে গিয়ে যিনি উপজাত অর্থাৎ উপজাতি নন। তার এই নৈতিক সংকটটিকে ঘুরিয়ে নিলে কী দাঁড়ায়? ঘুরিয়ে নিলে কী দাঁড়ায় যে ব্যক্তিটি যদি উপজাতি হতো তাহলে তাঁকে বধ করবার ক্ষেত্রে কোনো মোরাল ডিলেমা তৈরী হতো না বীরের। কারণ বীরধর্মে সেটা সিদ্ধ। কাজেই উপজাতি হচ্ছে নমানুষ, হোমো সাকের। এই মেরে ফেলার মতো মানুষের বর্গ তৈরির ব্যাপারটা যেখানেই রাষ্ট্রের উপস্থিতি দেখবেন সেখানকারই সাহিত্যে এটার এক ধরনের প্রমাণ রয়ে গেছে। প্রমাণ রয়ে গেছে যে, ইতিহাস জুড়েই রাষ্ট্র বা আইন সবসময় এক ধরনের মানুষ চিহ্নিত করতে থাকে এবং তাদেরকে নাগরিক অধিকার বা তথাকথিত আইনের অধিকারের বাইরে রেখে, আইনের সর্বোচ্চ প্রয়োগ, মানে সার্বভৌম ক্ষমতার প্রয়োগ তাদের জন্য প্রযোজ্য হয়ে যায়।

ফলে ডিলেমাটা হচ্ছে তারা একই সাথে আইনের মধ্যে, আবার একই সাথে আইনের বাইরে। আইনের বাইরে যদি এই মানুষেরা না থাকে আইন নিজেই ভিত্তি পায় না। কারণ আইনের আরেকটা ফাংশন হচ্ছে, পতিত জীবন, যাকে আগামবেন বলছেন

'বেয়ার লাইফ', সেখান থেকে মানুষকে আস্তে আস্তে 'গুড লাইফ'-এ নিয়ে আসতে হবে। এই প্রক্রিয়াটাকেই আপনারা 'মূল স্রোতে নিয়ে আসা', 'উন্নয়ন' করা, 'স্বাক্ষরতা' বা 'সভ্য করা' হিসেবে পত্র-পত্রিকায় জানতে পারেন। কুনাগরিকদের আইন, শাস্তি ও শিক্ষা দিয়ে সুনাগরিক করে তোলা রাষ্ট্রের নিয়মিত কর্তব্যের একটি। ফলে কিছু 'কুনাগরিক' না থাকলে রাষ্ট্রের বেকার হয়ে পড়ার সম্ভাবনা থাকে। ফলে কুনাগরিক তৈরী করাও রাষ্ট্রের একটি নিয়মিত কাজ। সুনাগরিক তৈরীর মতোই। এই কুনাগরিক তৈরীর অন্যতম প্রধান কারখানা হচ্ছে জেলখানা যেখানে; ক্রপোৎকিনের মতে, রাষ্ট্র পরিচালিত বিশ্ববিদ্যালয়ে অপরাধের উচ্চশিক্ষা দেয়া হয়। আমাদের সাম্প্রতিক বাংলাদেশে নতুন নমানুষ হিসেবে প্রথমে চিহ্নিত হয় বাম চরমপন্থীরা। পশ্চিমবঙ্গে জরুরি অবস্থা জারি করে যে হত্যাযজ্ঞ চালানো হয়েছিল ১৯৭০-এর দশকে, এখানে আমরা তার আরেক মিনি সংস্করণ দেখলাম 'অপারেশন ক্লিনহার্ট' নামে। র‍্যাব গঠনের পরেও তাঁদের প্রথম শিকার হয়েছেন বাম চরমপন্থীরা, পরে ডান চরমপন্থীরা। 'সর্বহারা', 'চরমপন্থী' বা 'জেএমবি', 'জঙ্গি' বা পত্রিকার ভাষায় 'এতটি' মামলার আসামীরাই হচ্ছে সেই সব বর্গ বা ক্যাটাগরি যাদের আমরা এতক্ষণ হোমো সাকের বললাম।

কাজেই আইন না মানার শর্তগুলি আইনের মধ্যেই উপস্থিত থাকে। ত্রাসই হচ্ছে তার ভিত্তি এবং এই ত্রাস না থাকলে আইন কার্যকর হয়ে উঠতে পারে না। ফলে তাকে সবসময় এই ত্রাসটা বজায় রাখবার জন্য হলেও আইন ভাঙতে হয়। আইনকে আইন ভাঙতে হয়। আধুনিক আইনের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় আয়রনি এইটাই। আইনের গোড়া থেকেই আইনের এই এখতিয়ার আছে 'নমানুষ'কে সংজ্ঞায়িত করবার। একই সাথে 'মানুষ' সংজ্ঞায়িত করবার। প্রাচীন গ্রীসে শাসিত জনগোষ্ঠীর এই বিভাজনকেই বলা হত 'জো' এবং 'বায়োজ'। এই বিভাজনের মাধ্যমেই আইন মানুষের জীবনের রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ হাতে তুলে নেয়। ফলে মানুষের 'নিজের হাতে আইন তুলে নেয়া' নিষিদ্ধ হয়। রাজনৈতিক

মানুষ বা সিটিজেনের বিপরীতে আমরা ইতিহাসে সবসময়ই এই 'নমানুষ' দেখতে পাই। এই বিভাজন শুধু আইন নয়, রাষ্ট্রের সাথে ব্যক্তির সম্পর্কের নিরিখেও নির্ধারিত হয়। আরিস্ততল, আগামবেন বলেন, রাজনৈতিক জীবনকেও সংজ্ঞায়িত করেন এই ধরনের ইনক্লুশন এবং এক্সক্লুশনের মাধ্যমে। মনে করা যেতে পারে তাঁর সেই উক্তি, 'দাসরা মানুষ নয়, জীবন্ত হাতিয়ার; তাঁদের প্রতি সদয় হওয়া উচিত'।

ফলে আমরা আজকের আলোচনায় সম্ভবত এ পর্যন্ত পৌঁছাতে পেরেছি যে, ক্রসফায়ারকে আর যাই হোক, 'আইন-বহির্ভূত', 'বিচার-বহির্ভূত' হত্যাকাণ্ড বলে অন্তত ভাবনা-চিন্তার ক্ষেত্রে খুব বেশি সুবিধা করা যাবে না, সমস্যার গোড়ায় পৌঁছানো যাবে না। কারণ এর শর্তাদি আইন ও বিচারের মধ্যেই রয়ে গেছে। এটার শেকড় আরো অনেক অনেক ভেতরে। ক্রসফায়ারের ইতিহাস আসলে নতুন না। মিডিয়া এটাকে এমনভাবে উপস্থাপন করে, যেন র‍্যাব বলে একটা বাহিনী হওয়ার আগে এটার কোনো অস্তিত্ব ছিল না। একই ধারণা আমরাও পোষণ করি। কিন্তু স্বাধীন বাংলাদেশের ইতিহাসে সিরাজ সিকদার থেকেই ক্রসফায়ার যুগের শুরু, তার আগেও এই ধরনের হোমো সাকেরীয় হত্যা ছিল। আসলে আমাদের বিস্মৃতি খুব প্রবল। আজকে আমরা নারায়ণগঞ্জের ঘটনাকে সেভেন মার্ডার বলছি, আমরা ভুলে যাই যে এই এপ্রিল মাসেই—১৯৭৪ সালের ৪ এপ্রিল—আরেকটা সেভেন মার্ডার ঘটেছিলো এবং ঐ লোকগুলিও ছিলো নারায়ণগঞ্জের লোক। ঘটেছিলো যদিও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এসেছিলো নারায়ণগঞ্জের কোহিনুর বলে একজন সন্ত্রাসী, তার সাঙ্গ-পাঙ্গ নিয়ে। তাদেরকে মেরে ফেলা হয় মোহসিন হলে, অভিযোগ রয়েছে কাণ্ডটি ঘটেছিল সে সময়ের ছাত্রলীগ নেতা শফিউল আলম প্রধানের নেতৃত্বে। এবং সে সময় সাথে সাথে পুলিশ তাঁদের এ্যারেস্ট করে। তারপরই আবার উচ্চতর নির্দেশে ছেড়ে দেওয়া হয়। ছেড়ে দেওয়ার পর আবার তাদেরকে এ্যারেস্ট করা হয়, শফিউল আলম প্রধানের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়। এবং জিয়াউর রহমান ক্ষমতায় এসে তাকে

আবার মুক্ত করেন। অবাক হওয়ার কারণ নেই যে তারপর থেকেই তিনি বিএনপির একনিষ্ঠ একজন মিত্র।

কাজেই রাষ্ট্র যেমন আইন তৈরী ও প্রয়োগ করে তেমনি তার বিরুদ্ধে ইনডেমনিটি বা ইমপিউনিটিও তৈরী করে। এই বিচারে রাষ্ট্র মানেই আইন ভাঙ্গা-গড়ার খেলা। এই আইন ভাঙা-গড়ার খেলার নামই রাজনীতি। রাজনীতি মানে হচ্ছে রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতার বিন্যাস। আমরা ভোট দিয়ে নিজেদের ব্যক্তি স্বাধীনতার একটা অংশ জমা দিয়ে 'সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা' করি বলেই রাজনীতি বলে কিছু একটা সম্ভব হয়ে ওঠে। রাষ্ট্র বলে কিছু একটা সম্ভব হয়ে ওঠে। যেমনটা বলেছিলেন হবস্। ফলে রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত 'আইন ও বিচার ব্যবস্থা' আসলে একটা বিশাল ইউটোপিয়া, এই জিনিস কোনো যুগে কোথাও কস্মিনকালেও ছিল না। কারণ আইন ও রাজনীতির অভিন্ন ভিত্তি হচ্ছে সার্বভৌমত্ব। ইনারা একসাথেই রাষ্ট্রে বসত করেন। সাম্প্রতিক সময়ে অনেক হত্যা মামলার আসামীদের রাষ্ট্রপতির ক্ষমা প্রদানের মধ্য দিয়ে সেই সার্বভৌমত্ব প্রসূত ইমপিউনিটির একটা বৈধ চর্চা আমরা দেখলাম। অবৈধ পথে ইমপিউনিটি তো আছেই। আসলে বৈধতা আর অবৈধতার ফারাকটা আমাদের নৈতিক মানসে যতটা ক্রিয়াশীল থাকে ক্ষমতার চর্চায় ততটা থাকে না। এই ফারাক আসলে খুবই অস্পষ্ট এবং অনেক ক্ষেত্রে ফারাক আসলে নেই।

পরের সেভেন মার্ডার, অর্থাৎ নারায়ণগঞ্জের সেভেন মার্ডারের পরেও আমাদের কাছে এই সংক্রান্ত কথকতাগুলি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। যদি না ঠিকভাবে রাষ্ট্রকে, রাষ্ট্রের ক্ষমতাকে, রাষ্ট্রের চরিত্রকে, রাষ্ট্রের ভিত্তিকে প্রশ্ন করা না যায়, বা রাষ্ট্রের খোদ মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার যে প্রক্রিয়া, এর যা যা অনুষঙ্গ, এগুলোকে যদি প্রশ্ন করা না যায়, তাহলে সম্ভবত গুম-খুন নিয়ে মানবাধিকার টাইপের আহাজারি করে আমরা খুব বেশি সুবিধা করতে পারবো না। এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে এই রাষ্ট্রের সীমা কতটুকু? কোন কোন হত্যাকাণ্ডকে আমরা রাষ্ট্রীয় হত্যাকাণ্ড বলব? আমি বলব—এমনকি বিশ্ববিদ্যালয়ের একদলের ছাত্র যখন আরেকদলের

ছাত্রকে মেরে ফেলে সেটাও রাষ্ট্রীয় হত্যাকাণ্ডই। এই সময় রাষ্ট্র আমাদের সমাজ জীবনের এত বেশি অলিগলিতে, এত বেশি রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঢুকে গেছে যে এই বিভাজনটা করতে পারা একটু মুশকিল। তারপরও রাষ্ট্র বলতে এই মুহূর্তে শুধু আওয়ামী লীগ বুঝলে হবে না, রাষ্ট্র বলতে এই মুহূর্তে বিএনপিও। যেই সমস্ত রাজনৈতিক দলের রাষ্ট্র ক্ষমতায় যাওয়ার প্রকাশ্য ঘোষণা আছে এবং সেই উদ্দেশ্যে তারা কার্যকলাপ চালায় তারা প্রত্যেকে আসলে রাষ্ট্রেরই অংশ, ইনাদের মিলিয়েই রাজনীতি।

প্রশ্ন উঠতেই পারে যে অনেক রাষ্ট্রই তো পৃথিবীতে রয়েছে যারা আইন মানে, নিজেদের নাগরিকদের ওপর ত্রাস সৃষ্টি করে না। আমার যুক্তি হচ্ছে, তারা এই সন্ত্রাসটাকে আউট সোর্স করতে পারে। এদেরই কিছু কিছু রাষ্ট্রকে আমি সুপার-স্টেইট বলি, সুপার-রাষ্ট্রও বলা যায়। এই সন্ত্রাস আউট সোর্সিং এর বিষয়টা আলোচনার শেষ অংশ। তৃতীয় বিশ্বের এই সব হত্যাকাণ্ডের যে একটা সাম্রাজ্যিক ছক আছে সেটা নিয়ে আমি আগে যেহেতু লিখেছি, সেটা আমি শেষে রাখছি। তার আগে কথকতার আরেকটু জায়গা আমি সেরে নিই। সেটা হচ্ছে আজকের এই আলোচনা থেকে আমরা সহজেই ফুকোর সেই অনুসিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারি যে, আসলেই হত্যা হচ্ছে সেই বিন্দু যেখান থেকে অপরাধ আর ইতিহাস এক হয়ে যায়, অপরাধ আর আইনও এক হয়ে যায়। এমনকি হত্যাকারীকে বিচারের মাধ্যমে বৈধভাবে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে আইন নিজেও হত্যাকারী হয়ে যায়। যে লোকটি হয়তো কাউকে হত্যা করবার কারণেই জেল খাটছে, সেই লোকটিই রাষ্ট্রের নির্দেশে জল্লাদ হিসেবে আরেকটি হত্যা ঘটায়। কী অদ্ভূত! পরের হত্যাটির জন্য তার কিন্তু আগের হত্যার সাজাও কমে যায়। কাজেই আইন নিজেই অদ্ভূত এক বৈপরীত্যে ঠাসা। আইনের প্রতি মান্যতার মনোভাব আমাদের এতই প্রবল যে এই বৈপরীত্যগুলোকে আমরা খুব কমই দেখতে পাই, প্রশ্ন তোলা তো অনেক পরের ব্যাপার।

একই সাথে আমি বারবার বলছি, ইতিহাসে হত্যা যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে হত্যা নিয়ে কী বলা হল, কী লেখা

হল, কী ভাবা হল—এই সবকিছুই। কারণ হত্যার কথকতাই আরেকটা নতুন হত্যার প্রেক্ষাপট সাজায়। একটা হত্যা নিয়ে আমরা কী বলছি, কী শুনছি, কী ভাবছি, কী লিখছি, এগুলি পরের হত্যার জন্য মঞ্চ সাজায়। ইতিহাসের গতিপথটাই এরকম। একারণেই খোদ ইতিহাসের চর্চাই কখনো কখনো হয়ে ওঠে হত্যার কথকতার অংশ। জাতীয়তাবাদী ইতিহাস রচনাও প্রায়শই কোনো না কোনো নমানুষ তৈরী করে, হোমো সাকের তৈরী করে। আমরা মনে করতে পারি ১৯৭১ সালে কামরুল হাসানের আঁকা সেই বিখ্যাত পোস্টারটির কথা, 'এই জানোয়ারদের হত্যা করতে হবে'। পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদীরা যেমন মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতায় গণহত্যা চালিয়েছে বাঙালিদের 'ইসলাম ও পাকিস্তানের শত্রু' হিসেবে চিহ্নিত করে, তেমনি বাঙালি জাতীয়তাবাদীরাও স্বাধীনতা উত্তরকালে হত্যার কথকতা দাঁড় করিয়েছে যার সর্বশেষ চর্চাটি আমরা দেখলাম শাহবাগ আন্দোলনের সময়ও, সবকিছু ছাপিয়ে এই বিশাল সামাজিক আন্দোলনকে 'ফাঁসি'তে আটকে থাকতে। কাজেই ইতিহাস চর্চা সবসময়ই হত্যার কথকতার একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে দাঁড়ায়। ফিলিস্তিনে ইহুদীদের পূণ্যভূমির দাবি তো আসলে একটা ঐতিহাসিক দাবি। বাবরি মসজিদ নিয়ে যে হিন্দু-মুলমান সংঘাত সেটাও তো একটা ঐতিহাসিক দাবির ওপরেই দাঁড়িয়ে। এই ইতিহাস চর্চার ফলাফল হিসেবে আমরা গত এক শতাব্দীতে কম রক্তপাত তো দেখলাম না।

একজন ফরাসি অ্যানথ্রোপলোজিস্ট আছেন, আমার খুব প্রিয় অ্যানথ্রোপলোজিস্ট—পিয়েরে ক্লস্ত্রে—তিনি লিখেছেন, এযাবৎ কালে দেখা গেছে যেসব সমাজের লিখিত ইতিহাস আছে, ঐসব সমাজে সন্ত্রাসী রাজনৈতিক ক্ষমতা আছে। যে সব সমাজের লিখিত ইতিহাস নাই, সেসব সমাজের সন্ত্রাসী রাজনৈতিক ক্ষমতা নাই। ঠিক পার্বত্য চট্টগ্রামে যে ধরনের সমাজের কথা আমি আগে বললাম। অর্থাৎ লিখিত ইতিহাস থাকবার সাথে সন্ত্রাসী রাজনৈতিক ক্ষমতার উপস্থিতির একটা সম্পর্ক আছে। যেসব সমাজের লিখিত ইতিহাস নাই, সেগুলি হচ্ছে মৌখিক ইতিহাসের সমাজ। সেখানে

অথেনটিসিটি, অর্থাৎ কোনটা ঠিক, কোনটা বেঠিক, সেটা আধুনিক ইতিহাসের মতো এত গুরুত্বপূর্ণ নয়। অতীত সেই ইতিহাস বা স্মৃতিচর্চার ক্ষেত্রে মৃত কোনো জিনিস নয়। অতীতকে সেখানে বর্তমানের প্রয়োজনে ঢেলে সাজিয়ে নেওয়া যায়। আধুনিক ইতিহাস সেটাকে বলে 'ইতিহাস বিকৃতি'। বলে বটে, কিন্তু নিজেও রাজনৈতিক প্রয়োজনে সেটা করতে পিছু পা হয় না। আর ইতিহাসবিদ মাত্রই জানেন যে, সহীহ ইতিহাস বলে আসলে কিছু নাই, সব ইতিহাসই আসলে 'রচিত', হতে পারে কোনো জিনিয়াস সেটা রচনা করেছেন, কিন্তু সেটা রচিতই। লিখিত ইতিহাসের সাথে কথ্য ইতিহাসের পার্থক্য কী? পার্থক্য হচ্ছে, লিখিত ইতিহাস নির্ভর করে আইনি ভিত্তির ওপরে, অথেনটিসিটির ওপরে; যেমন স্বাধীনতার ঘোষণা যে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান দিয়েছিলেন এইটা এখন আইনসিদ্ধ সত্য। কিন্তু কথ্য ইতিহাসে ঐ সুযোগটা আছে যেখানে কোনো আইনসিদ্ধ সত্য নাই। যারা সেই ইতিহাসে বাস করেন, তারা নিজেদের সুবিধা মতন ইতিহাস বা স্মৃতি বদলে নেন। তারপরও এটা আসলে ইতিহাসই। কারণ আগেই বললাম, অবিকৃত ইতিহাস বলে কোনো কিছু সম্ভব নয়।

তো আমরা দেখতে পাচ্ছি, ইতিহাস চর্চার সাথে হত্যার কথকতার একটা অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক আছে। যেমন বাংলাদেশে আজকে আমরা দেখতে পাই রাজনৈতিক হত্যাকে ঐতিহাসিক কথকতার সাথে যুক্ত করবার একটা চেষ্টা থাকে। অনেক ক্ষেত্রেই গুম-খুনের প্রতিবাদ করলে 'মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিরোধী' হয়ে যেতে পারে বিষয়টা, যেহেতু এই চেতনার ঐতিহাসিক দাবিদার দলটি এখন রাষ্ট্র ক্ষমতায় আছে। নারায়ণগঞ্জে ত্বকি হত্যার পরে শামীম ওসমানও বলেছেন, মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষ শক্তি ত্বকী হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে। কিছুদিন আগে ফেসবুকে লিখেছিলাম, আমরা সবাই আসলে কম-বেশি নারায়ণগঞ্জেই থাকি। আমি আসবো এসব বিষয়ে। তো এই এখান থেকে আর কী ছিলো বলার জন্য আমার পকেটে? হ্যাঁ, হত্যার কথকতা বা ডিসকোর্স হিসেবে 'গুম'। গুমের

সাথে হত্যার পার্থক্যটা কী? পার্থক্যটা হচ্ছে আইনী ব্যাখ্যার পার্থক্য। গুম আরো বেশি করুণ, আরো বেশি মারাত্মক। মানে ক্ষমতার জায়গা থেকে দেখতে গেলে গুম অনেক বেশি কার্যকরী। ক্ষমতার নিজস্ব একটা চরিত্র আছে। ক্ষমতা যখন অর্পিত হয় কারো হাতে, এই ধরনের খুন করবার ক্ষমতা; সেই ক্ষমতা তখন নিজেই ইতিহাসের চরিত্র ধারণ করে চালকের আসনে বসে যায়। যখন সেই ক্ষমতা টোটালিটারিয়ান হয়ে ওঠে, যে মনে করে যেকোনো ভিন্নমতকেই আমি একদম নাই করে দেব, তখন বিষয়টি কী দাঁড়ায়? আমরা জর্জ অরওয়েলেন উপন্যাস '১৯৮৪'তে দেখি যে, কল্পিত ওশেনিয়া নামের সেই দেশটিতে শুধু একজন মানুষকে যে গুম করে দেওয়া হত, তা না। মিনিস্ট্রি অব ট্রুথ, মানে সত্য বা তথ্য মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব ছিলো যাদেরকে গুম করে দেয়া হলো তাদের জন্ম থেকে শুরু করে সবকিছু ইরেজ করা। পরে খুঁজতে গিয়ে দেখা যাবে ঐ নামে কখনো কেউ যে ছিলো এটাই খুঁজে পাওয়া যাবে না। তো গুমের ক্ষেত্রে এরকমই ঘটে। প্রথমত, এটা আইনকে কলা দেখানোর একটা কৌশল। কারণ আইনের দৃষ্টিতে 'মৃতদেহ উদ্ধার' না হওয়া পর্যন্ত কেউ মৃত নন। ফলে এক্ষেত্রে আইনীভাবে এটাকে হত্যা হিসেবে প্রমাণ করা যায় না। ভুক্তভোগীরা জানেন, এটা কত বড় একটা নির্মমতা হতে পারে। ধরেন একটি লোককে গুম করে ফেলা হলো। ধরা যাক আমাকেই। এখন আমার ব্যাংকে কিছু টাকা আছে। আমার পরিবারের টাকাটা দরকার। আমি যাকে নমিনী করে গিয়েছি তিনি টাকাটা তুলতে পারবেন না। যতক্ষণ পর্যন্ত আমার মৃতদেহ উদ্ধার না হচ্ছে। কারণ আইনের দৃষ্টিতে আমি তখনও মৃত না। আর যেহেতু আমি মৃত না, সেহেতু ঐ টাকা ক্লেইম করা যাবে না। ব্যাংক দেবে না সেই টাকা।

আইনের মধ্যেই যে ফ্রাংকেনস্টাইন হয়ে ওঠার একটা প্রবণতা আছে সেটা ইংল্যান্ডের আইনজ্ঞরা টের পাচ্ছিলেন সেই সপ্তদশ শতকের দিকেই। ১৬৬৯ সালে একারণেই ইংল্যান্ড আরেকটি আইন তৈরি করে যার নাম হ্যাভিয়াস কর্পাস। এখানে কর্পাস বলতে আসলে শরীর বোঝায়। এই আইনটার মুল বক্তব্য হচ্ছে যখন কোনো

আইনী বাহিনী কাউকে নিজেদের হেফাজত বা কাস্টডিতে নেয়, সেটা গ্রেফতারই হোক বা আটকই হোক, তখন আইনের বা কোর্টের ক্ষমতা আছে সেই বাহিনীকে হুকুম দেয়ার সেই ব্যক্তিকে 'সশরীরে' আদালতে হাজির করতে। বাংলাদেশের আইনও যেহেতু ইংলিশ কমন ল'য়ের ভিত্তিতে তৈরি, এখানেও ২৪ ঘণ্টার মধ্যে আটককৃতদের আদালতের কাছে সমর্পন করবার বিধান রয়েছে। না করলে কেউ হ্যাভিয়াস কর্পাসের আবেদন করতে পারেন, বা আদালত নিজেই আদেশ দিতে পারেন। আমাদের দেশে ১৯৭০-এর দশকে কিছু হ্যাভিয়েস কর্পাস হয়েছিলো। কিন্তু পরবর্তী সময়ে আইনের এই বিধানটি এড়িয়ে যাওয়ার উপায় হয়ে দাঁড়ায় কারো কাস্টডি বা হেফাজত স্বীকার না করা। যেটা আমাদের বাহিনীগুলো এখন করে। প্রথমে স্বীকার করে না যে গ্রেফতার করেছে, পরে দেখা যায় 'বন্দুকযুদ্ধে' সেই লোক মারা পড়েছে। আইনী বাহিনী যদি স্বীকার না করে যে, কেউ তাদের হেফাজতে আছে, তাহলে আদালত হেভিয়াস কর্পাস জারি করতে পারে না। এর ফলেই হ্যাভিয়াস কর্পাস খুব একটা কার্যকর হয়ে ওঠেনি কখনো।

হত্যার কথকতার মধ্য দিয়ে আরেকটা কাজ হয়, সেটা হচ্ছে গুম, হত্যা এগুলির এক ধরনের স্বাভাবিকীকরণ হয়। এক ধরনের নরমালাইজেশন করা হয়। এতে আমরা অভ্যস্ত হয়ে উঠি। হত্যা আমাদের জীবনের আটপৌরে ব্যাপার হয়ে ওঠে। আমরা এই আশা করতে করতে বাঁচি যে, মরলে মরবে আর কেউ, আমি না। ভুলে যাই, যে মরে গেছে সেও এমনটাই ভাবত। গত পরশুদিন ৮০'র দশকে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েছে এরকম একজন আমাকে বলছিলেন, তারা সাত-আট বছরে অনার্স শেষ করেছেন, কথায় কথায় নাকি তখন বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ হতো। এখন নাকি অনেক ভালো অবস্থা। আমি বললাম, আপনার কী মনে হয়, ভালো অবস্থা কিছু না, যেটা ঘটেছে সেটা হচ্ছে আমাদের সহ্য ক্ষমতা বেড়েছে? ঘটনা এখনো ঘটে কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ হয় না। আগে একটা মার্ডার মানে তিন মাস চার মাস বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ। এখন মার্ডার ঘটে যায় সকাল বেলা, দুপুর বেলাই বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস হয়। এগুলি

আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের অংশ হয়ে উঠছে। এই যে স্বাভাবিকীকরণ প্রক্রিয়া, এই প্রক্রিয়াগুলি গুরুত্বপূর্ণ। এবং তার মধ্যে আমরা কোনটাকে কী নামে ডাকছি, কীভাবে ব্যাখ্যা করছি, কীভাবে ভাবছি সেটা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। এখন আমি দু'টা সাম্প্রতিক উদাহরণ দিবো এই কথকতা কীভাবে এই স্বাভাবিকীকরণের কাজটা করে সেটা নিয়ে। প্রেক্ষাপট আবারো নারায়ণগঞ্জ।

সর্বশেষ নারায়ণগঞ্জের সেভেন মার্ডার। ২৭ এপ্রিল সাতটা লোক হারিয়ে গেল। কথিত আছে দুটা গাড়িতে এসে র‍্যাব পরিচয়ে তাদেরকে তুলে নিয়ে যাওয়া হলো। তুলে নিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে একটা ব্যাপক হইচই পড়ে গেল। আমি ঐ সময় খবরের কাগজ খুব একটা পড়ছিলাম না। তো, পরদিন ইন্টারনেটে উঁকি মেরে খবরের কাগজে দেখলাম যে, আওয়ামী লীগের নীতিনির্ধারকদের অন্যতম একজন, সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত, তিনি একটা কথা বলেছেন। ২৮ এপ্রিলের 'প্রথম আলো'র খবরের[৩] শিরোনাম 'গুম-অপহরণ সীমা অতিক্রম করেছে : সুরঞ্জিত'। খবরের প্রথম বাক্য—'গুম ও অপহরণ সীমা অতিক্রম করেছে বলে মনে করছেন আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত'। কথাগুলো খেয়াল করেন, সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত সাতজন অপহরণ হওয়ার পরদিন বলছেন, 'গুম ও অপহরণ সীমা অতিক্রম করেছে'। হোয়াট ইজ দিস 'সীমা'? তার মানে গুম-খুন একটা সীমার মধ্যে ঘটলে ঠিক আছে, কিন্তু 'সীমা অতিক্রম' করলে ঠিক নাই!

আমি তখন এই সীমার পরিসীমা নিয়ে চিন্তায় পড়ে গেলাম। এই সীমাটা কী সেটা আপাতত বোঝা মুশকিল, কিন্তু এটা বোঝা গেল জনাব সেনগুপ্ত নিশ্চয়ই সীমাটা বোঝেন। এমনকি তিনি নিজেও সেই সীমা নির্ধারণকারীদের একজন, 'উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য', 'সংসদ সদস্য', তিনি আইন বানান আর 'সীমা নির্ধারণ' করে সেই আইন ভাঙেন। উনি তাদের একজন যারা গুম-অপহরণ

---

৩ সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত। প্রথম আলো। ২৮ এপ্রিল ২০১৪। http://www.prothom-alo.com/bangladesh/article/203938

কোন মাত্রা পর্যন্ত ঘটলে ঠিক আছে, সেটা নির্ধারণ করেন। পরের বাক্যেই তিনি আবার বলছেন—'সরকারের বাইরে আরেক সরকার থাকলে তো চলবে না!' আশ্চর্যবোধক চিহ্নসহ 'প্রথম আলো' উনাকে কোট করছে, 'এখানে দুর্বলতা দেখানো যাবে না। আইনের শাসন নিশ্চিত করতে হবে। ক্রমাগত এ-জাতীয় অপহরণ ও গুম আইনের শাসনের দৃষ্টান্ত নয়'।

মানে আমি যে এতক্ষণ বড় বড় তত্ত্ব কপচিয়ে যা বললাম, এটা যে শুধু তত্ত্বকথা নয়, সেটার সাক্ষী হিসেবে হাজির হয়েছেন সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত। এই অর্থে যে তিনি বলছেন, আইনের শাসন নিশ্চিত করতে হবে। অর্থাৎ সীমার মধ্যে গুম-খুন-অপহরণ এগুলো করতে হবে। সীমার বাইরে যাওয়া যাবে না। অর্থাৎ সার্বভৌম ক্ষমতা কর্তৃক নির্ধারিত 'হোমো সাকের' বা নমানুষ ছাড়া কাউকে গুম-খুন করা যাবে না। পরের একটি বাক্যে তিনি এটা আরো স্পষ্ট করেন—'আর আইনজীবী, যিনি অফিসার অব দা কোর্ট, তিনি সরকারেরই লোক। তাকে অপহরণ করা হয়েছে। এখানে নমনীয় হওয়া যাবে না। সর্বোচ্চ শক্তি দিয়ে দোষীদের জনতার সামনে আনতে হবে'। এখান থেকে এবার অর্থ নিষ্কাশন করলে আমরা দেখতে পাই—জনাব সেনগুপ্তের বড় আপত্তি এই জায়গায় নয় যে এক বা একাধিক নাগরিককে অপহরণ করা হয়েছে। বড় আপত্তি এই জায়গায় যে খুন হওয়াদের একজন 'অফিসার অব দা কোর্ট' বা 'সরকারেরই লোক', মানে তিনি তো আর এমন কেউ নন যাকে আইন পরিত্যাগ করেছে। তিনি হোমো সাকের নন, সন্ত্রাসী নন, চরমপন্থী নন, জঙ্গী নন। কাজেই তাকে গুম করা ঠিক হয়নি। জনাব সেনগুপ্ত যোগ্য উপদেষ্টা। তিনি জানেন "ক্রমাগত এ-জাতীয় অপহরণ ও গুম আইনের শাসনের দৃষ্টান্ত নয়', মানে এসব করা যেতে পারে, তবে মাঝে-মধ্যে, সংজ্ঞা মোতাবেক, ঠিক মানুষেরা গুম হলে ঠিক আছে। কিন্তু এরকম ক্রমাগত হলে বা ভুল মানুষ হলে ঠিক নাই, আইনের শাসন থাকে না। তিনি 'সীমার মধ্যে গুম-খুন' হওয়ার প্রতি জনগণের অনুমোদনের বিষয়টাও জানেন। কারণ তিনি মনে করেন, 'এই অপহরণের পর আইনের শাসনে

বিশ্বাসী মানুষ আতঙ্কগ্রস্ত হয়েছে'। মানে করা যেতে পারে, এর আগের অপহরণগুলোর ক্ষেত্রে 'আইনের শাসনে বিশ্বাসী' মানুষদের গুম নিয়ে খুব বড় কোন আপত্তি ছিল না। আসলেই ছিল না, তেমন কোন আপত্তি আমরা আসলে দেখিও নাই আগে।

সুরঞ্জিত সেনগুপ্তের আরেকটি বড় আপত্তি হচ্ছে 'সরকারের বাইরে আরেক সরকার থাকা যাবে না', কারণ সেটা 'আইনের শাসনের দৃষ্টান্ত নয়'। তার মানে সীমা হচ্ছে সরকার, সীমা মানে হচ্ছে আইন, সীমা মানে হচ্ছে সার্বভৌমত্ব। তার মানে আইনের প্রয়োজনে যেটুকু করা দরকার সেটুকু গুম-খুন করা যেতে পারে। মানে আইনের সন্ত্রাসী ক্ষমতার প্রতি বেআইনী সন্ত্রাসীদের ভয় তৈরী করবার জন্য যেটুকু দরকার সেটুকু করা যেতে পারে। তার বাইরে গেলে আর আইনের শাসন থাকে না। সরকারের বাইরেও আর কেউ এই কাজ শুরু করলে বিষয়টা 'ক্রমাগত' হয়ে যায়, ম্যানেজিবল থাকে না, মানুষের কাছে আর গ্রহণযোগ্য থাকে না। আপনাদের কী মনে হচ্ছে না জনাব সেনগুপ্তের বক্তব্য পরিষ্কার আগামবেন বা ফুকোর বিশ্লেষণকেই সমর্থন করছে? আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে, ওনার বক্তব্য ক্রসফায়ার বা গুম-খুনের বিরুদ্ধে। কিন্তু আমার বিদ্যাবুদ্ধি দিয়ে বিচার করতে গেলে দেখতে পাই, তার বক্তব্য আসলে এসবকে স্বাভাবিকীকরণের কথকতারই অংশ। আমি নিজে যতবার এইসব কথকতায় এই সত্যগুলো আবিষ্কার করি, নিজেকে স্টুপিড মনে হয়। মনে হয় সবাই তো সবকিছু খোলামেলা বলছে, আমরা কেনো বুঝতে পারছিনা? আসলে এই প্রশ্নের তাগিদ থেকেই আজকের এই হত্যার কথকতার বিশ্লেষণে নামা।

দ্বিতীয় কেস স্টাডি। ঘটনার প্রায় মাসখানেক পরে, ২৩ মে নারায়ণগঞ্জের সাংসদ শামীম ওসমান এই ঘটনা নিয়ে সংবাদ সম্মেলন করেন। 'সেভেন মার্ডারে'র একজন কুশীলব হিসেবে ওনার নামও আছে তখন আলোচনায়। এই হত্যার পলাতক সন্দেহভাজন অর্থ-যোগানদাতা নূর হোসেনের সাথে তাঁর ফোনালাপের রেকর্ড ফাঁস হয়ে গেল ২২ তারিখ। এবং উনি সাথে সাথে সংবাদ সম্মেলন ডাকলেন। 'দ্ব্যর্থহীনভাবে' স্বীকার করলেন

যে, ফোনালাপটি তাঁর এবং নূর হোসেনের সাথে ওনার কথা হয়েছে। এবং এই ফোনালাপের সময় তিনি ছিলেন 'গভর্মেন্ট অল দ্য অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে'র সাথে একটি 'আইন-শৃংখলার মিটিংয়ে'। এই সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেছেন প্রায় অবিকল জনাব সুরঞ্জিত সেনগুপ্তের কথা, 'বিডিনিউজ টুয়েন্টিফোর ডটকম' ২৪ মে অনুলিপি ছেপেছে ওনার বক্তব্যের। 'একজন আইনের ছাত্র হিসেবে, আইনবিদ হিসেবে, প্রণেতা হিসেবে' তিনি ঘটনার জন্য কে দোষী সেটা বিচার চলাকালীন বলতে চাননি। কারণ বিচারের আগে কাউকে অপরাধী তিনি বলতে চান না, কারণ এটা বলা 'উচিতও না সভ্য সমাজে'। তো, সংবাদ সম্মেলন ডেকে উনি বলছেন—

(র‍্যাবের সাথে কথা বলার পর) 'আমি কিন্তু হান্ড্রেড পারসেন্ট কনফার্ম ছিলাম, যে নজরুল জীবিত থাকবে। বিকজ সাতটা মানুষ তো। একজন হলে আমি কোনো আশাই করতাম না। কিন্তু সাতজন মানুষকে মেরে ফেলবে এটা আমার কল্পনা এমনকি চিন্তাতেও আসেনি। আপনাদেরও আসেনি। এমনকি কোন বিবেকবান, সভ্য মানুষের পক্ষেও এটা ভাবা সম্ভব নয়। ইভেন্চুয়ালি প্রশ্নই আসে না।'[৪]

খেয়াল করেন, একজন হলে উনি কোনো আশাই করতেন না যে বেঁচে ফিরবে। অর্থাৎ 'বিবেকবান, সভ্য মানুষ'দের একজন হিসেবে শামীম ওসমানও তার মতো করে হিসাব করছেন যে, সাতজন যেহেতু ধরেছে, সাতজনকেই যে মেরে ফেলবে এটা হতে পারে না। কিন্তু একজনকে ধরে নিয়ে গেলে 'বিবেকবান', 'সভ্য' মানুষদের আশংকা ছিল। কারণ একজনকে গুম করা বিবেকসম্মত, সভ্যতা সম্মত, এমনকি আগামবেনের যুক্তি দিয়ে আমরা বলতে পারি, 'আইন সম্মত'। কাজেই নারায়ণগঞ্জের এই আইনপ্রণেতাও আসলে আইনের কথাই ভাবছিলেন।

মানে কী দাঁড়াচ্ছে? যারা আইন বানাচ্ছেন, যারা আইন ভাঙছেন, যারা আইনের বাইরে আইন হয়ে উঠছেন, যারা সরকারের বাইরে

---

৪ শামীম ওসমান। বিডিনিউজ টুয়েন্টিফোর। ২৪ মে ২০১৪। http://bangla.bdnews24.com/bangladesh/article791594.bdnews

সরকার হয়ে উঠছেন পুরো প্রক্রিয়াটার মধ্যেই এই গুম-খুনের শর্তগুলি রয়ে গেছে। শামীম ওসমান বা র‍্যাব হয়তো এখানে দ্বিতীয় অর্থে হোমো সাকের, সার্বভৌম ক্ষমতার সাথে যারা 'পবিত্র' সম্পর্কে আবদ্ধ হওয়ার কারণে আইনের উর্ধ্বে। প্রচলিত আইন বা সর্বোচ্চ ক্ষমতাধারীদের তাঁর প্রতি স্নেহময় প্রশ্রয় তো আমাদের সেই ধারণাই দেয়। আইনের উর্ধ্বের এই আইনের মানুষেরা, বা সুরঞ্জিত সেনগুপ্তের মতো অভিজ্ঞ আইনপ্রণেতা তো আমাদের সরাসরি বলে দিচ্ছেন, সরকার বা আইন এইগুলি করবে। স্পষ্টভাবে বলে দিচ্ছেন কিন্তু, তারপরও এটা আমরা স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি না, দেখতে পাচ্ছি না। মানে একজন আইনপ্রণেতা, তিনি পত্রিকার সাংবাদিক ডেকে বলছেন, আমরা এগুলো করবো। এগুলি করার দরকার আছে, এগুলি হবে। প্রকারান্তরে তাই বলছেন। সাথে শুধু বলছেন যে, সীমা অতিক্রম করা যাবে না, গুম-খুন ক্রমাগত হলে সেটা আইনের শাসন থাকে না। এই সব যখন প্রকাশ্যেই বলা হচ্ছে, তখন কিসের আইন-বহির্ভূত, কিসের বিচার-বহির্ভূত, কিসের রাষ্ট্রীয় হত্যাকাণ্ড? আলাদা করে এগুলোকে বিচ্ছিন্ন করে বুঝতে যাওয়া, রাষ্ট্রের মধ্যে যে এসবের শর্ত লুকিয়ে আছে, এসব যে রাষ্ট্রেরই অনুষঙ্গ এবং খোদ রাষ্ট্রকে নিয়েই মৌলিক প্রশ্নগুলি না তুলে আসলে এই এই প্রশ্নগুলির ফয়সালা সম্ভব কিনা সেটা আমাদের ভেবে দেখতে হবে।

আমি শেষ জায়গাটায় আসি। শেষ জায়গাটা হচ্ছে রাষ্ট্র বলতে রাষ্ট্র আর এখন একা না। রাষ্ট্র আর একটা নাই। মানে প্রত্যেকটা রাষ্ট্রই ভেতর থেকে দুই-তিনটা রাষ্ট্র হয়ে যাচ্ছে, অর্থাৎ বিভাজিত হচ্ছে। আবার এটার একটা সাম্রাজ্যিক ছক আছে, অনেক রাষ্ট্র এক বা একাধিক রাষ্ট্রের জটিল সাম্রাজ্যিক ছকে আটকা পড়ছে ক্রমাগত। সাম্রাজ্যিক ছকটা কী? আমি আগেও বলেছি, কিছু কিছু রাষ্ট্রের সুযোগ আছে, যারা অগাধ সম্পদের উপর ভর করে সামাজিক বৈষম্যকে সহনীয় রূপ দিয়ে, বলপ্রয়োগকে সীমিত করে একটা সিভিল অ্যাপিয়ারেন্স তুলে ধরে। যেমন লন্ডনের গর্বের বিষয় ছিল, তাদের পুলিশ বন্দুক ক্যারি করে না। অর্থাৎ ১৯৬০-৭০

দশক পর্যন্ত লিবারিজমের এরকম একটা বিষয় ছিলো যে, রাষ্ট্র আইন এগুলির ভিত্তি সন্ত্রাস কিন্তু সেটা সীমিত ও শুভ সন্ত্রাস, দশের ভালোর জন্য করা সন্ত্রাস। কিন্তু তারপরও ভালো আইন বা ভালো রাষ্ট্র হচ্ছে সেটা, যেটা সন্ত্রাস কম করে। এরকম একটা মনোভাব ছিলো। ফলে ব্রিটিশদের গর্ব ছিলো, তাদের পুলিশ অস্ত্র ক্যারি করে না, তাদের পুলিশ সভ্য হয়ে গেছে। যদিও সেপ্টেম্বর ইলেভেন এবং লন্ডনে টিউব রেলে হামলার পরে ব্রিটিশ পুলিশ কিন্তু এখন বন্দুক নিয়ে ঘোরে। এমনকি সর্বশেষ একটি ব্রাজিলিয়ান ছেলেকে গুলি করে রেল স্টেশনে মেরে ফেললো আরব বা টেরোরিস্ট মনে করে।

তো এই রাষ্ট্রগুলোর তারপরও অন্তত নিজ ভূখণ্ডে নিজ নাগরিকদের প্রতি তুলনামূলকভাবে কম সন্ত্রাসী হওয়া সম্ভব হয় কীভাবে? তাদের সুযোগটা হচ্ছে, এই সন্ত্রাস করবার ব্যাপারটা তারা—আগে যেমন বলেছি—আউটসোর্স করে দেয়। কারণ রাষ্ট্রের অন্য অনেক কিছুর সাথে প্রথম যে কারণে সন্ত্রাসটা দরকার পড়ে—আপনারা যদি ইতিহাস ঘেটে থাকেন—সেটা হচ্ছে নিজের শ্রমিক শ্রেণী নিয়ন্ত্রণের জন্য। ইংল্যান্ডে প্রথম পুলিশ বাহিনী গঠন করা হয় শিল্প-বিপ্লবের পরে বিকশিত হওয়া শ্রমিক শ্রেণীকে নিয়ন্ত্রণের জন্য। আমাদের এখানে যেটা হয়েছে সম্প্রতি, শিল্পাঞ্চল পুলিশ বা ইন্ডাস্ট্রিয়াল পুলিশ। অলরেডি গুম খুনের অভিযোগ তাদের বিরুদ্ধেও আছে। মধ্যবিত্ত ক্ষমতাধর বা নামকরা সন্ত্রাসীরা যখন গুম হন, তখন সেটা আলোচনায় আসে। সবচেয়ে নীরব গুম-খুনের শিকার আসলে পৃথিবীর সমস্ত জায়গাতেই শ্রমিকেরা। যেহেতু তারা ব্যক্তি হিসেবে অতটা গুরুত্বপূর্ণ না, খুব সহজেই 'বধযোগ্য বর্গ' বা হোমো সাকের হয়ে পড়েন। এগুলো পত্রিকায় আসে না। বদরুদ্দিন উমর এক লেখায় দেখাচ্ছিলেন যে, সাধারণত আলোচিত যেসব গুম-খুন সেই তুলনায় কতো গুণ বেশি গুম-খুন ঘটেছে আমাদের শ্রমিক অঞ্চলগুলিতে।

আজকের পশ্চিমা ধনী রাষ্ট্রগুলো যেটা করছে সেটা হচ্ছে শ্রমনির্ভর বা লেবার ইনটেনসিভ শিল্পগুলো সব পাঠিয়ে দিচ্ছে

অপর বিশ্বের গরিব দেশগুলোতে। নিজেদের শ্রমিক শ্রেণীকে একটা মান সম্পন্ন জীবন দিতে পারছে, আমরা এখানে যেটাকে মোটাদাগে মধ্যবিত্ত মানের জীবন বলি। যেমন বাসায় রানিং ওয়াটার থাকবে, ট্যাপ খুললেই পানি আসবে, ইলেকট্রিসিটি থাকবে, আধুনিক জীবন-যাপনের সুবিধাগুলো থাকবে, এবং নগ্ন কোনো সাংস্কৃতিক বৈষম্য থাকবে না। এগুলো নিশ্চিত করতে গিয়ে তাদেরকে এই শোষণ সবসময় আউটসোর্স করতে হয়। আউটসোর্স করতে হয় এই দরিদ্র দেশগুলিতে। ইনটেনসিভ লেবার ফোর্স কোনো লিবারাল রাষ্ট্রের জন্যই আর নিরাপদ কোনো জিনিস না। একটা বিশাল শ্রমিক জনগোষ্ঠী, যাদেরকে নগ্নভাবে শোষণ করতে হবে, এরকম একটা জনগোষ্ঠী নিজের দেশের মাটিতে বসিয়ে রেখে কোনো সরকারের পক্ষে স্বস্তিতে থাকা সম্ভব না। ফলে এই শ্রমনির্ভর শিল্পগুলি তারা পাঠিয়ে দেয় আমাদের মতো দেশে যেখানে তখন গড়ে ওঠে ইপিজেড এর মতো বিশেষ রপ্তানি অঞ্চল, যেখানে শ্রমিকদের সাংবিধানিক অধিকারগুলোও আর খুব একটা স্বীকৃত নয়। ধনী দেশগুলোর মাপকাঠিতেই ইপিজেড এর ফ্যাক্টরিগুলোকে আসলে আর ফ্যাক্টরি বলা মুশকিল, এগুলো আসলে শ্রম শিবির, সোয়েট শপ।

তারপর এই গরিব দেশগুলোতে তখন দেখা যায়, কৃষি থেকে সদ্য উচ্ছেদ হওয়া একটা জনগোষ্ঠী রাতারাতি একটা বিশাল শ্রমিক জনসংখ্যায় পরিণত হচ্ছে। নগ্ন শ্রমশোষণের ফলে এই শ্রমিকেরা আইন মানবে, ক্রমাগত বাড়তে থাকা শ্রম শোষণের চাপ নির্বিবাদে মেনে নেবে, বিপরীতে পুলিশও ভদ্র থাকবে, আইন মানবে, রাষ্ট্র নিয়ে এরকম কোনো লিবারাল কল্পনা আসলে বাস্তবে অসার। বাস্তবতা কী সেটা আমরা সবাই জানি। আইন মেনে তো পুলিশের পক্ষে সারামাস কাজ করে প্রতারণামূলক বেতনটাও না পেয়ে ক্ষেপে ওঠা গার্মেন্টস শ্রমিকদের সামলানো সম্ভব না। ফলে বাংলাদেশে পুলিশ আইন মানবে, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা আইন মানবে, এমনটা আসলে আমরা কেউই আশা করি না। তখন দেখা যায়, গরীব দেশগুলিতে গণতন্ত্র ভালো জিনিস না, তাদেরকে

বোঝানো হয় যে তারা আসলে গণতন্ত্রের যোগ্য না। কারণ হচ্ছে কী? এখানে গণতন্ত্র থাকলেই মুশকিল। কারণ একটা মোটামুটি চলনসই গণতন্ত্র থাকলেও যে অবিশ্বাস্য ধরনের শ্রম শোষণগুলি হয় সেটা সম্ভব হয়ে ওঠে না। আপনারা সুযোগ থাকলে উরুগুয়ের এ্যডুয়ার্ডো গ্যালিয়ানো বলে একজন লেখক আছেন, তাঁর দুইটা বই, 'ওপেন ভেইন্স অফ লাতিন আমেরিকা' এবং 'মেমোরি অফ ফায়ার', এই বই দুইটা পড়তে পারেন। আমি আগের লেখাটিতে খানিকটা লিখেছি এই নিয়ে।

সাম্রাজ্যের ছকটা হচ্ছে এরকম, যেটা চলছে দরিদ্র বিশ্বে। এখানে বিশাল শ্রমিক শ্রেণীর পাশাপাশি ছোট একটা ধনিকশ্রেণীও গড়ে তোলা হয়। এবং এই ধনিকশ্রেণীর ভোগ্যপণ্য কিনবার জন্য দেশগুলোকে রপ্তানি বাড়াতে হয়। তাদেরকে ভোগ্যপণ্য কেনা এবং ঋণ শোধ করবার জন্য বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতে হয়। রপ্তানি বাড়াতে হলে প্রতিযোগিতামূলক বাজারে পণ্যের দাম কম রাখতে হয়। পণ্যের দাম কমানোর প্রধান উপায় হয়ে ওঠে শ্রমের দাম কমানো কারণ এই গ্লোবাল শিল্পে গরিবদেশগুলোর অবদানই হচ্ছে সস্তা শ্রম। এটা একটা চক্রের মতো কাজ করে। দরিদ্র দেশগুলিতে শ্রমিকশ্রেণী যেন ক্রমবর্ধমান হারে অনুগত থাকে এবং ক্রমবর্ধমান হারে সস্তা থাকে, এটা নিশ্চিত করবার জন্য দরকার পড়ে একদল পুলিশ, একদল গোয়েন্দা, জল্লাদ, নিপীড়নকারী, টর্চারসেল এগুলির। সেই সাথে দরকার পড়ে একটা অনুগত মিডিয়া। এবং এই বাহিনীকে খাওয়ানোর জন্য সরকারগুলির দরকার পড়ে টাকা। ফলে সরকারগুলিকে আরো ঋণ নিতে হয় আইএমএফ'র কাছে, বিশ্ব ব্যাংকের কাছে। এই ঋণের সুদ পরিশোধের জন্য দরকার পড়ে আরো ঋণ এবং আরো বেশি ডলার আয় করবার। এই আয় বাড়ানোর জন্য কী করতে হয়? রপ্তানি বাড়াতে হয়। যেহেতু ঋণটা শোধ করতে হবে ডলারে। ঋণের টাকা ডলারে আসে ডলারে যায়। ফলে রপ্তানি বাড়াতে হবে। রপ্তানি না করে উপায় নাই। রপ্তানি বাড়াতে হলে কী করতে হবে? দাম কমাতে হবে। দাম কমাতে হলে কী করতে হবে? শ্রমশক্তিকে আরো

সস্তা করতে হবে। আরো সস্তা করতে হলে কী করতে হবে? তাদেরকে দমনের জন্য আরো বেশি শক্তিশালী পুলিশ বাহিনী লাগবে। এবং আপনারা যদি আমার ফেসবুকে লেখাটা দেখেন, আমি যখন লিখছিলাম, একই সপ্তাহের নিউজ ছিলো শ্রমিক নেতা আমিনুল গুম খুন, তার আগের সপ্তাহে ইলিয়াস হারিয়ে গেছেন। ওই সপ্তাহেই আইএমএফ নতুন ঋণ ছাড় করছে বাংলাদেশে জন্য। একই সপ্তাহেই পুলিশ বাহিনীর জন্য অত্যাধুনিক অস্ত্র কেনা হয়েছে বিশাল অংকের ডলার খরচ করে। সবগুলি একই সপ্তাহের পত্রিকাতে আছে। আমরা শুধু এক খবরের সাথে আরেক খবরের যোগসূত্র স্থাপনে অক্ষম।

অস্বস্তিকর হলেও সত্য যে গুম-খুনের ইতিহাস আমাদের এখানকার রাজনৈতিক ইতিহাসে নতুন মনে হলেও দুনিয়ার সব জায়গাতেই এই গুম-খুন বরাবরই রাষ্ট্রের একদম অঙ্গীভূত অংশ। কী সোসালিস্ট, কী কমুনিস্ট, কী ইসলামিস্ট, কী ক্যাপিটালিস্ট, কোনো রাষ্ট্রের মধ্যেই এই প্রশ্নে তেমন কোনো পার্থক্য নেই। সবচেয়ে ডিস্টার্বিং উদাহরণটাই দিই। ১৯১৭ সালের অক্টোবর মাসে লেনিন বিপ্লব করে সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করলেন। ঠিক দুই মাসের মাথায়, নভেম্বর মাসে তিনি গঠন করলেন আমাদের আজকের র‍্যাবের সোভিয়েত সংস্করণ, চেকা পুলিশ। এক মাসের মাথায় এই চেকা পুলিশ গুলি চালিয়েছিল ধর্মঘটী শ্রমিকদের ওপরে। এটা ব্যক্তি লেনিনের গলদ বা মার্কসিজমের গলদ হিসেবে আমি বিচার করছি না। আমি বলছি খোদ রাষ্ট্রের এই চরিত্রটা আছে। এইটা রাষ্ট্রের ধর্ম, রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য, কারণ 'রাষ্ট্রং বাহুবলাশ্রিতম'। পরে চেকা পুলিশের যে ইতিহাস আমরা দেখি সোভিয়েত ইউনিয়নে, সাথে যুক্ত হয় কেজিবি এবং সেখানে শুরু হয় গুম হয়ে যাওয়া, অথবা গুম হয়ে যাওয়ার ভয়ে নির্ঘুম দিন-রাত্রি-যাপন। প্রত্যেক রাজনৈতিক ভিন্নমতালম্বীদের হয় মেরে ফেলা অথবা শ্রমশিবিরে পাঠিয়ে দেওয়া, সাইবেরিয়ায় নির্বাসন দেওয়া। এই যে একটা আতঙ্কের সমাজ সোভিয়েত ইউনিয়ন গড়ে তুলেছিলো, সেটা আমরা

দেখেছি। ফলে এখানে আসলে ক্ষমতায় কমুনিস্টরা নাকি ইসলামিস্টরা সেই প্রশ্ন খুব কাজের নয়। রাষ্ট্র জিনিসটাই এরকম। রাষ্ট্র ইজ বাই ডিফল্ট এ কিলিং মেশিন, আইনী সংজ্ঞা মোতাবেক। রাষ্ট্রের চূড়ান্ত ক্ষমতা হচ্ছে কারো জৈব অস্তিত্বেরই বিনাশ করবার ক্ষমতা। সেটার প্রয়োগ আমরা সোভিয়েত ইউনিয়নেও দেখেছি, আরো বাজেভাবে দেখেছি অন্য অনেক জায়গায়। চেকা পুলিশ, পরবর্তীতে কেজিবি'র তুলে নিয়ে যাওয়াকে রুশরা বলত 'মধ্য রাতের কড়া নাড়া'। রাতে মানুষ ঘুমাতে যাওয়ার আগে ভাবতো যে মধ্যরাত্রে 'ওরা' আসবে। একই উদাহরণ আমরা দেখেছি লাতিন আমেরিকায়। সেখানে মার্কিন মদদপুষ্ট সামরিক শাসকেরা, চিলির পিনোসে থেকে শুরু করে ল্যাটিন আমেরিকাতে আর যেসব দেশে সিআইএ ব্যাকড গভর্নমেন্ট ছিলো, সেই গভর্নমেন্টরাও গুম-খুন চালিয়েছে শাসনকাল জুড়ে। এই মহাদেশে গুম হয়ে যাওয়ার নাম হয়েছিল 'রুটিন ডিজঅ্যাপিয়ারেন্স', নিয়মিত হারিয়ে যাওয়া, নাই হয়ে যাওয়া একেকটা মানুষ। ১৯৬০ এর দশকে আমেরিকায় নৈরাজ্যপন্থীদের ওপর একই গুম-খুন চলেছে। এমন কোনো রাষ্ট্র নাই যে এই চর্চা করে নাই। আমি বারবারই জোর দিয়ে বলছি। কী ইসলামিস্ট, কী ক্যাপিটালিস্ট, কী সোসালিস্ট ... কোনো পার্থক্য নাই। কারণ আইনী ও বেআইনী সন্ত্রাস ছাড়া রাষ্ট্রেরও টিকে থাকবার যে কোনো উপায় নাই।

তো আমরা কী করতে পারি এরকম পরিস্থিতিতে? আমরা যে সন্ন্যাস গ্রহণ করবো না সেই উপায়ও নাই। আগে ছিলো। আগে উপায় ছিলো যে রাষ্ট্র আমার পছন্দ হলো না, আমি রাষ্ট্রের বাইরে চলে যাব। এট লিস্ট বৈদিক সমাজে সেই সুযোগটা ছিলো। আমার বেদ পছন্দ না হলে আমি তান্ত্রিক হয়ে যেতে পারতাম, মানে 'স্ব-তন্ত্র' হয়ে যেতে পারতাম। কিন্তু এখন রাষ্ট্র পছন্দ না হওয়া মানেই যেন রাষ্ট্রদ্রোহিতা। আজকের এই লেখা দিয়েই আমার নামে রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগ আনা সম্ভব। কারণ আমি পরিষ্কার বাক্যে বলছি, রাষ্ট্র মানে হচ্ছে সন্ত্রাস, রাষ্ট্র ইজ এ কিলিং মেশিন। এগুলো আমি কয়েকবার বললাম। তাই না? এগুলো বলতে গিয়েও

মনে মনে আমাকে আমার বিরুদ্ধে আনা সম্ভাব্য রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগ খণ্ডন করতে হয়। আমি তো বলবো, এটা আমি বলি নাই। এটা ম্যাক্স বেবার বলছেন। আমি তো বলি নাই, এসব ফুকো বলছেন, আগামবেন বলছেন। আমাকে আমার শিক্ষকেরা বিশ্ববিদ্যালয়ে এগুলো পড়িয়েছেন। রাষ্ট্র আমাকে চাকরি দিয়েছে এগুলি পড়ানোর জন্য। কিন্তু এত যুক্তি শোনবার সময় আমাদের রাষ্ট্রের আছে বলে মনে হয় না। ফলে রাষ্ট্রদ্রোহ একটা ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। রাষ্ট্রদ্রোহিতার শাস্তি যে মৃত্যুদণ্ড হওয়া উচিত এই বিষয়ে আমাদের প্রায় ঐক্যমত আছে।

যখন রাষ্ট্রের মৌলিক চরিত্র পরিবর্তনের জন্য আমাদের সমাজ একটা বিদ্রোহ করে, সেখানেও হত্যার একটা প্রভোকেটিং ডিসকোর্স দিয়ে সেই বিদ্রোহের চরিত্র নস্যাৎ করা যায়। যেমন আমরা দেখেছি যে শাহবাগ আন্দোলনে পরিকল্পিতভাবে এই তরুণদেরকে একটাই বুলি শেখানো হয়েছে, ফাঁসি ফাঁসি ফাঁসি। সমাজের একটা সম্ভাবনাময় জাগরণকে একটা হত্যার ডিসকোর্সে আটকে রাখা হয়েছে। সর্বশেষ গণজাগরণ মঞ্চ যেদিন তাঁদের বর্ষপূর্তি করছিলো, ঘটনাক্রমে আমি ঠিক আগের বছরের মতো সেদিনও সেখানে ছিলাম। বইমেলায় যাব বলে। একবছর পূর্তিতে ওনারা স্মৃতিচারণ করছিলেন। তো, কোনো কিছুর 'স্মৃতিচারণ' কখন করতে হয়, সেই প্রশ্ন আমার মনে না এসে পারেনি। কিন্তু তারচেয়ে মজার জিনিস দেখলাম যে, গণজাগরণ মঞ্চের স্টলে রঙবেরঙের বাতি। একটা ফাঁসির দড়িতে বাতি জ্বলছে নিভছে, জ্বলছে নিভছে। পাশে লেখাও আছে ফাঁসি। ফাঁসি জ্বলছে নিভছে। জ্বলছে আর নিভছে। আর তেমন কোনো বক্তব্য কোথাও নাই। একটি সামাজিক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে মধ্যবিত্ত তরুণদের সমাজ পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষাটাকেও রাষ্ট্র হজম করলো 'ফাঁসি ফাঁসি ফাঁসি' দিয়ে। এবং এক বছর পরে যখন গণজাগরনের নিদর্শন যখন খুঁজতে যাওয়া হচ্ছে সেখানে শুধু একটা প্রত্নতাত্ত্বিক লাইট জ্বলছে। ফাঁসি ফাঁসি ফাঁসি। এইভাবেই কিন্তু হত্যার কথকতা আমাদের চিন্তাকে রিডিউস করে ফেলতে পারে।

আমাদের আসলে আজকে উপায় কী? উপায় হচ্ছে, উপায়টা অক্ষমের মতো মনে হতে পারে আপনাদের কাছে, কিন্তু ভেবে দেখবার মতো। উপায় হচ্ছে এই হত্যার কথকতার একটা পাল্টা কথকতা চালু করা। কোদালকে নির্মোহভাবে কোদাল বলা শুরু করা। সর্বাত্মক স্বৈরতন্ত্রের যুগে সত্য বলাটাই একটা বড় বৈপ্লবিক কাজ। কিন্তু সেই সত্যকে আমাদের আগে দেখতে পেতে হবে রাষ্ট্রীয় কথকতার আড়াল সরিয়ে। তার জন্য প্রস্তুতি চাই। এই লড়াই রাষ্ট্রের বিপরীতে সব সমাজই করেছে। সোভিয়েত ইউনিয়নের ঐ সময়ে মানুষ কী করেছে? রাষ্ট্র নিয়ে মানুষের রাজনৈতিক রসবোধ তখন সাংঘাতিক পর্যায়ে গিয়েছে। একটা জোক বলি, গুমের গুমোট ভাব কাটানোর জন্যই বলি, যেহেতু এখন শেষ করব। কেজিবি অফিসে, সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পরে একদিন, বারবার একটা ফোন আসছিলো। 'হ্যালো এটা কি কেজিবি?', উত্তরে এখান থেকে বলা হল, 'না, কেজিবি বন্ধ হয়ে গেছে'। একটু পরে আবার ফোন। 'হ্যালো এটা কি কেজিবি?' যথারীতি উত্তর—'না কেজিবি উঠে গেছে'। আবার 'হ্যালো এটা কি কেজিবি?' এবার অপারেটর ক্ষেপে গিয়ে বলেন, 'আপনাকে কয়বার বললাম যে কেজিবি বন্ধ হয়ে গেছে'। উত্তরে ফোনের লোকটি বলেন, 'ভাই কিছু মনে করবেন না, আমার শুনতে খুব ভাল লাগছে যে কেজিবি বন্ধ হয়ে গেছে।'

ফলে মানুষের চিন্তা তো। মানুষ তো। আফটার অল মানুষ তো। একটা সমাজকে যখন সাপ্রেস করা হয়, প্রত্যেকটা ভিন্নমতকে যখন সাঁড়াশি দিয়ে চেপে ধরা হয় বা গুম করে দেয়া হয়, তখন ঐ সমাজের ভেতরেই প্রতিচিন্তা জন্মাতে থাকে। কলম্বিয়ান একজন উপন্যাসিক। কয়েকদিন আগে মারা গেলেন, গ্যাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেজ, তিনি একটা উপন্যাস লিখেছিলেন, 'নো ওয়ান রাইটস টু কর্নেল', কর্নেলকে কেউ চিঠি লিখে না। উপন্যাসটা শুরুই করেছেন এভাবে—ঐ কর্নেলের গ্রামে একটা জানাযা হচ্ছে, একটা মানুষকে কবর দেয়ার আয়োজন করা হচ্ছে। কর্নেলের জন্য আজকে অন্যরকম দিন। কেনো অন্যরকম দিন? অনেকদিন পরে এই গ্রামে

একজন মানুষের স্বাভাবিক মৃত্যু ঘটেছে। এটা একটা বিশেষ দিন কর্নেলের জন্য। এবং গোটা উপন্যাসে কোনো চরিত্রের কোনো নাম নাই, ব্যক্তির নাম নাই। সে সময় কলাম্বিয়াতে সামরিক শাসনের দাপটে মানুষের ব্যক্তি সত্তাই গুম হয়ে গিয়েছিলো। সেরকম একটা সময় আজকে প্রায়শই আমাদের দরজায় কড়া নাড়ছে। পদ্মা–মেঘনা–যমুনা এখন 'তোমার আমার ঠিকানা' না হয়ে ক্রমশ বেওয়ারিশ লাশের ঠিকানা হয়ে উঠছে। কী অদ্ভূত! হিন্দি ছবিতেও দেখি খুন–খারাবির পরে ডনরাও সাঙ্গা–পাঙ্গাদের 'লাশের ঠিকানা লাগাতে' বলেন। এখন আমাদের জাতিগত ঠিকানার নিশানা হয়ে ওঠা এই নদীর মোহনাগুলোতে লাশগুলো কে পাঠাচ্ছেন?

আমার মনে পড়ে স্বাধীনতার আমরা যেদিন ৪০ বছর উদযাপন করি, তার আগের ক'দিন ধলেশ্বরীতে অজ্ঞাতনামা অনেক কয়টি লাশ পাওয়া যায়। এবং সেদিন আমরা কী করেছিলাম গোটা জাতি? আমরা পতাকা উড়িয়েছিলাম। আমরা ফ্লাগ উড়িয়েছিলাম। জাতীয় পতাকা। অরুন্ধতী সবচেয়ে ভাল বলেন, ফ্লাগ আর বিটস অফ কালার ক্লথস হুইচ দি গভরমেন্টস ইউজ টু শ্রিংক র‍্যাপ ইটস পিপলস মাইন্ড এন্ড এজ ও সেরেমোনিয়াল শ্রাউড টু বারি দ্য ডেড। জাতীয় পতাকা হচ্ছে কিছু রঙিন কাপড়ের টুকরা, যেটা সরকারগুলি ব্যবহার করে আমাদের চিন্তাশক্তিকে মুড়িয়ে দেওয়ার জন্য, শ্রিংক র‍্যাপ মানে বস্তায় কোনো কিছু যেভাবে ঠেসে র‍্যাপ করি। আবার একই সাথে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় দাফন মানে জাতীয় পতাকায় ঢেকে দাফন। বুদ্ধিবৃত্তিও একটা সময় এসে জাতীয়তাবাদের প্রশ্নহীন সেবায় লেগে পড়ে। এবং যখন এগুলি খুব বাড়তে থাকে, ইতিহাস আমাদের বলে যে আমরা ফ্যাসিবাদ নামক স্টেশনের খুব কাছকাছি এসে গেছি। তখন আমাদের ডিসিপ্লিন আর প্যানিশমেন্ট নিয়ে এক ধরনের অবসেশন কাজ করে, আমরা সবাই বেশি করে পানিশমেন্টটা চাই, আমরা সবাই বেশি করে ডিসিপ্লিন চাই। এমনকি, দেখবেন সামরিক শাসনের প্রতিও আমাদের জনমানসের একটা অংশের মোহ আছে। এগুলি হচ্ছে ফ্যাসিজমের আবির্ভাবের উপসর্গ। একটা টোটালেটেরিয়ান শাসনপ্রণালী যে আসছে, গুম–খুন থেকে শুরু করে এই সব কিছুই হচ্ছে তার আরলি সাইন।

এইসব নিয়ে সামগ্রিক কথকতা আমাদের অবসেসড করে রাখে, চিন্তাকে অবশ করে রাখে। অবসেশন উইথ ক্রাইম এন্ড পানিশমেন্ট। টিভিতে সিআইডি চলতে থাকে, ক্রাইম শো চলতে থাকে, আমরা অবসেসড থাকি অপরাধ নিয়ে। যেদিন একটা বড় অপরাধ ঘটবে সেদিন পত্রিকা বেশি বিক্রি হবে। যেদিন একটা অপরাধ ঘটবে, যেদিন শামীম ওসমান কথা বলবেন, সেদিন টিভি চ্যানেলগুলির টিআরপি বাড়বে। এতকিছুর পরেও ন্যাশনালিজম তুঙ্গে থাকবে। আমরা জাতীয় পতাকার রেকর্ড করবো, পরদিন পাকিস্তান সেটা ভাঙবে। আমরা আবার প্রস্তুত হবো জাতীয় পতাকার রেকর্ড ভাঙার জন্য। এবং মাঝখানে জাতীয় পতাকা অবমাননার দায়ে দু'চারজনকে উত্তম-মধ্যম দেয়া হবে। এই ধরনের কাণ্ড-কারখানা ঘটতে থাকবে। এই পুরো প্রক্রিয়াগুলি চলতে থাকে। ফলে ক্রসফায়ারের প্রেস স্টেটমেন্ট যে মিথ্যা এটা বুঝতে পেরেই নিজেকে বুদ্ধিমান ভেবে বসে থাকাটা আসলে সেই ফ্যাসিবাদকেই স্বাগত জানানো। এই জায়গাটায় সম্ভবত আমাদের কিছু করবার আছে যারা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ি এবং সমাজে নতুন চিন্তার যোগান দেয়ার দায়িত্ব আছে বলে মনে করি। যদিও সেটা হয়তো খুব যথেষ্ট কিছু না। সেই কাজটাই শুরু হতে পারে আজকে প্রচলিত হত্যার কথকতার একটা পাল্টা অর্থ তৈরী করে। এই কথকতার শব্দগুলোর অর্থ উন্মোচন করে। কোনো ক্ষেত্রে নতুন অর্থ দিয়ে, কোনো ক্ষেত্রে পুরনো অর্থ উদ্ধার করে।

যেমন উদাহরণ হতে পারে আমাদের প্রথম চাবিশব্দ রাষ্ট্রই। রাষ্ট্র কথাটার মানে আসলে ক্ষমতার হাতে বেহাত হয়ে গেছে। সেই বেহাত হয়ে যাওয়ার প্রমাণ রয়ে গেছে 'রাষ্ট্র' শব্দটির 'র-ফলা'তেই। আদিতে রাষ্ট্র শব্দটিতে 'র-ফলা' ছিল না, শব্দটি ছিল 'রাষ্ট'। হরিচরণের শব্দকোষে এই রাষ্ট মানে লেখা আছে দেশব্যাপ্ত, প্রকাশ, বিদিত। অর্থাৎ রাষ্ট মানে সমাজের 'দেশব্যাপ্ত' বোঝাপড়া, মানুষের একজনের সাথে আরেকজনের বোঝাপড়া, যৌথ মীমাংসা, কনসেনসাস বা আন্ডারস্ট্যান্ডিং। এটা এমন একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং যেটা সবাই জানে, যেটা সর্বজন বিদিত। 'রাষ্ট্র' পদ

হিসেবে পুরুষ কিম্বা ক্লীব নামবাচ্য যার ব্যবহার সংস্কৃত সাহিত্যের আগে পাওয়া যায় না। কিন্তু 'রাষ্ট' বিশেষণ এবং প্রাকৃত বাংলা শব্দ। কীভাবে সংস্কৃত ভাষায় এসে 'রাষ্ট' একটা 'র-ফলা' জুটিয়ে 'অপরূপ' থেকে জটিল 'পোড়াকাষ্ঠে' রূপান্তরিত হল, সেই ভেদ করতে পারাটা আজকের সময়ে এসে জরুরি ('অপরূপ শুনেছি সে রাষ্ট্র; জটিলে পোড়া কাষ্ঠ')। যে শব্দের মানে ছিল আপনার সাথে আমার বোঝাপড়া, মানে সর্বজনবিদিত সোশাল কন্ট্রাক্ট, সেই শব্দ কীভাবে সর্বমান্য 'বাহুবলাশ্রিত' দানবে পরিণত হল, সেই ইতিহাস বোধকরি আমাদেরই লিখতে হবে। আমাদের পূর্বজনেরা তাঁদের মতো করে ইশারা ইঙ্গিত দিয়ে রেখেছেন আমাদের ভাষার আনাচে-কানাচে। আপাতত সেই বিচিত্র অর্থময়তার ভেতর থেকে কীভাবে ক্ষমতার 'প্যাঁচা' কোনো এক 'ছুতা'য় 'সূর্যে'র সাথে নিজের 'শত্রুতা' 'রাষ্ট' করে দিয়ে মর্ত্যে আমাদের জীবন-মরণের বিধাতা হয়ে বসল, সেটা আমাদের ভেবে দেখতে হবে। আমাদের দেখতে পেতে হবে, আজকের সব আধুনিক জাতিরাষ্ট্রেরও সেই প্যাঁচার মতন একটা করে জাতীয় শত্রু থাকে। সেই শত্রুর বিরুদ্ধে রাষ্ট্র অকাতরে ঘৃণা রাষ্ট করতে থাকে। কীভাবে 'রাষ্ট' শব্দটিতে 'র-ফলা' লাগিয়ে সেটাকে সর্বজনবিদিত সর্বসম্মত বোঝাপড়া থেকে ত্রাস নির্ভর সার্বজনীন মান্যতা করে তুলল সেটা খুঁজে বের করা আমাদেরই দায়িত্ব।

এই প্যাঁচা যে নিজেকে শুধু যে সর্বমান্য করে তোলে তাইনা, সে আসল সত্য গোপনও করে ফেলে। সেই গোপন করবার কাজটার জন্য নিয়োগ করা হয় শত শত সচিব। সচিব মানে কী? সচিব মানে, আক্ষরিক অর্থে, সত্য সম্পাদনায় নিয়োজিত অমার্ত্যবর্গ। সচ+ইব (-ক)=সচিব, অমরকোষে রয়েছে সচতি সমবৈতি সচিবঃ। এখানে ইব প্রত্যয়টি ক্রিয়া সম্পাদন অর্থে বাংলায় সব পুরুষেই ব্যবহৃত হতো এককালে, আধুনিককালে এসে এটি শুধু উত্তম পুরুষে ব্যবহৃত হয়। সত্য সম্পাদনা মানে সত্য গোপন করা। ইংরেজিতেও সেক্রেটারি শব্দটির অর্থ তাই, সিক্রেট করেন যিনি, সিক্রেটকারী। ইংরেজি অভিধানেও সেক্রেটারি মানে 'দ্য পার্সন

এনট্রাস্টেড উইথ এ সিক্রেট'। একারণেই ওনারা আমাদের সচিবালয় সত্য গোপনে নিয়োজিত থাকেন, ফলে এখানে প্রবেশ সহজ নয়, সবার জন্য নয়। এখানে সচিবেরা গোপনীয় সিল মারা সব কাগজপত্র গোপনে নাড়াচাড়া করেন। ওনারাও 'রাষ্ট' অর্থে সর্বজনবিদিত বোঝাপড়াকে 'রাষ্ট্র' অর্থে ত্রাস-নির্ভর আনুগত্য বা আইনে পরিণত করবার অন্যতম কারিগর। কাজেই হত্যার কথকতা নিয়ে ভাবতে হলে এভাবেই শাসনপ্রণালির কথকতায় আমাদের ভাষার একটা লড়াই চালাতে হবে। আমাদের শব্দগুলোর অর্থ উদ্ধার করতে হবে। সম্ভবত ভাষার আইন অমান্য করেই শুরু করতে হবে কাজটা, কী বলতে আমরা কী বুঝব সেটা অনেকখানি পাল্টে ফেলতে হবে। তাহলেই সম্ভবত হত্যার শাসনতান্ত্রিক কথকতা থেকে আমাদের চিন্তা মুক্তি পেতে পারে। আর আগেই বলেছি, মুক্তচিন্তা মাত্রই অ্যাকশন, আজকের সময়ে একটা পিওরলি পলিটিক্যাল অ্যাকশন।

২৭ মে ২০১৪
সিরাজী ভবন, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

‘সুপার কপ’ কিংবা ‘ডার্ক জাস্টিস’
রাষ্ট্রীয় খুন ও জনমনের রাজনৈতিক বাসনা

নানা পাটেকারের ‘আব তাক ছাপ্পান’ (২০০৪) আমার দেখা প্রথম বলিউডি ‘সুপার কপ’ মুভি। বেশ কয়েকবার দেখেছি। প্রায়ই কানে ভাসে ৫৬ এনকাউন্টার করা পুলিশ অফিসার সাধু আগাশের অমোঘ ডায়লগ—‘সোসাইটিকে জামাদার হ্যায় হাম’। গ্লোবাল সাউথের এই ‘সুপার কপ’ সমাজের সুইপার, খুনে-অপরাধীদের সাফ করেন। এই কাজ করতে গিয়ে তিনি নিজেও খুন করেন। কিন্তু তার খুন আইনেরই স্বার্থে, সমাজেরই বৃহত্তর স্বার্থে। ফলে চাকরিসূত্রে তিনি ঠিক মানুষ নন, কিলিং মেশিন। বড়কর্তার গোপন অলিখিত নির্দেশে সকালের ফ্লাইটে শাদা পোশাকে ভারতের আরেক শহরে গিয়ে অচেনা কোনো লোককে অবলীলায় গুলি করেন। বিকেলের ফ্লাইটে ফিরে বাজার থেকে সব্জী কিনে নিয়ে মমতাময়ী স্ত্রী আর আদরের সন্তানের সাথে আটপৌরে জীবন কাটান। মানুষ আর মিডিয়া তাকে নিয়ে ভাবে কিন্তু ঠিক বোঝে না। তিনি নিজের কাজ নিয়ে খুব বিচলিত নন, কারণ ‘যো কারনা হ্যায়, ও কারনা হ্যায়, ঠোক না হ্যায় তো ঠোকনা হ্যায় ... সোচনে কা এলাউ নেহি হ্যায়’। খুনাখুনি করা ছাড়া রাষ্ট্র চালানো যায় না, এবং খুনাখুনি নিয়ে ভাবার অনুমতি নাই, এই হচ্ছে ‘আব তাক ছাপ্পান’ খুনের মোরাল অব দি স্টোরি।

বলিউড ছবি আমি পারতপক্ষে মিস করি না। 'কোম্পানি' বা 'দাবাং' থেকে শুরু করে 'সিংঘম' পর্যন্ত সব 'সুপার কপ' বা গ্যাংস্টার মুভিই মন দিয়ে দেখার চেষ্টা করেছি। কোনো চ্যানেলে 'সিংঘম' দেখালে আমার 'বলিউড প্রীতি'তে বিরক্ত ছেলে পর্যন্ত টিটকারি দেয় 'তোমার ফেভারিট মুভি' হচ্ছে বলে। শুধু বলিউড না, আমি শার্লক হোমস থেকে শুরু করে জেমস বন্ড টাইপ সব মুভিই দেখার চেষ্টা করি, 'ডার্ক-জাস্টিস' বোঝার জন্য 'সুপার হিরো' মুভিও। ঢালিউড মুভিও দেখি যথাসম্ভব। এসব প্রায় পেশাগত দায়িত্বের মধ্যেই পড়ে। কারণ অ্যাকশন বা থ্রিলার মুভি আমার জন্য মিথ বা ভাষার মতোই মানুষের মন বোঝার উপাত্ত। রাষ্ট্র ব্যবস্থার দৈনন্দিন চেহারা ও চর্চা বিশ্লেষণ যেমন নৃবিজ্ঞানের ধ্রুপদী কাজ, প্রতীকী ব্যবস্থায় সামাজিক সত্য আবিষ্কার তেমনি তার ধ্রুপদী বিশ্লেষণ পদ্ধতিগুলোর মূল একটি।

নৃবিজ্ঞানের চোখ দিয়ে বুঝতে গেলে, বাংলাদেশসহ বহু আধুনিক রাষ্ট্রে চলমান খুনাখুনি শাসিত জনগোষ্ঠীর একটা বড় অংশের সম্মতি, 'সহমত' অথবা সংশয়ী অবস্থান ছাড়া 'স্বাভাবিক' বা 'সিস্টেমিক ম্যানেজমেন্ট প্রাকটিসে' পরিণত হতে পারে না। কেনো? সেটা আমি ২০১৪ সালের এক আলাপে যতদূর সম্ভব বলার চেষ্টা করছি (আহমেদ ২০১৪-ক)। কিন্তু এই সম্মতি আর সংশয় কীভাবে তৈয়ার হয় সেটা ব্যাখ্যা করতে গেলে 'হাইপার রিয়েল' সমাজ বাস্তবতায় 'ফ্যাক্ট' আর 'ফিকশন' দুটাকেই বিশ্লেষণের আওতায় আনতে হয়। ফলে 'আইনী' বাহিনীর 'বেআইনী' হত্যা প্রবৃত্তির 'স্বাভাবিকায়ন' বোঝার জন্য গণমানসে 'সুপার কপ' আর 'ডার্ক-জাস্টিস' ধারণার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রোডাকশন আর রিপ্রোডাকশন প্রক্রিয়ার বিশ্লেষণ খুব জরুরি হয়ে পড়ে।

লিবারেল রাষ্ট্র-কল্পনায় বিভোর আধুনিক নাগরিক মনের কল্পনায় 'পুলিশ' আসলে দুইটা জোড়-বিপ্রতীপ বা বাইনারি চরিত্রের সংমিশ্রণ; আধুনিক অ্যাংলো-স্যাক্সন সাংস্কৃতিক বলয়ে যার মোক্ষম উদাহরণ হবেন শার্লক হোমস আর জেমস বন্ড, বলছেন নৃবিজ্ঞানী ডেভিড গ্রেয়বার (২০১৫)। এই দুই চরিত্রই আসলে

অভিন্ন সত্তা এই অর্থে যে, দুজনের মধ্য দিয়েই 'অপরাধ', 'পুলিশ' বা আইন-প্রয়োগ নিয়ে পাবলিকের রাজনৈতিক চেতনা বা বাসনার স্ববিরোধিতাই প্রতীকায়িত হয়। বেশি জটিল শোনালেও বিশ্লেষণ পদ্ধতিটাই একটু খুলে বলি।

লেভি-স্ত্রাউস প্রতিষ্ঠিত স্ট্রাকচারাল নৃবিজ্ঞানের বিশ্লেষণ পদ্ধতি মোতাবেক, কোনো প্রতীকের অর্থই স্বতঃসিদ্ধ নয়, অন্য প্রতীকের সাথে সম্পর্কসূত্রেই তার অর্থ নির্ধারিত হতে থাকে। নৃবিজ্ঞানী মাত্রই সংস্কৃতির জটিল জালে ক্রিয়াশীল প্রতীকগুলোর অর্থময়তার আন্তঃসম্পর্কের কাঠামো বা বিন্যাস চিহ্নিত করেই মানুষের মনকে বোঝার চেষ্টা করেন। নৃবিজ্ঞানের এই 'কাঠামো-প্রত্যাশী' (মজহার ১৯৭৭) পদ্ধতির প্রথম ধাপ হচ্ছে ভাষায়, কাব্যে, প্রতীকে, মিথে, টোটেমে, বিশ্বাসে, বয়ানে বা জনমানুষের মনের আর সব অলি-গলি-সন্ধিতে থাকা প্রতীকগুলোর জোড়-বিপরীত সম্পর্কগুলো আবিষ্কার করা।

এই বিশ্লেষণ খুব কঠিন কোনো কাজ না, কোনো থিওরি তো না-ই। এই সম্পর্কের প্রথম সূত্রই হচ্ছে জোড়-বৈপরীত্য বা বাইনারি। সহজ অর্থে এর মূল সূত্র হচ্ছে কোনো প্রতীকী ব্যবস্থা বোঝার ক্ষেত্রে, কোনো প্রতীককে তার জন্য সাংস্কৃতিক অভিধানে নির্দিষ্ট করা অর্থ দিয়ে না বুঝে আর সব প্রতীকের সাথে সম্পর্কসূত্রে বুঝতে হবে। একটা বাক্যে যেমন কোনো পদের অর্থ অন্য পদের সাথে তার সম্পর্কের নিরিখে নির্ধারিত হয়। এজন্য প্রথমে একটা নির্দিষ্ট পরিসর লাগবে, সেখানে ক্রিয়াশীল উপাদানগুলো চিহ্নিত করতে হবে, তারপর একটার সাথে অন্যটার বিপ্রতীপ আন্তঃসম্পর্ক আবিষ্কার করতে হবে। যেমন জনমানসের ভয় যদি পরিসর হয়, হরর মুভির ক্ষেত্রে ড্রাকুলা বা কোনো ভ্যাম্পায়ার চরিত্রকে বুঝতে হবে তার প্রতি-চরিত্র ওয়্যার-উলফ দিয়ে। কারণ একজনকে ছাড়া অন্যজনের কল্পকথা পূর্ণ হয় না।

ফেভারিট কোনো 'সুপার কপ' বা 'সুপার হিরো' থাকার বয়স পেরিয়ে গেলেও লেভি-স্ত্রস এখনো আমার ইন্টেলেকচুয়াল হিরোদের একজন। কারণ ওনার আগের সমাজবিদ্যার কাছে ব্যাখ্যাতীত বিমূর্ত বাস্তবতাকে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের আওতায় নিয়ে

আসবার, উপাত্তে পরিণত করবার, এবং তার অন্তর্লীন আদল 'আবিষ্কার' (খান ২০১১) করবার একটা সহজ ও সাহসী পদ্ধতি তিনি আধুনিক নৃবিদ্যাকে দিয়ে গেছেন। বাংলাদেশ পরিস্থিতির সাংস্কৃতিক বিশ্লেষণের জন্যও আমি তাঁর এই 'অন্তর্লীন-কাঠামো-সন্ধানী' পদ্ধতি (আহমেদ ২০১৪-খ) অকাতরে ব্যবহার করি।

যা হোক, গ্লোবাল নর্থের লিবারেল ও পপুলার রাষ্ট্র কল্পনায় হোমস আর বন্ড এমনই জোড়-বিপরীত সম্পর্কে আবদ্ধ দুই প্রতীক। ইনাদের একজনকে ছাড়া আরেকজনকে বোঝা যাবে না, কারণ ওনারা জনমনে মিশে থাকা দুই বিপরীত বাসনার প্রতীক যা দিয়ে তারা বাস্তবের 'পুলিশ' নিয়ে ভাবে। এই বৈপরীত্যেরই হাজারো প্রকাশ আছে আমাদের রাজনৈতিক জীবন আর কথকতার দৈনন্দিন চর্চায়, 'সুপার কপে'র বিপরীতে 'মনস্টার কপে'র মতো বাইনারি আছে আরো অসংখ্য। আমার ধারণা, বাংলাভাষী সাংস্কৃতিক বলয়ে 'হোমস-বন্ড' জুটির লোকাল বা পোস্টকলোনিয়াল উত্তরাধিকার হচ্ছেন ফেলুদা (বা মিসির আলী) আর 'অবসরপ্রাপ্ত মেজর' মাসুদ রানা। যাই হোক, আপাতত 'হোমস-বন্ড' বাইনারি দিয়েই আরেকটু বোঝা যাক 'পুলিশ' নিয়ে লিবারেল নাগরিক কল্পনার কায়-কারবার।

হোমস আর বন্ড, দুজনেই লন্ডননিবাসী 'অপরাধ-নিরোধকারী' হলেও স্বভাব ও কাজেকর্মে পুরাই বিপরীত। প্রথম জন অ্যামেচার, পরের জন পেশাদার। প্রথম জন একটু নেশা-ভাঙ করলেও যৌনতা উদযাপনে তেমন আগ্রহী নন, দ্বিতীয় জনের মদিরা ও যৌনতা, দুইয়েই আগ্রহ আছে। অ্যামেচার আর খেয়ালি হলেও হোমস নিজের কাজে সাংঘাতিক দক্ষ ও দায়িত্বশীল। ওদিকে পেশাদার হলেও বন্ড মৌজ করতে গিয়ে প্রায়ই নিয়ম, দায়িত্ব বা ছদ্মবেশ ভুলে বিপদে পড়েন। হোমস পুলিশের লোক না হলেও অপরাধ তদন্তে পুলিশের চেয়ে দক্ষ, প্রধানত আইনের সীমার মধ্যেই কাজ করেন। বন্ড রাষ্ট্রীয় সিক্রেট এজেন্ট হলেও শুধু 'লাইসেন্সড টু চিল'ই না, 'লাইসেন্সড টু কিল'ও বটেন। তিনি প্রায় সব কাজই করেন আইনের সীমার বাইরে। এমনকি প্রায়শই নিজ দেশের

'পুলিশ'ই তাকে ধাওয়া করে, নিজের বসই তাকে গ্রেপ্তার বা গুলির নির্দেশ দেয়। প্রায়শই 'হি ইজ আউট অন হিজ ওউন'। একটু খেয়াল করলে দেখবেন স্পাই থ্রিলার 'মিশন ইম্পসিবলে'র ইথান চরিত্রটিও তাই।

কিন্তু এতসব বিপরীত-বৈশিষ্ট্য ছাপিয়েও দুইজনের সবচেয়ে বড় বৈপরীত্য হচ্ছে হোমস অতীতে ঘটে যাওয়া অপরাধ সম্পর্কে 'সত্য' উদঘাটন করে আইনের হাতে তুলে দেন, অন্যদিকে বন্ড গোপন গোয়েন্দা 'তথ্যে'র ভিত্তিতে ভবিষ্যতে ঘটতে পারে এমন 'অপরাধ' আগেই দমন করে ফেলেন। একটু খেয়াল করলেই দেখবেন, দুনিয়ার সর্বত্রই পুলিশের মূল দুইটা কাজ, অতীত 'অপরাধ তদন্ত' এবং ভবিষ্যৎ 'অপরাধ দমন', এই দুই 'সুপার কপ' আখ্যানেই চিত্রিত আছে। জনমানস এই কল্পনা দিয়েই বাস্তবের পুলিশ নিয়ে ভাবে বা বাসনা সাজায়।

'সুপার কপ'কে জনমানসের বাসনার অন্তর্গত করে তোলার প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে গিয়ে নৃবিজ্ঞানী গ্রেয়বার দেখান যে, ইউরোপের সাংস্কৃতিক ইতিহাসে জন-মানসে এই চিন্তনভঙ্গীর একটা সুদীর্ঘ ধারাবাহিকতা আছে। কল্পিত ড্রাকুলা চরিত্র যেমন আছে, তেমনি বাস্তবের চরিত্র এলিয়ট নেস বা ফিলিপ মারলোকে নিয়ে প্রচলিত জনশ্রুতি আছে। ভ্যাম্পায়ার আর ওয়্যার-উলফ, গ্রেয়বার দেখাচ্ছেন, আজকের জন-মানসে 'সুপার কপ' বা 'ডার্ক জাস্টিস' ধারণারই প্রত্নতাত্ত্বিক রূপ। দুই চরিত্রই দানব, ভ্যাম্পায়াররা ছিলেন ধনী আর অভিজাত, থাকতেন ক্যাসল বা ম্যানশনে। ওয়্যার-উলফরা ছিলেন গরিব ও ভবঘুরে, প্রায়শই জেমস বন্ডের মতো ফেরারী, লড়তেন ভ্যাম্পয়ারদের সাথে, দানব হয়ে। শুভ আর অশুভ, দুই শক্তিই তখন দানব, একে অপরের সাথে লড়াই করে প্রতীকী সম্পর্কে আবদ্ধ থাকার কারণেই তারা আবির্ভূত হন জনমানসের কল্পনায়।

মেরিন ড্রাইভের সর্বশেষ খুনে উদ্বেলিত পাঠকের মনে হয়তো ইতিমধ্যেই 'সুপার কপ = মেজর সিনহা' এবং 'মনস্টার-কপ = ওসি প্রদীপ' ধরনের একটা স্ট্রাকচারাল বিশ্লেষণ পাওয়ার আশা জেঁকে বসেছে। কিন্তু সেই পথ আমি মাড়াবো না। কারণ আমার কারেন্ট

হিরো নৃবিজ্ঞানী গ্রেয়বার আরো শিখিয়েছেন, খুনী রাজনৈতিক ক্ষমতা শুধু 'জেমস বন্ড' বা 'নয়ন বন্ডে'র ফিকশনই বানায় না, শাসিত বুদ্ধিজীবীতার জন্য দুইটা সিরিয়াস ওয়ার্নিংও ইস্যু করে। প্রথমটা হচ্ছে, অতীত ঘটনা নিয়ে বেশি জ্ঞান অর্জন করতে গেলে বাটে পড়তে হয় (এই গণপ্রজ্ঞা অর্জনের জন্য 'দি মামি' দেখতে পারেন)। দ্বিতীয়টা হচ্ছে, ভবিষ্যৎ নিয়ে বেশি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে গেলেও বিপদ হয় (উদাহারণ : ফ্রাংকেনস্টাইন চরিত্র)। কাজেই প্রতীকে পরিণত হতে থাকা বাস্তব চরিত্র দিয়ে চলমান খুনাখুনির ভূত-ভবিষ্যৎ বিশ্লেষণের ঝুঁকি আপাতত এড়িয়েই যাব। তাছাড়া, স্ট্রাকচারাল পদ্ধতিরও একটা পরিসীমা আছে। এটা পরাবাস্তবিক দৃশ্য আবিষ্কারের বৈজ্ঞানিক আনন্দে যতদূর আগায় তারচে বেশি ঠেলতে গেলে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ না হয়ে বৈজ্ঞানিক কুসংস্কারে পর্যবসিত হতে পারে।

যা হোক, নৃজ্ঞোনিক বিচার বিশ্লেষণের জন্য 'জনমানস' খুব অদ্ভূত একটা পরিসর কারণ তা সর্বদা এরকম অদ্ভূত সব বৈপরীত্যে ঠাসা থাকে। সমাজের মূলধারার চিন্তা-স্রোত, ক্লিফোর্ড গিয়ার্টয (১৯৭৩) দেখিয়েছেন, মতাদর্শ বা আইনের মতো এক-রৈখিক বা একমাত্রিক না। এখানে বহুমাত্রিক ও বিরোধাত্মক বহু ধারণাই একই সাথে একই মনে ক্রিয়াশীল থাকে। যেমন এই পরিসরে ব্যক্তি মানুষ একই সাথে ধার্মিক এবং সেকুলার বা লিবারেল হতে পারেন এবং তাতে তার সমাজ জীবনে বিশেষ কোনো বিড়ম্বনা পোহাতে হয় না। কিন্তু মতাদর্শিক বা প্রাতিষ্ঠানিক কল্পনায় বৈপরীত্য বা বহুমাত্রিক সম্ভাবনা বা সত্যের জায়গা নেই। এজন্যই ক্ষমতা, খুন, মতাদর্শ, বা ধর্মের মতো সাংস্কৃতিক ব্যবস্থা বোঝার জন্য জনজীবন ও মানসের বহুমাত্রিক বৈপরীত্যকে প্রতীকী ব্যবস্থার 'থিক ডেসক্রিপশন' তৈরী করে ব্যাখ্যা করবার প্রেসক্রিপশন দেন আমার আরেক একাডেমিক হিরো, 'ব্যাখ্যানমূলক নৃবিদ্যা'র অগ্রদূত ক্লিফোর্ড গিয়ার্টয। ইন্দোনেশিয়ার বালি দ্বীপবাসীদের মোরগ লড়াইয়ে প্রতীকাবদ্ধ রাজনৈতিক মনের গড়ন ব্যাখ্যা করে নিজের পদ্ধতি তিনি হাতেকলমে দেখিয়েছেন।

এসব প্রেসক্রিপশন বা পদ্ধতি দিয়ে পাবলিক ডিসকোর্সে ক্রিয়াশীল অযুত-নিযুত সব প্রতীকের মাঝে এরকম শত-সহস্র জোড়-বিপ্রতীপ সম্পর্ক আবিষ্কার করে, তাদের সম্পর্ক সূত্র বিশ্লেষণ করে জনমানসে 'সুপারকপ' বা 'ডার্ক-জাস্টিসে'র বাসনাকে যেমন ব্যাখ্যা করা যায়, তেমনি ব্যাখ্যা করা যায় রাষ্ট্রীয় প্রযোজনায় 'বন্দুকযুদ্ধ' বা 'ক্রসফায়ার' এর মতো একক-উর্ধ্ব-কমা-বন্দী শব্দের প্রতীকে প্রতিভাত চলমান রাজনৈতিক বাস্তবতাকে। ব্যাখ্যা করা যায় মেট্রোপলিটান হওয়ার স্বপ্ন দেখিয়ে ক্রমশ নেক্রোপলিটান হতে থাকা রাষ্ট্রের গুপ্ত ও প্রকাশ্য খুনাখুনির প্রবৃত্তিকে। শাসন-প্রণালীর অঙ্গীভূত চর্চা হিসেবে খুনাখুনিকে বুঝতে হলে, রাজনৈতিক ক্ষমতার এই খুনে প্রবৃত্তির কায়-কারবার ব্যাখ্যা করতে গেলে, নৃবিজ্ঞানের কাছে এই পদ্ধতির বিকল্প নাই।

রাষ্ট্রের হাতে একেকটা খুনের পরে কী কী দেখা গেল, কী কী জানা গেল, কী কী বলা/লেখা/ভাবা গেল, সেটা খুনের ঘটনার মতোই তীব্র বাস্তবতা কারণ এসবের মধ্য দিয়েই পরের খুনের প্লট তৈরী হয়। এই ছিল আমার ২০১১ সালে লেখা নৃবৈজ্ঞানিক উপলব্ধি। এখন আরো স্পষ্ট হচ্ছে যে রাষ্ট্রীয় খুন প্রশ্নে জনমানসে বিরাজমান যে সম্মতি বা স্ববিরোধ, তার মূলে আছে সরল ও 'নির্বোধ' এক রাষ্ট্র-কল্পনা, যার ম্যানুফ্যাকচার আর ডিসট্রিবিউশন আধুনিক রাষ্ট্র নিজেই তদারকি করে, খুনাখুনিকেই 'স্বাভাবিক' শাসন দশা হিসেবে চালানোর মতলবে।

এই পুরো প্রক্রিয়াটি যথেষ্ট বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের আওতায় নিয়ে আসা গেলে 'ভাল ক্রসফায়ার বনাম খারাপ ক্রসফায়ার' ধরনের নির্বুদ্ধিতা কেনো ও কীভাবে জনমানসে দানা বেঁধে অবস্থান করে, তার ব্যাখ্যা পাওয়া যেতে পারে। রাজনৈতিক বাস্তবতার পরিগঠনে নির্বুদ্ধিতার ভূমিকা, এমনকি এই নির্বুদ্ধিতা উৎপাদন প্রণালীকেও ব্যাখ্যা করা সম্ভব এই পদ্ধতি অবলম্বনে। 'ডার্ক' বা 'ডাইরেক্ট' জাস্টিসের বাসনা, কিংবা সুপার বা মনস্টার কপের অ্যাখ্যান কীভাবে ন্যায়হীন বন্দোবস্ত আর খুনাখুনির রাজনৈতিক বাস্তবে বোকামিকে সম্বল করে বাঁচতে শেখায় নাগরিককে, তার

রাজনৈতিক বাসনার বিন্যাসকে কীভাবে বদলে দেয়, আর এসবের মধ্য দিয়ে তার মুক্তির স্পৃহা, তার সামাজিক সত্তা, কীভাবে প্রতিদিন খুন হয় সেই বিবরণ ক্রমশ স্পষ্ট হতে থাকে। হাইপার রিয়াল সময়ে ফ্যাক্ট আর ফিকশনের প্যারালাল ইউনিভার্সে আটকা পড়া বিহ্বল নাগরিক মন, কিম্বা 'ফরেস্ট গাম্পে'র মতো হুদাই দৌড়াইতে থাকা নাগরিক মনের অন্তর্লীন আদল আরো স্পষ্ট হতে থাকে।

খুব বোরিং না আসলে নৃবিজ্ঞান।

উল্লেখিত পূর্বসূত্র

আহমেদ, বখতিয়ার ২০১৪ (ক), 'গুম-খুন-আতঙ্ক : শাসন প্রণালী ও হত্যার কথকতা', বাধন অধিকারী সম্পাদিত বাংলাদেশ পরিস্থিতি : নয়া উদারবাদী যুগে শাসনপ্রণালী ও কথকতা।

আহমেদ, বখতিয়ার ২০১৪ (খ), 'ভাষা, সংস্কৃতি ও মানবসত্তা : একটা নৃবৈজ্ঞানিক আলাপচারিতা', আলী আফজাল খান (সম্পাদিত), ভিন্নচোখ, ভাষা সংখ্যা ২০১৪, ঢাকা।

খান, সলিমুল্লাহ ২০১১, 'লেবিস্ত্রোসের আবিষ্কার', তাঁর স্বাধীনতা ব্যবসায়, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, পৃ. ১৪৫-১৫৭।

মজহার, ফরহাদ ১৯৭৭, প্রস্তাব, বুক সোসাইটি, ঢাকা।

Geertz, Clifford 1973, The Interpretation of Cultures, Basic Books Inc., New York.

Graeber, David 2015, 'Dead Zones of the Imagination: An Essay on Structural Stupidity' in his *The Utopia of Rules: On Technology, Stupidity, and the Secret Joys of Bureaucracy*, Melville House, London.

ওয়াল স্ট্রিট বিদ্রোহ
একজন খুদে মানুষ, একটি অনুবাদ

ভেবেছিলাম শুধু অনুবাদটা করেই এবারের মতো ক্ষ্যান্ত দিব। কিন্তু করতে করতে দেখলাম যা ভেবে লেখাটা অনুবাদ করতে নামা সেটা খোলাসা না করলে ভুল বোঝাবুঝির সুযোগ অনেক। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে, প্রিয় এক বন্ধুর ভাষায়, আমার 'উচ্চশিক্ষার্থে পরলোকগমন' দশা অনেক বেশি বাংলা লেখার সুযোগ দেয় না, আর সেই সাথে নিজের বৈকল্য তো আছেই। তারপরও মূল লেখাটার সামনে অনুবাদকের এভাবে জুড়ে বসার কারণ বাংলা ভাষা পরিসরে 'নৈরাজপন্থা' নিয়ে আলোচনার কিছু বিপদ আছে। শব্দার্থগত সংকট তো আছেই, খোদ 'নৈরাজ' নিয়ে আধুনিক নাগরিকের যে ইতিহাস-বিবর্জিত ধারণা সেটাও এই লেখার পাঠ অস্বস্তিকর করে তুলতে পারে। কিন্তু আমি নাগরিকের ধারণা পাল্টানোর পুরা দায়িত্ব নিতে অক্ষম, এবং এটাকে কোনো এক ব্যক্তির একার কাজ বলে মনেও করি না। ফলে লেখাটার সাথে নিজের সম্পর্ক আর পাঠ অভিজ্ঞতার কিছু এলোমেলো বিবরণ ছাড়া অন্য কোনোভাবে এই দায় মেটানোর উপায় নেই।

গত বছর পাঁচেক ধরে আমি একটা অস্ট্রেলিয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজ পরিবর্তন বিষয়ক গবেষণা কেন্দ্রের গবেষক-শিক্ষার্থী। 'মাল্টিডিসিপ্লিনারি ও মাল্টিকালচারাল' এই গবেষণা কেন্দ্রের

করিডোরে আমার পরিচয় আমি বাংলাদেশি নৃবিজ্ঞানী। তো, এখানে ২০০৭ সালের দিকে সমসাময়িক সামাজিক আন্দোলন বিষয়ে লেখালেখি ঘাঁটতে গিয়ে ভীষণ বদ-মেজাজী এক লেখার মুখোমুখি পড়ে যাই, এক মার্কিন নৃবিজ্ঞানী, ডেভিড গ্রেয়বার তার নাম। The Globalization Movement: Some Points of Clarification শিরোনামের লেখার প্রথম বাক্য, 'A great deal of nonsense has been written about the so-called antiglobalisation movement', লেখাটায় তার ক্ষুরধার বিশ্লেষণের বিষয় 'বিশ্বায়ন আন্দোলন', যাকে কর্পোরেট মিডিয়া 'বিশ্বায়ন-বিরোধী আন্দোলন' নামে প্রচার করে, সেখানে মিডিয়া ও একাডেমি তথা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকা। পিয়েরে বরদিউ'র মতো, তিনিও মনে করেন সেই আন্দোলনে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সমাজবিদ্যার পণ্ডিতদের ভূমিকা, তার সোজা কথায় 'ন্যাক্কারজনক'। সেই সব এন জি ও পুষ্ট অধ্যাপক, যারা বছরের পর বছর অস্তিত্বহীন সব সামাজিক আন্দোলন বিষয়ে বস্তা বস্তা কাগজ গয়দা করেছেন তারা সবাই সিয়াটলের মতো বিদ্রোহ নিয়ে কবরের নীরবতা পালন করছেন। তিনি শুধু অভিযোগ তুলে ক্ষান্ত দেন নাই। একজন খাঁটি নৃবিজ্ঞানীর মতো এই আন্দোলনগুলোতে নিজের সক্রিয় অংশীদারি অভিজ্ঞতা দিয়ে ব্যাখ্যা করেছেন কর্পোরেটের বিরুদ্ধে মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত শান্তিপূর্ণ বিদ্রোহের বয়ান। লেখাটা পড়তে পড়তে ২০০৩ সালে, আমার বিশ্ববিদ্যালয়ে মাস্টারির প্রথম বছরে লেখা এক অসহায় জবানবন্দীর স্মৃতি জেগে উঠেছিল। কিন্তু নৃবিজ্ঞানের ছাত্র হিসেবে আমি ২০০৭-এ আরেকটু উপরের ক্লাসে পড়ি, ফলে এই মিল আমাকে অবাক করেনি। নৈরাজপন্থী অধ্যাপক ব্রায়ান মার্টিনের ক্লাস করতে গিয়ে আমি তখন 'হুইসেল ব্লোয়িং' কথাটার মানে বুঝে গেছি, মানুষের ইতিহাসের ভাঁজে ভাঁজে স্বরাজের সুন্দরকে চিহ্নিত করা একটু একটু করে শিখছি।

যা হোক, আমি গ্রেয়বারের পিছু ছাড়লাম না। লাইব্রেরি হাতড়াতে গিয়ে পেয়ে গেলাম আরেকটা চটি বই, 'Fragments of

an Anarchist Anthropology', পড়তে গিয়ে দেখি এখানে তিনি বোঝার চেষ্টা করছেন রাষ্ট্রবিহীন সমাজ যে খুবই সম্ভব এবং এটাই যে মানব-প্রকৃতির সাথে একমাত্র সংগতিপূর্ণ ক্ষমতা বিন্যাস, বার বার এই অমূল্য-অপরূপ সত্যের মুখোমুখি হয়েও কেনো নৃবিজ্ঞানীরা মুখে কুলুপ এঁটে থেকেছেন। মনে পড়ছে সবচেয়ে মজার উদাহারণ ছিল র‍্যাডক্লিফ ব্রাউন। নৈরাজপন্থার প্রতি ঝোঁকের কারণে বন্ধুরা তাকে ডাকতেন 'এনার্কো ব্রাউন' নামে। কিন্তু যেই তিনি কেম্ব্রিজের নৃবিজ্ঞান বিভাগের প্রধান হলেন, 'স্যার' হলেন, মুখ দিয়ে নৈরাজ শব্দটি আর কেউ কোনোদিন শুনতে পায়নি। যদিও তার আজীবন গবেষণার বিষয় থেকেছে আন্দামান দ্বীপের নৈরাজ্যিক সমাজগুলোর রাজনৈতিক বিন্যাস, The Andaman Islanders, এক অসাধারণ এথনোগ্রাফি। যাই হোক, আমার নিজের পিএইচ ডি গবেষণার বিষয় বাংলাদেশ রাষ্ট্রের প্রান্তসীমা পার্বত্য চট্টগ্রামে পরিচয় ও উন্নয়নের রাজনীতি। পিয়েরে ক্লস্ত্রে আর পিয়েরে বরদিউ নামের দুই ফরাসি নৃবিজ্ঞানীকে পড়ার চাপেই আমি তখন জেরবার, তার ওপর এসে জুটলেন দুই আমেরিকান, জেমস স্কট আর এই ডেভিড গ্রেয়বার, আমার নিজের থিসিস লেখা প্রায় লাটে উঠল। কিন্তু একই সাথে বদলে যেতে থাকল নৃবিজ্ঞান নিয়ে আমার নিজের চিন্তা। একের পর এক ডেডলাইন মিস করতে থাকলাম, সুপারভাইজারের হাসি শুকনা থেকে শুকনাতর হতে থাকল, আর আমি নৃবিজ্ঞানের ছাত্র হিসেবে আগের দেড় যুগের বহু শিক্ষা অশিক্ষা করার কাজে লেগে গেলাম। এখনও লেগে আছি, কিন্তু বাস্তব জ্ঞান খানিকটা ফিরেছে, পিএইচ ডি শেষ করতে চাই।

এই সেপ্টেম্বরে যখন ওয়াল স্ট্রিট বিদ্রোহ শুরু হল, অনেকেই হয়তো খেয়াল করেছেন, মিডিয়া প্রথমে পরিষ্কার চেপে যাওয়ার চেষ্টা করল। পরে যখন দেখা গেল এটা আসলে চেপে রাখবার মতো জিনিসের চেয়ে বহুগুণ বড়, তখন শুরু হল এ নিয়ে আবোল-তাবোল সংবাদ পরিবেশন। সেই বিস্তারে যাওয়ার সুযোগ আমার নেই কিন্তু একটা জিনিস মনে হচ্ছিল যে,

আন্তরিকতা থাকা সত্ত্বেও মিডিয়ার অনেকের কাছে, এবং সাধারণ্যের কাছে আন্দোলনটা ভীষণ অস্পষ্ট এবং ব্যাখ্যাতীত ব্যাপার, অবাক হওয়ার মতো ব্যাপার! মাসের পর মাস আন্দোলন চলছে কিন্তু এখনও কোনো হিরোর নাম জানা গেল না, কোনো নির্দিষ্ট দাবি নাই, কোনো নেতা নাই, এ কেমন আন্দোলন! মিডিয়াও এ নিয়ে গলদঘর্ম হতে থাকল, কিন্তু খুব একটা সুবিধা করা গেল না। কিন্তু সামাজিক আন্দোলনের পেশাদার গবেষক হিসেবে আমার অবাক হওয়ার অনুমতি নাই। কাজেই আমি গুগলে সোজা ডেভিড গ্রেয়বার নামে খোঁজ লাগালাম, দেখলাম মামা ঠিকই আছেন ব্রিটিশ পত্রিকা 'দি গার্ডিয়ানে', নিজের মতো নিজের কাজটা ঠিকই করে যাচ্ছেন। এর মধ্য হঠাৎ দেখি 'বিজনেস উইক' ম্যাগাজিন অক্টোবরের ৩১ তারিখের সংখ্যায় অকুপাই ওয়াল স্ট্রিট নিয়ে তাদের বিশেষ সংখ্যার শিরোনাম দিয়েছে 'Who is Behind the Mask?' খানিকটা চমকে, মনে সন্দেহ নিয়ে সেই মুখোশ উল্টালাম, দেখি ডেভিড গ্রেয়বারের নাম। শংকা আরো বেড়ে গেল কারণ আমি জানি এই বিদ্রোহে তো কারো হিরো হওয়ার কথা নয়। লেখাটা পড়ে ভুল ভাঙল। আমার ধারণা গ্রেয়বারকে যদি জিজ্ঞেস করা হয় আপনি এখানে কী করছেন, উত্তর হবে নৃবিজ্ঞানী হিসেবে নিজের সামাজিক ভূমিকা পালন করছি। আর লেখাটা হচ্ছে এক নৃবিজ্ঞানীকে নিয়ে লেখা, এথনোগ্রাফিক ধারায় অনুপ্রাণিত একটি রচনা। শিবের গীত লম্বা হয়ে যাচ্ছে, কাজেই কিছু জরুরি আলাপ দিয়ে শেষ করি।

এনার্কি'র বাংলা কী হবে এ বিষয়ে আমার এখনও কোনো চূড়ান্ত ফয়সালা নাই। আমি নৈরাজ/নৈরাজ্য/নৈরাষ্ট্র/স্বরাজ/অরাজ ইত্যাদি শব্দমূলের নানা ধর্মী প্রয়োগ নিয়ে ভাবি, কোনো একটাতে থিতু হওয়ার তাড়া যেমন নাই, তেমনি উপায়ও নাই আপাতত। কিন্তু এই শব্দগুলোর, বিশেষত 'নৈরাজ্যে'র সরকারি মানেটাই এখন পর্যন্ত মতাদর্শ নির্বিশেষে বাংলা ভাষার সমসাময়িক সব লেখক নির্বিচারে মেনে নিয়েছেন। প্রায়ই অবাক হই এই লেখকদের তালিকায় কষ্ট-কল্পনীয় সব নাম দেখে। নৈরাজপন্থী

ধ্যান-ধারণার ঐতিহাসিক সূতিকাগারগুলোর একটি হয়েও বাংলাভাষী অঞ্চলের সমসাময়িক রাজনৈতিক চিন্তাধারায় নৈরাজপন্থা বুদ্ধিবৃত্তির সরকারি পরিভাষার তাবেদারিতে আটকে আছে। কাজেই এই লেখাটি পড়ার গুরুত্বপূর্ণ একটা মানসিক প্রস্তুতি হওয়া উচিত 'নৈরাজ' শব্দটার সরকারি মানের চক্কর থেকে বেরুনো।

নৈরাজপন্থা আসলে কী? নৈরাজপন্থা আসলে কোনো রাজনৈতিক মতবাদ নয়। অন্য এক লেখায় গ্রেয়বার বলেছিলেন, 'মার্কসবাদ হচ্ছে বিপ্লবের কৌশল বিষয়ক তাত্ত্বিক ও বিশ্লেষণধর্মী ডিসকোর্স আর নৈরাজপন্থা হচ্ছে বিপ্লবী চর্চার নৈতিকতা বিষয়ক ডিসকোর্স।' নৈরাজ্যের চূড়ান্ত লক্ষ্য নৈরাজ্যই, এনার্কি ইজ অর্ডার। আর সব রাজনৈতিক দর্শন মানুষকে প্রাকৃতিকভাবে হিংস্র, স্বার্থপর মনে করে (হবস্ের কল্পনা) এবং হানাহানিকেই আদি শাশ্বত সামাজিক দশা মনে করে। ফলে রাষ্ট্রকে বল-প্রয়োগের সার্বভৌম ক্ষমতা দেয়া হয় একজন আরেকজনকে দেখিবামাত্র খুন করবার একটা সম্ভাবনাকে সমাজের প্রকৃতি অনুমান করে। খুনাখুনিকেই আদি মানব-দশা বা অর্ডার বোঝানো হয়। মনে করা হয় আইনের শাসন, কারাগার, এবং শাস্তির সার্বক্ষণিক একটা আতংক না থাকলে মানুষ মানুষ থাকবে না। অন্যদিকে নৈরাজপন্থীরা মনে করেন, একে অন্যকে সহযোগিতাই হচ্ছে মানব প্রকৃতি। এবং মানুষ এটা রাষ্ট্রের খবরদারি, আইনি ব্যবস্থা এবং কোনো ধরনের হুজুরদের উপস্থিতি ছাড়াই করতে সক্ষম। রাষ্ট্রের দাপুটে ইতিহাস আমাদের এই সত্যটা ভুলিয়ে দেয় যে, মানবেতিহাসের ৯৯ শতাংশ সময়জুড়ে সব মানব সমাজ, এবং গত শতাব্দীর আগ পর্যন্ত পৃথিবীর বেশিরভাগ জায়গার মানুষেরা সেটা করেছে। নৈরাজপন্থীরা আস্থা রাখেন মানুষের অনাদি মমত্ববোধের ওপর, সমাজের মধ্যে অরাজনৈতিক (কর্তৃত্বহীন) ক্ষমতা চর্চার ওপর। তারা মনে করেন, কর্তৃত্ব ছাড়াও নেতৃত্ব সম্ভব। রাষ্ট্রীয় আয়োজনে সংখ্যাগরিষ্ঠের গণতন্ত্রকে তারা সামরিকতন্ত্রেরই নামান্তর মনে করেন, কারণ এখানেও একটি ছোট্ট 'নির্বাচিত' দলকে বৃহদাংশের ওপরে বল

প্রয়োগের ক্ষমতা দেয়া হয়। নৈরাজপন্থীরা মনে করেন, একটি সমাজের প্রয়োজনীয় সব সিদ্ধান্ত প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের মাধ্যমে, সম্মিলিত অংশগ্রহণে নেয়া সম্ভব।

নৈরাজপন্থীদের লক্ষ্য ক্ষমতা দখল নয়, ক্ষমতাতন্ত্রের অবসান। এই অনুবাদ, বা মূল লেখার লক্ষ্য ডেভিড গ্রেয়বারকে হিরো হিসেবে উপস্থাপন নয়। বছর পাঁচেক ধরে তার দূরবর্তী কিন্তু মনোযোগী ছাত্র হিসেবে জানি যে, আইডিয়াটা উনিও পছন্দ করবেন না। বরং লেখাটি রাজনৈতিক আন্দোলন বা এর নেতৃত্ব যে কর্তৃত্ববিহীনও হতে পারে তার একটা কেস স্টাডি হিসেবে পড়া যেতে পারে। প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র যে একটি বাস্তব, এবং প্রয়োগযোগ্য, এবং অর্জনযোগ্য ব্যাপার, ওয়াল স্ট্রিট বিদ্রোহ যে তার জলজ্যান্ত উদাহরণ, এটা অনুধাবন করা যেতে পারে এই লেখা থেকে। কিন্তু ওয়াল স্ট্রিট বিদ্রোহকে নৈরাজপন্থী বিদ্রোহ বলার উদ্দেশ্য এটার গায়ে কোনো রাজনৈতিক মতবাদের ব্র্যান্ড লাগানো নয়, কারণ আগেই বলেছি, নৈরাজপন্থা কোনো রাজনৈতিক মতবাদ নয়, খোদ রাজনীতি প্রশ্নে একটি নৈতিক অবস্থানের নাম। অন্যদিকে নৃবিজ্ঞানকে একতরফাভাবে একটি বিপ্লবী/বেপরোয়া বিজ্ঞান হিসেবে হাজির করাও এর উদ্দেশ্য নয়। রাষ্ট্র–ব্যবস্থা বিবর্জিত সমাজ সম্পর্কে মানববিদ্যাগুলোর মধ্যে নিঃসন্দেহে নৃবিজ্ঞানই সবচেয়ে বেশি ভেবেছে কিন্তু সেই ভাবনার বড় অংশই কানার হস্তীদর্শন ... যেখানে রাষ্ট্র নেই সেখানে তারা কাল্পনিক আদিম বর্বরতা দেখেছেন, আবার যেখানে উপনিবেশিক রাষ্ট্র পুরাদমে হাজির থেকে রাষ্ট্রবিহীন রাজনৈতিক ব্যবস্থাগুলোকে ধ্বংস করেছে সেখানে আধুনিক রাষ্ট্রের জলজ্যান্ত উপস্থিতিকেও তারা উপেক্ষা করে গেছেন। উদাহরণ হতে পারে ইভান্স প্রিচার্ডের ‘দি নুয়ের’। নুয়েরদের রাজনৈতিক ব্যবস্থা নিয়ে রাজনৈতিক নৃবিজ্ঞানের এই ধ্রুপদী এথনোগ্রাফিটিতে তিনি সব বলছেন শুধু নুয়েরদের রাজনৈতিক ব্যবস্থা যে আসলে রাষ্ট্রের বিপরীতে একটি বাস্তব, যৌক্তিক এবং নৈরাজ্যিক ব্যবস্থা এটা বাদে। আবার একই সাথে এই গোত্রগুলোর চারপাশ থেকে চেপে আসা আধুনিক রাষ্ট্রের ভৌতিক

উপস্থিতিকেও তিনি নিজের লেখায় অনুপস্থিত রেখে দিচ্ছেন। আর সবচেয়ে বড় যে ঝামেলাটা উপনিবেশিক (উপনিবেশ কিন্তু কোনো মৃত অতীত নয়) যুগের নৃবিজ্ঞানীরা বাধিয়েছেন—রাষ্ট্রবিহীন সমাজকে আদি, আদিম, এথনিক, ট্রাইবাল, উপজাতি ইত্যাকার নামে ডেকে মানুষের ইতিহাসকে বিবর্তনের অমোঘ সরল রেখায় সাজিয়ে দেখিয়েছেন রাষ্ট্র মানুষের ইতিহাসের অবিকল্প/অনিবার্য নিয়তি, এটাই একমাত্র কাম্য, এটাই স্বাভাবিক, এটাই সভ্যতার তথা মানুষের রাজনৈতিক ইতিহাসের শেষ গন্তব্য। ফলে নৃবিজ্ঞানও জান্তে বা অজান্তে বৃহদাংশে সেই কাণ্ডজ্ঞানের অংশ হয়ে গেছে যা মানুষকে ডাণ্ডা ও দণ্ড ছাড়া সভ্য ভাবতে পারে না।

অহিংস নাগরিক বিদ্রোহ, ওয়াল স্ট্রিট বিদ্রোহের যেটা মূল রাজনৈতিক কৌশল, সেটাকেও অদ্বিতীয়, অবিকল্প এবং সর্বজনীন নৈরাজ্যিক রাজনৈতিক কৌশল হিসেবে ভাবাটাও ঠিক নয়। আসলে নৈরাজের ধারণা মানুষের অচেতনের এমন গভীরে প্রোথিত যে সেটাকে শুধু তার রাজনৈতিক কৌশলের নিরিখে বুঝতে যাওয়াটাও বোকামি। যেমন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, বা ঢাকা শহরে অনশন একটি কার্যকর পদ্ধতি হতে পারে কারণ সেখানে মিডিয়া আছে, জনতা আছে, রাষ্ট্রের আইনি বাধ্যবাধকতা আছে। কিন্তু ঝাড়খণ্ডের জঙ্গলে রাষ্ট্রের হাতে নিষ্পেষিত আদিবাসীরা অনশন করে কোনো রাজনৈতিক অর্জনে পৌঁছাতে পারবে না, কারণ তারা যে না খেয়ে আছেন সেটা দেখবার মতন কেউ নেই, কখনও ছিলও না। আদিবাসীদের মুক্তি আকাঙ্ক্ষা, স্বরাজের আকাঙ্ক্ষা সেখানে তাই মাও সে তুং এর বন্দুক হয়ে গর্জে ওঠে।

ডেভিড গ্রেয়বারকে নিয়ে আমার প্রধানতম প্রেমানুভূতি হচ্ছে তিনি অতি সাধারণ, স্বাভাবিক, ক্ষুদে একজন মানুষ যিনি নিজের ছোট্ট কোণটিতে নিজের ছোট্ট কাজটা ঠিকঠাক মতো করবার চেষ্টা করেন। ওয়াল স্ট্রিট বিদ্রোহের মতো কাণ্ড ঘটানোর চতুর্থ দিনে বিরহ কাতর প্রেমিক হয়ে ছুটে যান নিউ ইয়র্ক থেকে অস্টিনে, বদ-মেজাজের জন্য চাকরি হারান, ৫০ বছর বয়সে এসে ফেল মারেন ড্রাইভিং টেস্টে। ওয়াল স্ট্রিট বিদ্রোহ থেকে সামাজিক

আন্দোলনের ছাত্র হিসেবে আমার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা হল কীভাবে অরাজপন্থা অতি সাধারণ সব মানুষকেও ইতিহাসে তার ভূমিকা পালনের ক্ষেত্র তৈরি করে দেয়, কীভাবে ব্যক্তির আপাত সাধারণ গুণাবলিকেও ইতিহাস নির্মাণের কাজে লাগায়, কীভাবে ইতিহাসকে হিরোদের হাত থেকে উদ্ধার করে ছোট্ট ছোট্ট সাধারণ মানুষদের হাতে তুলে দেয়। অরাজপন্থা এ কারণেই আজকের সময়ের সবচেয়ে সম্ভাবনাময় রাজনৈতিক অবস্থান, কারণ তা রাজনীতির নামে ব্যক্তিকে সমাজের বোঝা না বানিয়েও তার সমস্ত সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে পারে মুক্তির লড়াইয়ে। ব্যক্তি মানুষও মুক্তি পায় কর্তৃত্বের/নেতৃত্বের অভিশাপ থেকে। গ্রেয়বারের একটা ছবি খুঁজে টাঙিয়ে দিতে ইচ্ছে হচ্ছিল নোটে, পরে ভুল বোঝাবুঝির ঝুঁকি বিবেচনায় বাদ দিলাম। থাক না ছোট্ট মানুষেরা অনিন্দ্য সুন্দর সব মুখোশের আড়ালেই।

কিছু টেকনিক্যাল টার্ম আছে, আমি ফুটনোট দেয়াসহ নোটটার ঘষামাজা অব্যাহত রাখার চেষ্টা করব। আর বানানের বিষয়ে নিঃশর্ত ক্ষমা চাওয়া ছাড়া আপাতত গতান্তর নাই।

এইখান থেকে অনুবাদ শুরু ...

ডেভিড গ্রেয়বার : ওয়াল স্ট্রিট দখল আন্দোলনের অ্যান্টি-লিডার পরিচিত হউন এক নৃবিজ্ঞানী, রাজনৈতিক কর্মী, ও নৈরাজ্যবাদীর সাথে যিনি এক অভাগা মিছিলকে একটি বৈশ্বিক প্রতিরোধ আন্দোলনে রূপান্তরিত হতে সহায়তা করেছেন।

লিখেছেন—**ড্রেক বেনেস্তে**

ডেভিড গ্রেয়বার বলতে পছন্দ করেন যে এ বছর আসলে তার লক্ষ্য ছিল তিনটা—নিজের বইয়ের বিক্রি-বাট্টা বাড়ানো, গাড়ি চালানো শেখা, এবং বিশ্বব্যাপী একটা বিপ্লব শুরু করা। প্রথম কাজটা ভালই চলছে, দ্বিতীয়টা কঠিন লাগছে, এবং তৃতীয়টার ক্ষেত্রে অগ্রগতি ভাল। গ্রেয়বার একজন ৫০ বছর বয়সি নৃবিজ্ঞানী—কেউ কেউ মনে করেন নিজের প্রজন্মের উজ্জ্বলতমদের একজন—খ্যাত হয়েছেন বিনিময় ও মূল্য ব্যবস্থা নিয়ে উদ্ভাবনী তত্ত্বের জন্য, 'ইরোকুইজ

ওয়ামপুম' বা 'কোয়াকিটল পোটলাচ'র মতন নৃবৈজ্ঞানিক প্রপঞ্চ ঘেঁটে। মার্কিন নাগরিক, এখন শিক্ষকতা করেন ইউনিভার্সিটি অফ লন্ডনের গোল্ডস্মিথ কলেজে। নৃবিজ্ঞানী ছাড়াও তিনি একজন নৈরাজ্যবাদী এবং আমূলপন্থী সংগঠক, গত কয়েক দশকের অনেকগুলো বড় বামপন্থী প্রতিরোধ আন্দোলনের লড়িয়ে; কুইবেক সিটি এবং জেনোয়া, নিউ ইয়র্ক এবং ফিলাডেলফিয়াতে রিপাবলিকান জাতীয় কনভেনশনে বিক্ষোভ, ২০০২ সালে নিউ ইয়র্কে বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরামের সভায় বিক্ষোভ এবং সর্বশেষ এ বছরের গোড়ায় লন্ডনের বর্ধিত ছাত্রবেতন বিরোধী বিক্ষোভে সক্রিয় ছিলেন।

এই গ্রীষ্মে গ্রেয়বার ছিলেন ছোট্ট একদল রাজনৈতিক কর্মীদের একজন যারা প্রথমে নিঃশব্দে পরিকল্পনা করেছে, তারপর ঢোল পিটিয়ে দখল করেছে লোয়ার ম্যানহাটনের জুকত্তি পার্ক, তারপর অকুপাই ওয়াল স্ট্রিট নামে এক আদলহীন বৈশ্বিক আন্দোলনের পাদ-প্রদীপ হয়ে উঠেছে। গ্রেয়বারকে এই আন্দোলনের একজন নেতা বলা ভুল হবে, কারণ তাদের মধ্যে সার্বক্ষণিক চর্চিত কর্তৃত্বহীনতার দর্শন নেতৃত্বের ধারণাটাকেই বিদঘুটে মনে করে। তিনি আন্দোলনের কোনো মুখপাত্রও নন, কারণ এই আন্দোলন এখন পর্যন্ত কোনো সুনির্দিষ্ট দাবি-দাওয়া পেশ করতে অস্বীকার করেছে। এমনকি, জুকত্তি পার্কেও তার নাম খুব বেশি লোকে জানে না। কিন্তু তিনি এই দলটির সবচেয়ে সুসংহত কণ্ঠস্বরগুলোর একজন যিনি আন্দোলনের আশা-নিরাশাকে ফ্রেমে তুলে ধরতে পারেন এই ঐতিহাসিক মুহূর্তটির গভীরতর বোঝাপড়ার মধ্য দিয়ে। 'আমরা যা দেখছি তা হচ্ছে এক নতুন আমেরিকান প্রজন্মের বিদ্রোহী আত্ম-সত্তার সূচনা, এমন এক প্রজন্ম যারা দেখতে পাচ্ছে পড়াশুনা শেষ করে তাদের সামনে কোনো চাকরি নেই, কোনো ভবিষ্যৎ নেই, আছে শুধু বিশাল অংকের ক্ষমাহীন ঋণের বোঝা।' সেপ্টেম্বরের ২৫ তারিখে গার্ডিয়ানে লেখা এক উপসম্পাদকীয়তে তিনি লিখেছিলেন 'এটা কি আসলে অবাক হওয়ার মতো ব্যাপার যে তারা তাদের ভবিষ্যৎ চুরি করা অর্থকড়ির রাঘব-বোয়ালদের সাথে একটা ফয়সালা করতে চাইছে?'

গ্রেয়বারের রাজনৈতিক ধ্যান-ধারণা কাঠামো পেয়েছে বৈশ্বিক ন্যায়বিচার আন্দোলনের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে, কিন্তু একই সাথে তা ঋদ্ধ হয়েছে তার জীবনের আরেক অংশ, নৃবিজ্ঞানী হিসেবে তার কাজের মধ্য দিয়ে। গ্রেয়বারের সর্বশেষ বই, 'ঋণ প্রথম ৫,০০০ বছর' প্রকাশিত হয়েছে ওয়াল স্ট্রিট বিদ্রোহের দুই মাস আগে। বইটা টাকা ও বাজার ব্যবস্থার উদ্ভব ও বিকাশের একটি বিকল্প ইতিহাস; বিশাল বিস্তৃতি, গভীর বোঝাপড়া, এবং চিন্তা নাড়া দেয়ার মতো এক কাজ। পশ্চিম আফ্রিকার টিভ জনগোষ্ঠী থেকে শুরু করে প্রাচীন সুমেরীয় থেকে মধ্যযুগের আয়ারল্যান্ড থেকে আধুনিক আমেরিকা পর্যন্ত অজস্র সমাজের বরাত দিয়ে তিনি দেখাচ্ছেন কীভাবে ঋণের প্রতি মানুষের একটা অনিশ্চিত আচরণ কাজ করে, কীভাবে ঋণ একই সাথে বাধ্য-বাধকতা ও পাপ হিসেবে বিরাজ করে, কীভাবে একই সাথে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং শোষণ-নির্যাতনের হাতিয়ার হিসেবে কাজ করে। এই ইতিহাসের পথ পাড়ি দিতে দিতেই তিনি এ প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা করেন কেনো ইতিহাসজুড়ে বেশির ভাগ মানুষই ঋণ শোধ করা একটি নৈতিক দায়িত্ব মনে করে, কিন্তু আবার একই সাথে মনে করে যে টাকা ধার দেয়া যাদের পেশা তারা শয়তান। গ্রেয়বারের যুক্তিতর্কের ধারা তাকে সরাসরি অর্থশাস্ত্রের মূলসূত্রগুলোর মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয়, এবং শাস্ত্রটি তাকে, মোটাদাগে, অবজ্ঞা করেছে।

কিন্তু বইটা সাধারণ পাঠকদের মাঝে জনপ্রিয় হওয়ার জন্য এর চেয়ে মাহেন্দ্রক্ষণ আর কিছু হতে পারে না। তার লেখালেখি, তিনি যে আন্দোলনটার সূচনার সাথে জড়িত সেটাকে একটি বুদ্ধিবৃত্তিক কাঠামো দিয়েছে, একে একটা ঐতিহাসিক গতিধারার সাথে যুক্ত করেছে। ওয়াল স্ট্রিট বিদ্রোহীদের অস্পষ্ট দাবি-দাওয়া দুইটা বিষয়ে ঘুরপাক খাচ্ছে—এক. রাজনীতিতে টাকার প্রভাব; দুই. ঋণ বন্ধক, ক্রেডিট কার্ড, শিক্ষা ঋণ এবং তার সাথে বৃহৎ ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠানগুলো এবং বড় ব্যক্তি ঋণগ্রহীতাদের ২০০৮ সালের অর্থনৈতিক ধসের সময় যেভাবে আপ্যায়ন করা হয়েছে তার তুলনা। 'ও অনেক গভীর করে ভাবতে পারে, ও বরাবরই

আন্দোলন আর বিপ্লবের ছাত্র', বলছিলেন কালে লাসন, ভ্যাঙ্কুভারের কর্পোরেট বিরোধী ম্যাগাজিন 'অ্যাডবাস্টার্স' এর প্রতিষ্ঠাতা। সে হচ্ছে ওই টাইপের লোক যে বলবে, 'আমরা যার মধ্য দিয়ে যাচ্ছি সেটা কি ১৯৬৮ সালের মতো নাকি ফরাসি বিপ্লবের মতো?' গ্রেয়বার এটা ব্যাখ্যা করেন আরো বড় এক গল্পের অংশ হিসেবে—ইতিহাসজুড়েই ঋণ আসলে নাগরিকদের নিয়ন্ত্রণ এবং তাদের সম্পদ হরণের রাষ্ট্রীয় হাতিয়ার (সাধারণত যুদ্ধে খরচ করবার জন্য) এবং ইতিহাসে যখনি যথেষ্ট পরিমাণ মানুষ যথেষ্ট পরিমাণ ঋণে নিমজ্জিত হয়েছে, তখনি সাধারণত কোনো না কোনো ধরনের বিদ্রোহ হয়েছে।

গ্রেয়বার ছোট্ট-খাট্ট অস্থির ধরনের মানুষ, নীল চোখ, কিশোরসুলভ ফ্যাকাসে মুখ। স্নাতক শিক্ষার্থীদের মতন পোশাক-আশাক পড়েন, হড়বড় করে কথা বলেন, লম্বা যুক্তিমালার ফাঁকে ফাঁকে রাগে ফেটে পড়েন, ছেড়া-খোঁড়া হাসি দেন, দম নেওয়ার জন্য আবার একটু থামেন। কারো চোখে খুব একটা চোখ রাখেন না। একটা চিন্তা শেষ করার পর হাঁসের মতো মাথা ঝাঁকান, ভুরু দিয়ে ধনুক বানান, যেন তিনি এইমাত্র একটা হালকা কিন্তু আশংকাজনক শব্দ শুনতে পেয়েছেন। ওয়াল স্টিট বিদ্রোহ শুরু হওয়ার চার দিন পর থেকে কয়েক সপ্তাহ গ্রেয়বার ছিলেন টেক্সাসের অস্টিনে, দীর্ঘ মাঠ-গবেষণা শেষে মেক্সিকো থেকে ফেরা সহ-নৃবিজ্ঞানী বান্ধবীর সাথে সময় দিতে। সেখানেও খানিকটা জড়িয়ে ছিলেন অকুপাই বিদ্রোহের দুনিয়ার বহু জায়গার মতো স্থানীয় সংস্করণ 'অকুপাই অস্টিনে'। এই গ্রীষ্মটা গ্রেয়বার শুরু করেছিলেন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাবাটিকেল ছুটি নিয়ে লন্ডন থেকে নিউ ইয়র্কে এসে, যেখানে প্রায়শই আড্ডা দিতে যেতেন ১৬ বিভার নামের একটা 'আঁতেল'দের আখড়ায়। এটা ছিল ওয়াল স্ট্রিটের পাশেই বুদ্ধিবৃত্তিক অ্যাক্টিভিস্টদের একটা আখড়া যেখানে লোকজন শব্দার্থবিজ্ঞান, ইন্টারনেট হ্যাকিং বা আদিবাসী সংগ্রাম নিয়ে কথা বলে।

আরো অনেক আমেরিকান অ্যাক্টিভিস্টদের মতোই গ্রেয়বারও গভীর নাড়া খেয়েছিলেন মিশরীয় জনতার তাহরির চত্বর দখল,

এবং মাদ্রিদের কেন্দ্র দখল করা 'ইন্ডিগনাদোস'দের দেখে। মধ্য জুলাইয়ের দিকে তিনি 'অ্যাডবাস্টার্স' এ একটা ছোট নিবন্ধ লেখেন এরকম একটা উত্থান পশ্চিমে ঘটানোর জন্য কী কী করা যায় সে নিয়ে। গরমের বেশিরভাগ সময়টা জুড়ে ১৬ বিভারের আলোচনা ঠিক এই প্রশ্নকে ঘিরেই ঘুরপাক খায়। যখন 'অপারেশন এম্পায়ার স্টেট রেবিলিওন' নামের স্থানীয় একটি সংগঠন জুনের ১৪ তারিখে জুকত্তি পার্কে প্রথম দখল কর্মসূচীর ডাক দেয়, মাত্র চার জন লোক হাজির হয়েছিল সেখানে। জুলাই ১৩ তারিখে 'অ্যাডবাস্টার্স' তাদের আহ্বান জানায় ওয়াল স্ট্রিট দখলের, দিন ঠিক করা হয় দুই মাস পরের, সেপ্টেম্বরের ১৭ তারিখ। দিন ঠিক করা আর প্রচার চালানোই ছিল আন্দোলনে ম্যাগাজিনটির মূল সম্পৃক্তি। 'নিউ ইয়র্কারস এগেইন্সট বাজেট কাট' নামের একটি দল, কিছু ছাত্রকর্মী, এবং নগরীর গরিব পাড়া-মহল্লার কিছু নেতা এগিয়ে এলেন বাকি কাজকর্ম সামলানোর জন্য।

জুন ও জুলাইয়ের তিন সপ্তাহজুড়ে শহরের বাজেট কাট এবং ছাঁটাইয়ের প্রতিবাদে তারা ক্যাম্প গেঁড়ে বসে থাকলেন সিটি হলের সামনের রাস্তার ওপারে, একটা ছোট্ট তাঁবুর শহর বানিয়ে যার নাম দিয়েছিলেন তারা ব্লুম্বার্গভিল। তার পর তাদের মনে হল এই একই কাজ করা যায় ওয়াল স্ট্রিটেও। 'অ্যাডবাস্টার্স' এর সাথে কথা বলে তারা একটি 'সাধারণ্যের সমাবেশ' বা 'পিপল'স জেনারেল এসেম্বলির ডাক দিলেন 'যেকোনো ধরনের কাট-ছাঁট ও কৃচ্ছতা সাধনের' বিরুদ্ধে, এবং পরিকল্পনা আঁটতে লাগলেন সেপ্টেম্বরের ১৭ তারিখের 'দখল' কর্মসূচী নিয়ে। সমাবেশটা হওয়ার কথা ছিল শহরতলীর ম্যানহাটন পার্কের বোউলিং মাঠে, যেখানে এই আন্দোলনের কারণে ইতিমধ্যে খ্যাতি পাওয়া নুড়ি পাথরে খুড় দাবড়িয়ে তেড়ে আসা ষাঁড়ের ভাস্কর্যটি দাঁড়িয়ে আছে।

গ্রেয়বার এই সমাবেশটার খবর পেয়েছিলেন এবং আগস্টের ২ তারিখ বিকেলে তিনি বোউলিং মাঠে যান দুই বন্ধুকে নিয়ে, জিওর্জিয়া সাগ্রি নামের এক গ্রিক নৈরাজ্যপন্থী শিল্পী এবং সাবু কোহসো নামের এক জাপানি এক্টিভিস্ট (যিনি গ্রেয়বারের বইয়ের

জাপানি অনুবাদকও)। 'সাধারণ্যের সমাবেশ' বা 'পিপল'স জেনারেল এসেম্বলি' কথাটি একজন নৈরাজপন্থীর কাছে বিশেষ অর্থ ও তাৎপর্য বহন করে। একভাবে ধরতে গেলে এটা সমসাময়িক নৈরাজপন্থার একটি কেন্দ্রীয় বিষয়, যেটি দাঁড়িয়ে আছে এই ধারণার ওপর যে বল-প্রয়োগ নির্ভর যেকোনো বিপ্লবী আন্দোলনই নিপীড়নমূলক সমাজেরই জন্ম দেয়। 'সাধারণ্যের সমাবেশ' হচ্ছে খুবই সুচিন্তিত সতর্কতায় পরিচালিত একটি যৌথ আলোচনা পদ্ধতি যার মাধ্যমে সব সিদ্ধান্ত গৃহিত হয় কোনো গুটি কতক নেতার মাধ্যমে নয়, সংখ্যাগুরুত্বের জোরে নয়, যৌথ-মীমাংসা বা কনসেন্সাসের মাধ্যমে। অমীমাংসিত বিষয়গুলো তুলে দেয়া হয় জমায়েতের মধ্যেই ছোট ছোট ওয়ার্ক গ্রুপের হাতে, কিন্তু শেষতক সিদ্ধান্ত হতে হবে সর্বসম্মতিক্রমে, এমনকি জমায়েতের সংখ্যা কয়েক হাজার ছাড়িয়ে গেলেও।

আপাতদৃষ্টিতে এটা খুব কঠিন সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়া মনে হতে পারে, কিন্তু ওয়াল স্ট্রিট আন্দোলন যে অভিনব ঘটনাগুলো ঘটিয়েছে তার মধ্যে অন্যতম একটি হচ্ছে সাধারণ্যের সমাবেশকে বিশালকায় জনস্রোতের মধ্যেও কার্যকর একটি পদ্ধতি হিসেবে প্রমাণ করা, এবং বিদ্রোহের স্বতন্ত্র সব চিহ্ন-ভাষা উদ্ভাবন করা, যা ব্যবহার করে যেকোনো অংশগ্রহণকারীই সরাসরি প্রশ্ন তুলতে, সমর্থন দিতে বা অসম্মতি জানাতে, এমনকি নির্জলা বিরোধিতা করতে পারেন। কিন্তু গ্রেয়বার ও তার বন্ধুরা যখন আগস্টের ২ তারিখের সমাবেশে হাজির হলেন, তারা আবিষ্কার করলেন আয়োজনটা যত না 'সাধারণ্যের সমাবেশ' তার চেয়ে বেশি একটা প্রথাগত মিছিল, যা সংক্ষিপ্ত সমাবেশ শেষে কিছু পূর্ব-নির্ধারিত দাবি-দাওয়া নিয়ে ওয়াল স্ট্রিট অভিমুখে যাত্রা করবে (যার একটি ছিল 'প্রাইভেট ও পাবলিক খাতে গণ-কর্মসংস্থান কর্মসূচী', এবং অন্যটি ছিল 'নিপীড়ন ও যুদ্ধের অবসান')। নৈরাজপন্থার পরিভাষায়, আয়োজনটা পরিচালিত হচ্ছিল 'উলম্বিক'ভাবে, 'আনুপূর্বিক' সংগঠনের মতো, গ্রেয়বার ও তার বন্ধুরা যেমন আশা করেছিলেন সে রকম 'আনুভূমিক'ভাবে নয়, এবং এটা দেখে গ্রেয়বার আর সাগ্রি ভীষণ ক্ষেপে গেলেন।

এরপর যা ঘটল তা যেন নৈরাজপন্থার একটি শিক্ষণীয় গল্প। কোহসোকে সাথে নিয়ে এই দুইজন আরো কিছু লোকজন জুটিয়ে ভিন্নমত আর অসন্তুষ্টি জানিয়ে চলে এলেন পার্কের আরেক কোণে এবং নিজেদের মতো করে 'সাধারণ্যের সমাবেশ' শুরু করলেন, ১৭ সেপ্টেম্বরের কর্মসূচীর পরিকল্পনা শুরু করলেন। শুরুতে ডজনখানেক লোক থাকলেও আস্তে আস্তে এপাশে লোক বাড়তে থাকল, তাদের র‍্যালিতে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আয়োজকদের অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও। এই দড়ি টানাটানি চলল সন্ধ্যার আগ পর্যন্ত, কিন্তু শেষতক বোউলিং মাঠের অবশিষ্ট ৫০ জনের মতো জমায়েতের সবাই যোগ দিলেন বিদ্রোহের ভেতরের বিদ্রোহীদের 'সাধারণ্যের সমাবেশে'। 'ঐ মিছিলের আয়োজকরাও শেষ পর্যন্ত যোগ দিয়েছিলেন আমাদের সাথে', স্মৃতিচারণ করছিলেন কোহসো। 'তারপর সবাই মিলে অনেক অনেক রাত পর্যন্ত আমরা পরিকল্পনা করেছি আমাদের কী কী কমিটি দরকার সে নিয়ে'। যদিও পরের কয়েক সপ্তাহের প্রস্তুতি বাকি ছিল, কিন্তু সেদিন একটা গুরুত্বপূর্ণ বিজয় অর্জিত হয়েছিল। ঘটনাটা আনুভূমিকভাবে পরিচালনা, এবং সে অনুযায়ী যা যা করা প্রয়োজন তা করার সিদ্ধান্ত নেওয়া। তার মধ্যে অন্যতম একটা সিদ্ধান্ত ছিল কোনো নেতা, এমনকি পুলিশের সাথে দেন-দরবারকারী পর্যন্ত না রাখা, প্রাত্যহিক 'সাধারণ্যের সমাবেশ' ও তৎসংশ্লিষ্ট অগুনতি ওয়ার্ক গ্রুপের সভা করা, যা এখনও জুকত্তি পার্কের প্রতিরোধ আন্দোলনের হৃৎপিণ্ড হিসেবে কাজ করছে, এর থেকে দুনিয়াজুড়ে স্রোতস্বিনী হওয়া অন্য সব আন্দোলনেরও।

গ্রেয়বারের জন্য পরের দেড় মাস ছিল চরকির মতো মিটিং করে বেড়ানোর সময়। তখন সাপ্তাহিক সমাবেশ হতো, প্রথমটি হয়েছিল ব্যাটারি পার্ক সিটির আইরিশ হাঙ্গার মেমোরিয়ালের কাছে, পরেরগুলো ইস্ট ভিলেজের টম্পকিনস স্কয়ার পার্কে। তিনি এর কয়েকটি সমন্বয় করেন নিজে, এবং বাকি সময়ের পুরোটাই দেন মানুষের বাড়িতে বাড়িতে হওয়া বিভিন্ন কর্ম-দলের সভায়। (আগস্টের ১৪ তারিখে টুইটারে লিখেছিলেন, 'আজ আমি

ক্লান্তিতে নিঃশেষ। জীবনের প্রথম ড্রাইভিং ক্লাস, তারপর টম্পকিনস স্কয়ার পার্কে সভা পরিচালনা তিন ঘণ্টা ধরে')। তিনি আইনী ও স্বাস্থ্যগত প্রশিক্ষণ সংগঠিত করছিলেন, অহিংস প্রতিরোধ আন্দোলন বিষয়ে ক্লাস নিচ্ছিলেন বিরামহীন। কী কী দাবি-দাওয়া থাকবে বা আদৌ থাকবে কি না, এ নিয়ে সীমাহীন আলোচনা চলল, এমন এক প্রশ্ন যা এই কয়েক মাস পরেও অমীমাংসিতই থেকে গেছে।

সেপ্টেম্বরের ১০ তারিখের 'সাধারণ্যের সমাবেশে' সিদ্ধান্ত হল দখলের লক্ষ্যবস্তু নিয়ে—প্রথম পছন্দ চেজ ম্যানহাটন প্লাজা। বেশ কয়েকটি হাতের পাঁচও রাখা হল বিবেচনায়। ফলে দখল শুরু হওয়ার আগের রাত থেকেই পুলিশ যখন ম্যানহাটন প্লাজা ঘিরে রাখল, দখল-আন্দোলনকারীদের বিকল্প প্রস্তুতির কোনো ঘাটতি দেখা দিল না। সেপ্টেম্বরের ১৭ তারিখে, নির্ধারিত সময় বিকেল তিনটার ঘণ্টাখানেক আগেই প্লাজার পরিবর্তে জুকত্তি পার্কে যাওয়ার সিদ্ধান্ত মুখে মুখে ছড়িয়ে দেয়া হল, কমপক্ষে ২০০০ লোক জড়ো হয়ে গেল এখন বিখ্যাত হয়ে যাওয়া জুকত্তি পার্কের পাথুরে চত্বর, নীচু বেঞ্চ আর গাছপালার ছায়ায় ছায়ায়। স্থান নির্বাচনটি আসলেই ভাগ্যের আশীর্বাদপুষ্ট কারণ জুকত্তি একটি ব্যক্তি-মালিকানাধীন পার্ক, ফলে শহর কর্তৃপক্ষের বিক্ষোভকারীদের উচ্ছেদ করবার কোনো আইনী অধিকার নেই। সে রাতের সাধারণ সমাবেশটি সমন্বয় করেন গ্রেয়বার, যেখানে সিদ্ধান্ত হয় এখুনি ওয়াল স্ট্রিট অভিমুখে যাত্রা না করে পার্কেই ক্যাম্প করে থাকবার। তিন দিন পরে, গ্রেয়বার যখন অস্টিনের উদ্দেশ্যে উড়াল দেন, বিক্ষোভটি ইতিমধ্যেই নিউ ইয়র্কের স্থানীয় একটি খবরের চেয়ে একটু বেশি কিছুই হয়ে উঠেছে।

গ্রেয়বার ১৬ বছর বয়স থেকেই নৈরাজপন্থী। তিনি বড় হয়েছেন নিউ ইয়র্কেই, আমূলপন্থী রাজনীতিতে ঠাসা চেলসিয়ার ট্রেড ইউনিয়ন অর্থায়িত একটি অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিংয়ে। এক ইঁচড়েপাকা শিশুর মতোই, ১১ বছর বয়সেই তার গভীর আগ্রহ জন্মায় মায়ান হায়রোগ্লিফিক্সের নিয়ে। (এই প্রাচীন লিখন

পদ্ধতিটির তখনও কেবল আংশিক পাঠোদ্ধার হয়েছে)। তিনি তার নিজের মৌলিক কিছু অনুবাদ পাঠালেন এ বিষয়ে সে সময়কার এক শীর্ষ স্থানীয় বোদ্ধার কাছে, যিনি এতই মুগ্ধ হয়েছিলেন যে গ্রেয়বারের জন্য একটি বৃত্তি যোগাড় করে দেন আনডোভারের মাস'র ফিলিপস একাডেমিতে।

গ্রেয়বারের জন্মের সময় তার বাবা-মার বয়স চল্লিশের কাছাকাছি, যার একটা বড় সময় তারা পার করেছেন ১৯৩০ দশকের বাম রাজনীতির স্বশিক্ষিত শ্রমিক শ্রেণীর বুদ্ধিজীবী হিসেবে। গ্রেয়বারের মা ছিলেন একজন গার্মেন্টস কর্মী, এবং, খানিকটা তারকাও, যেহেতু আন্তর্জাতিক নারী পোশাক কর্মী ইউনিয়নের পৃষ্ঠপোষতার একটি মিউজিকাল কমেডির মুখ্য চরিত্রে রূপায়ন করতেন, যা একই সাথে ব্রডওয়ে থিয়েটারেও জনপ্রিয় হয়েছিল। বাবা কাজ করতেন একটি অফসেট ছাপাখানার প্লেট কারিগর হিসেবে। তার বাবার আদি নিবাস ছিল কানসাস, স্পেনের গৃহযুদ্ধে তিনি রিপাবলিকানদের হয়ে লড়েছিলেন। নৈরাজপন্থীরা এই রিপাবলিকান মোর্চার অংশীদার ছিলেন এবং অল্প সময়ের জন্য হলেও তারা বার্সেলোনার নিয়ন্ত্রণ হাতে নিয়েছিলেন। 'বেশিরভাগ মানুষই নৈরাজপন্থাকে খারাপ ব্যাপার ভাবে না, ভাবে যে এটা অবাস্তব পাগলামি', গ্রেয়বার বলেন। 'হ্যাঁ, এটা নিশ্চয়ই দারুণ চিন্তা যেকোনো কারাগার, পুলিশ, কর্তৃপক্ষীয় ক্রম-নেতৃত্ব কাঠামো থাকবে না, কিন্তু সবাই তো তখন খুনাখুনি শুরু করে দেবে। কাজেই এটা সম্ভব না, তাই না?' কিন্তু গ্রেয়বারের বাবা স্পেনের গৃহযুদ্ধের সময় নিজে দেখেছিলেন যে এটা সম্ভব। 'কাজেই এটা কোনো পাগলামি ছিল না। আমি এটাকে কখনও পাগলামি ভেবে বড় হইনি।'

অনেক বছর পরে, গ্রেয়বার যখন শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে নৃবিজ্ঞানের স্নাতক ছাত্র, তার মাঠ-গবেষণা তাকে খুব অন্য এক ধরনের নৈরাজ্যিক জনগোষ্ঠীর সংস্পর্শে নিয়ে আসে। তার অভিসন্দর্ভ ছিল মাদাগাস্কারের বেটাফো নামের এক গ্রামীণ সমাজ নিয়ে যা ছিল অভিজাত বংশ আর তাদের দাসদের সমষ্টি।

আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আই এম এফ) আরোপিত বাধ্যবাধকতার অংশ হিসেবে সরকারি ব্যয় সংকোচনের কারণে কেন্দ্রীয় সরকার বাধ্য হয় ঐ এলাকা থেকে সরে আসতে তার বাসিন্দাদের নিজ ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দিয়ে। পরে যদিও এই ধরনের কাঠামোগত সংস্কার নীতির কঠোর প্রতিবাদ করেছেন তিনি, কিন্তু এটাও লক্ষ করতে ভোলেননি যে রাষ্ট্র তাদের পরিত্যাগ করে যাওয়ার পরে এই জনগোষ্ঠী একটি সাম্যবাদী সমাজ গড়ে তুলেছে যেখানে প্রায় ১০ হাজার লোক একসাথে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে প্রায় সর্বসম্মত বোঝাপড়ার মাধ্যমে। যখন দরকার পড়ে, অপরাধের বিচারের দায়িত্ব নেয় জনতারই একটি তাৎক্ষণিকভাবে সংগঠিত অংশ, কিন্তু তার পরও একটি সর্বসম্মত মীমাংসার দরকার পড়ে এখানেও, এমনকি অপরাধীকে ফাঁসিতে ঝুলাতে হলে তার পিতা-মাতারও অনুমোদন লাগে।

১৯৯৯ সালে সিয়াটলে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা বিরোধী বিক্ষোভের আগ পর্যন্ত গ্রেয়বার সক্রিয় রাজনৈতিক কর্মী হয়ে উঠেননি। সে সময় ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগী অধ্যাপক হিসেবে তিনি অনুধাবন করতে থাকেন সারা জীবন যে ধরনের আন্দোলনে যুক্ত হতে চেয়েছেন তা এমন এক সময় শুরু হয়েছে, যখন তিনি নিজের একাডেমিক ক্যারিয়ারের দিকে মনোযোগ দেয়া শুরু করেছেন। 'আপনি যদি এইসব বিষয়ে খুব নিবেদিত হন, তাহলে ঘটনা খুব দ্রুত ঘটতে থাকে', গ্রেয়বার বলেন। 'প্রথম কর্মসূচীতে এসে দেখবেন আপনি পুরা একজন বহিরাগত। আপনি বুঝতেই পারবেন না কী হচ্ছে। দ্বিতীয়বারেই কিন্তু আপনি সবকিছুই বুঝে ফেলবেন। তৃতীয়বারে, আপনি চাইলেই হয়ে উঠতে পারেন নেতৃত্বের কার্যকর অংশ। যে কেউ এখানে নেতৃত্ব দিতে পারেন, তার যদি সময় ও শক্তি খরচের ইচ্ছা থাকে'। সময়টা গ্রেয়বারের জন্য ছিল বিশেষ সুখের। নিউ হ্যাভেনে তিনি ছিলেন একজন বিদ্বান, এবং নিউ ইয়র্কে, যেখানে তিনি বেশিরভাগ সময়ই কাটাতেন, তিনি ছিলেন একজন নৈরাজপন্থী যেখানে তিনি নানান ধারার রাজনৈতিক কর্মী, শিল্পী-সাহিত্যিক, এবং বাউণ্ডুলের দল, যারা নিজেদের ডাইরেক্ট

অ্যাকশন নেটওয়ার্ক নামে পরিচয় দেয়, তাদের মাঝে নতুন এক সমাজ খুঁজে পেয়েছিলেন। সেখানে বিক্ষোভ যেমন হতো তেমনি হতো বিশদ ব্যঞ্জনাময় উৎসবাদিও—'রিক্লেইম দা স্ট্রিট' পার্টি অথবা সেই রাতগুলো, যখন সবাই এক সাবওয়ে ট্রেনে উঠে শহরজুড়ে হৈ হুল্লোড় করে বেড়ানোটাই কাজ।

যাই হোক, ২০০৫ সালে এই সুখের দিন শেষ হয়ে যায় যখন ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয় তার চাকরি পাকা হওয়ার আগেই তার নিয়োগ চুক্তি বাতিল করে দেয়। গ্রেয়বার এর বিরুদ্ধে আপিল করেন এবং তার মামলাটি ইয়েলসহ অন্যান্য জায়গার পেশাদার নৃবিজ্ঞানীদের দাবি হয়ে দাঁড়ায়। তিনি দাবি করেন, তার চুক্তি বাতিল করবার পেছনে অন্তত আংশিক কারণ হিসেবে কাজ করেছে তার রাজনৈতিক সক্রিয়তা। যদিও অনেকে মনে করেন, আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয় হচ্ছে ঠিক সে ধরনের একটি কর্তৃত্বপরায়ণ প্রতিষ্ঠান দার্শনিকভাবে গ্রেয়বার যার ঘোর বিরোধী এবং মেজাজ-মর্জির দিক থেকে একদমই অনুপযুক্ত। 'তার ব্যক্তিগত স্টাইল নিয়ে কিছু ঝামেলা ছিল, প্রশ্ন ছিল সে ডিপার্টমেন্ট ও বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পর্যায়ের জ্যেষ্ঠ সহকর্মীদের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধাশীল কি না তা নিয়ে। মচকানোর মতো মোলায়েম লোক হিসেবে তার খুব একটা সুনাম ছিল না', স্মৃতিচারণ করছিলেন থমাস ব্লম হানসেন, স্টানফোর্ডের নৃবিজ্ঞানের অধ্যাপক এবং ইয়েলে গ্রেয়বারের সেই সময়ের সহকর্মী। 'আমি মনে করি না সে যে তার নিজের ক্ষেত্রে প্রধানতম একজন নৃবিজ্ঞানী সে বিষয়ে কারো কোনো সন্দেহ আছে', তিনি আরো যোগ করেন। 'কিন্তু সে আসলেই আমাদের একাডেমিক জীবনের ক্রমবর্ধিষ্ণু অংশ হয়ে ওঠা একঘেঁয়ে প্রশাসনিকতায় কোনো আগ্রহ খুঁজে পেত না।' অকুপাই ওয়াল স্ট্রিট আন্দোলনটি সূচনার সাথে যুক্ত সবাই, গ্রেয়বার থেকে শুরু করে 'অ্যাডবাস্টার্স' এর সম্পাদকরা বা 'বাজেট হ্রাস বিরোধী নিউ ইয়র্কবাসী' পর্যন্ত সবাই হতবাক হয়েছেন এর সাফল্যে।

আমেরিকার বামপন্থী সক্রিয়তার জগৎ সাধারণত প্রগতিবাদী ও শান্তিবাদী, নাগরিক মুক্তিবাদী ও মার্কসবাদী, আদর্শবাদী বা

বাস্তববাদীদের মিলিত জগা-খিচুড়ি এবং প্রায়শই পারস্পরিক দ্বন্দ্ব আর ভুল বোঝাবুঝিতে পরিপূর্ণ থাকে। অকুপাই ওয়াল স্ট্রিট আন্দোলনের অভিনব দিক হচ্ছে এই আন্দোলন এই প্রবণতা সত্ত্বেও গড়ে ওঠা কোনো আন্দোলন নয়, বরং এই প্রবণতার কারণে গড়ে ওঠা একটি আন্দোলন। নিজের বিবেচনায় গ্রেয়বার এই সাফল্যের কৃতিত্ব পরিকল্পনাকারীদের নয়, বরং দেন খানিকটা ভাগ্যকে, যথোচিত সময় নির্বাচনকে, এবং সর্বোপরি দেশটিতে ফুঁসে ওঠা ক্ষোভ আর হতাশাকে—'খুব হাতেগোনা কিছু চাকরি আছে বাজারে, রাজনৈতিক প্রক্রিয়া নিশ্চল হয়ে আছে মাটিতে, আর ব্যক্তি হিসেবে, জাতি হিসেবে আমরা নিমজ্জিত হচ্ছি ঋণে।'

ঋণ নিয়ে গ্রেয়বারের সমস্যা বা আপত্তি শুধু এই নয় যে, মাত্রারিক্ত ঋণ খারাপ। ঋণের আরো মৌলিক সমস্যা হচ্ছে, নিজের বইয়ে তিনি লিখেছেন, একে অন্যকে সাহায্য করবার যে সহজাত মানবিক প্রবৃত্তি, ঋণের বিস্তার সেটাকে বিকৃত করে ফেলে। অর্থশাস্ত্রের বইগুলো আমাদের বোঝায় যে টাকা ও বাজারের উদ্ভব হয়েছে মানুষের 'পরিবহন ও বিনিময়ের' প্রবণতার কারণে, যেমনটা বলে গেছেন অ্যাডাম স্মিথ। টাকা আসবার আগে, স্মিথ যুক্তি দেন, মানুষেরা সাতটা মুরগির সাথে একটা ছাগল বিনিময় করতো, বা একজোড়া সেন্ডেলের বিনিময়ে এক বস্তা শস্যদানা। তার পর কিছু কারবারি আর ব্যবসায়ী ভাবলেন, বিনিময়ের জন্য যদি সাধারণ কোনো মাধ্যম থাকে তাহলে সব কিছু খুব সহজ হয়ে যায়, সেটা রুপাই হোক বা ওয়ামপুমই হোক। এই গল্পের ঝামেলা হচ্ছে, যা কয়েক যুগ ধরে নৃবিজ্ঞানীরা বলার চেষ্টা করছেন, এরকম কোনো কিছু আদৌ কখনো ঘটেছে বলে বৈজ্ঞানিক কোনো প্রমাণ নেই। 'বিনিময় অর্থনীতির নিখাদ ও সরল কোনো উদাহরণ আজ পর্যন্ত নৃবিজ্ঞানে বর্ণিত হয়নি, সেখান থেকে টাকার উৎপত্তি তো দূরের ব্যাপার', গ্রেয়বারের দেয়া এক উদ্ধৃতিতে বলছেন নৃবিজ্ঞানী ক্যারোলিন হামফ্রে। টাকাবিহীন সমাজের লোকেরা বিনিময় করে না, যদি না তারা একদম অপরিচিত বা শত্রু কারো সাথে কারবার করছে। তার বদলে তারা একজন আরেকজনকে জিনিসপত্র এমনি

দিয়ে দেয়, কখনো কখনো অর্ঘ্য হিসেবে, কখনো ভবিষ্যতে কোনো কিছু পাওয়ার আশায়, আবার কখনো কখনো একদম সাদামাটা উপহার হিসেবে। সেই অর্থে, বিনিময়কে সহজ করবার জন্য টাকার উদ্ভব ঘটেনি, বরং এর প্রচলন ঘটে প্রাচীন মিশরের মতন রাষ্ট্র বা সুমেরুর মন্দিরকেন্দ্রিক আমলাতন্ত্রের হাতে, যাতে করে মানুষের কর পরিশোধের বিষয়টি নির্ঝঞ্ঝাট হয়, অথবা মালিকানাধীন সম্পদের পরিমাণ নিরূপণ সহজ হয়। এই প্রক্রিয়াতেই তারা প্রচলন ঘটায় মূল্য ধারণার, ব্যক্তি নিরপেক্ষ বাজার-ব্যবস্থার, যা ক্রমশ পারস্পরিক সাহায্য-সহযোগিতার জৈব-জালটিকে গ্রাস করে ফেলে।

এই হচ্ছে আক্ষরিক অর্থে প্রাচীন ইতিহাস। তো, এতে কি যায় আসে? অনেক কিছুই যায় আসে, কারণ, টাকা, গ্রেয়বার যুক্তি দিচ্ছেন, পারস্পরিক বন্ধন আর কর্তব্যবোধকে, যা কিনা নিখাদ সামাজিক বিষয়, তাকে ঋণে পরিণত করে, যা কিনা পুরাপুরি অর্থনৈতিক বিষয়। ঋণ পরিশোধের গুরুত্ব বিষয়ক যে ধারণা আমাদের মাথার ভেতর কাজ করে তা আমাদের পরস্পরের প্রতি যে মমত্ববোধ তাকে বিনষ্ট করে। ঋণ পবিত্র কোনো ব্যাপার নয়, কিন্তু মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্ক পবিত্র। আমার যদি ঋণের সামাজিক উৎস বুঝতে পারি, গ্রেয়বার বলেন, আমাদের চিন্তার শর্তাবলি বদলে যাওয়ার সাথে সাথে আমরাও আরো বেশি বেশি আগ্রহী হয়ে উঠব নিজেদের ঋণ, বন্ধক, ক্রেডিট কার্ড, শিক্ষা ঋণ, বা গোটা জাতির ঋণকেই পুনর্বিবেচনা করবার জন্য। চলমান অর্থনৈতিক সংকট মোকাবেলায় নেওয়া মরিয়া পদক্ষেপগুলো যদি কিছু দেখিয়ে থাকে তা হচ্ছে—গ্রেয়বারের মতে, আমরা স্বেচ্ছায় কোনো প্রতিষ্ঠানের ঋণ মওকুফ করে দিতে রাজি যদি প্রতিষ্ঠানটি গুরুত্বপূর্ণ হয়। শেষ বিচারে, অন্তত তাত্ত্বিকভাবে, সার্বভৌমত্বের মালিক হচ্ছে জনগণ। সে বিচারে আমরাই ব্যাংককে টাকা বানানোর অধিকার দিই আমাদেরই সেই টাকা ঋণ দেয়ার জন্য, গ্রেয়বার বলেন। 'আমরা এ জিনিস বানিয়েছি একসাথে, কাজেই আমরা চাইলেই সবকিছু ভিন্নভাবেও করতে পারি।'

গ্রেয়বারের বই তার সহ-নৃবিজ্ঞানীদের মাঝে ব্যাপক প্রশংসিত হয়েছে, এবং এটা সেই বিদ্যাজগতের বাইরেও যথেষ্ট মনোযোগ পেয়েছে। (যদিও মান্ডি হ্যাঙ্কের মতে, ইন্ডিয়ানার এক লাইব্রেরিয়ান যিনি জুকত্তি পার্কে রাতারাতি গড়ে ওঠা লাইব্রেরিটি দেখাশুনা করছেন, গ্রেয়বারের বইয়ের কপিগুলো সেখানে খুব একটা ব্যবহৃত হচ্ছে না)। মূলধারার কয়েকজন অর্থনীতিবিদও তার ধারণাগুলোর সাথে পরিচিত। জর্জ মেসন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক টাইলার কোয়েন, যিনি ঘটনাক্রমে একই সাথে একজন বহুল পঠিত ব্লগারও, তাদেরই একজন। 'সে মানুষজনের মধ্যে খানিকটা জ্ঞান সেঁধিয়ে দিতে পারে, এবং আমি মনে করি সেই ঠিক আছে, অ্যাডাম স্মিথ ভুল করেছিলেন', তিনি বলেন। তারপরও কোয়েন, যিনি নিজে একজন মুক্তিপন্থী, গ্রেয়বারের রাজনীতি তাঁকে কমই আকৃষ্ট করেছে। তিনি আধুনিক রাষ্ট্রের কোনো বিকল্প কিছু দেখতে পান না। 'সোমালিয়ার দিকে তাকান, যদি কোনো শূন্যতা থাকে, কিছু না কিছু সেটাকে পূরণ করবেই।' তিনি হয়তো জুকত্তি পার্কের ঢোল বাজানো লোকদের প্রতিও আঙুল তুলতে পারেন। ঢোলের বিরামহীন বাড়ি, যা ছিল অকুপাই আন্দোলনের আবহসংগীত, তাই আবার একগাদা শব্দ দূষণের অভিযোগ নিয়ে এসেছে, যা অন্যথায় সমর্থন দেয়া কমিউনিটি বোর্ড এবং এর নির্বাচিত কর্মকর্তাদের ধৈর্য্য পরীক্ষা নিয়েছে। কয়েক সপ্তাহ ধরে সাধারণ্যের সমাবেশে নানা যুক্তি-তর্ক করেও কিছু ঢোল বাজিয়েকে একটি নির্দিষ্ট সময়ে বাজানোর বিষয়ে রাজি করানো যায়নি, কিন্তু সংগঠকরা আশা করছেন অক্টোবরের ২৫ তারিখের একটি মতভেদ নিরসন সভায় এটির ফয়সালা হয়ে যাবে।

নিজের বইয়ের শেষ দিকে, গ্রেয়বার একটি নীতিগত পরামর্শ দেন—একটা বাইবেল-স্টাইলের 'জুবিলি', সব আন্তর্জাতিক ও ভোক্তা ঋণ মওকুফ। এধরনের জুবিলি আজকের আধুনিক যুগে অচল হলেও প্রাচীন ব্যাবিলন, এসিরিয়া, এবং টলেমিজের অধীনের মিশরে এটা ছিল একটা নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। শাসকেরা জানতেন অজন্মার বছরগুলোতে ঋণগ্রস্ত কৃষকদের 'জুবিলি' না দেয়ার অর্থ

হচ্ছে দাঙ্গা-হাঙ্গামা। 'স্বাধীনতা শব্দটা সবচেয়ে প্রাচীন যে রাজনৈতিক দলিলে পাওয়া যায় তা হচ্ছে একজন সুমেরীয়ান রাজার ঋণ মওকুফের ঘোষণা দেয়ার কাগজ'। 'এটা অভিবাদনযোগ্য একটা ব্যাপার হবে', গ্রেবার লিখছেন, 'শুধু এই কারণে নয় যে এটা মানুষের অনেক অনেক দুঃখ-দুর্দশা কমাবে, এজন্যও যে এটা আমাদের নিজেদেরকে নিজেরাই মনে করিয়ে দেয়ার উপায় যে, টাকা বর্ণনাতীত কোনো ব্যাপার না, কারো ঋণ শোধ করার মূলে নীতি-নৈতিকতার ব্যাপার নাই, বরং এই সব কিছুই মানবিক আয়োজনের অংশ এবং গণতন্ত্রের যদি কোনো মানে থাকে তাহলে তা হচ্ছে এই পুরো আয়োজনকে ভিন্নভাবে সাজানোর জন্য আমাদের সবার একমত হওয়ার সামর্থ্য।

মূল রচনার লিংক : http://www.businessweek.com/magazine/david-graeber-the-antileader-of-occupy-wall-street-10262011.html

১২ নভেম্বর ২০১১
উলংগঙ, অস্ট্রেলিয়া।



বখতিয়ার আহমেদের জন্ম ১৯৭৭ সালের ১৬ মার্চ নীলফামারী জেলার সৈয়দপুরে। স্কুল-কলেজের গণ্ডি পেরিয়েছেন সৈয়দপুর আর রাজশাহী মিলিয়ে। মধ্য নব্বই দশকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শুরু করে পরে নৃবিজ্ঞান পড়েছেন আরো দুইটি ভিনদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ে। ২০০৩ সাল থেকে শিক্ষকতা করছেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে, সেই সূত্রে রাজশাহীর বাসিন্দা। নৃবিজ্ঞান চর্চায় তাঁর আগ্রহের কেন্দ্রে আছে ভাষা, রাষ্ট্র আর রাজনৈতিক ক্ষমতার সাম্প্রতিক বিন্যাস। সম্প্রতি বাড়তি মনোযোগ দিচ্ছেন জলবায়ু ও কৃষিজ পরিবর্তনের প্রায়োগিক গবেষণায়।

bokhtiar_ahmed@ru.ac.bd

লেখকের আলোকচিত্র : আব্দুল্লাহীল বাকী

ম্যাজিক লণ্ঠন প্রকাশন
পাঠকের জন্য মূল্য : ১৫০ টাকা

ISBN 978-984-96307-1-5